ঘুমর মুকুর

ঋবেশ রায়

মূল্য - ৪.০০

রাত্রি শেষ হইয়া আসিলে সোমনাথ যাত্রার উদ্দেশ্যে উঠিয়া পড়িল। ডাক্তার তাহাকে গেট অবধি আগাইয়া দিতে আসিলেন। সেই বিদায় মুহূর্ত্তে কেহই কাহাকে উদ্দেশ করিয়া একটি কথাও বলিতে পারিল না। ডাক্তার স্থির বিষণ্ণ দৃষ্টিতে সোমনাথের পানে তাকাইয়া রহিলেন। সোমনাথ সে দৃষ্টির করুণতা সহিতে পারিল না। সে দৃষ্টি ফিরাইয়া বাড়ীখানাকে একবার শেষবারের মত ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। সমগ্র বাড়ীখানা যেন বর্ষণ-শান্ত বেদনায় ভারাতুর। সোমনাথ নিঃশব্দে একটি ক্ষুদ্র নমস্কার সারিয়া পিছন ফিরিল। ধীরা তখন গভীর ঘুমে অচেতন।

•

শঙ্করকে সুপ্রিয়া সেই যে এক অসতর্ক মুহূর্ত্তে আশ্বাস দিয়া ফেলিয়াছিল তাহাই স্মরণ করিয়া শঙ্কর আজও আশায় আশায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সে নিয়মিত আসে আর যায়! সুপ্রিয়ার দিক হইতে সম্পূর্ণ সাড়া মিলিবার শুভ মুহূর্ত্তটার অপেক্ষায় দিন গণনা করে। সে ভাবে, সোমনাথ যখন নাই, তখন নিরালম্ব সুপ্রিয়া কতদিন আর তাহাকে এ ভাবে অবহেলা করিতে সমর্থ হইবে? নারীর জীবনে চাই আশ্রয়! সে আশ্রয় সব সময় সকলের মনোমত হয় না। কিন্তু হয় না বলিয়াই ত নারী একাকীত্বের কোলে নিজেকে সমর্পণ করে না। তাই অতি-আগ্রহে সুপ্রিয়ার বিরাগভাজন হওয়া অপেক্ষা সে ধৈর্য্যধারণ করাটাই বুদ্ধিমানের কায বলিয়া মনে করিল।

রাজলক্ষ্মী সব কিছু দেখিয়াও আর দেখিতে চাহিলেন না, বুঝিয়াও বুঝিতে চাহিলেন না। সোমনাথের প্রতি প্রচ্ছন্ন অভিমানে ইদানীং তিনি মনে মনে কিছুটা বিরক্তও হইয়া উঠিয়াছিলেন। ছেলেটা সেই যে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল, আর কোন সন্ধান মিলিল না, সন্ধান দিলনা। বেশ ত, সুপ্রিয়া যদি কিছু ভুল করিয়াই থাকে, তবে তাহা কি একেবারে

সংশোধনের অতীত? আপন কন্যার মর্য্যাদায় আঘাত দেওয়ায় রাজলক্ষীও পরোক্ষে আহতা হইলেন। হওয়াই স্বাভাবিক। কন্যা-মেয়ে তিনি অন্ধ না হইলেও সে স্নেহ অকৃত্রিম। সুপ্রিয়া তাঁহারই গর্ভজ-কন্যা। সেই সুপ্রিয়াকে এভাবে অপমান করিবার দুঃসাহস যে করিল, তাহার পরে প্রসন্ন হওয়া কোন মায়েরই পক্ষে সম্ভব নহে। সোমনাথও তাই রাজলক্ষীর এই বিরূপতা হইতে অব্যাহতি পাইল না।

সারা সংসারে কেমন একটা বিষণ্ণতা নামিয়া আসিল। সুপ্রিয়া শত চেষ্টাতেও সহজ হইতে পারিল না। ফলে, তাহার মৌন বিষণ্ণতা যেন সারা বাড়ীটায় সংক্রামিত হইয়া পড়িল।

শঙ্কর লক্ষ্য করিল, সুপ্রিয়া মৌনতা দিয়া দূরে সরিয়া যাইতে চাহে। সে মনে মনে হাসিল, বলিল, তোমার কৌশলে তুমি নিজেকে আমার নিকট আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতেছ সুপ্রিয়া! কিন্তু শত চেষ্টাতেও তুমি আমা হইতে দূরে থাকিতে পারিবে না। ইহা মনে মনে বলিলেও শঙ্কর কিন্তু সুপ্রিয়ার প্রাণহীন আলোচনায় মাঝে মাঝে যেন চিন্তিত হইয়া পড়ে, ভাবে, সুপ্রিয়া সত্যই যদি কোনও দিনই স্বাভাবিক না হইয়া উঠে, তবে তাহারও জীবনটা কি বিস্বাদ হইয়া যাইবে না? সোমনাথের প্রভাব কি উহার জীবনে আজীবন সংক্রামিত থাকিবে? পরক্ষণেই হাসিয়া বলে, না না অসম্ভব, অসম্ভব এই কল্পনা। বিবাহিত জীবন আস্বাদনের পর সোমনাথ অসীম সমুদ্রে ভাসিয়া যাইবে, তখন থাকিবে শুধু শঙ্কর আর সুপ্রিয়া!

শঙ্কর একদিন সুপ্রিয়াকে সিনেমায় লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিল। সুপ্রিয়া উত্তর করিল, সে সিনেমা দেখে না।

শঙ্কর জেদ ধরিয়া কহিল,—কিন্তু কেন? সোমনাথ পছন্দ করে না বলে?

সুপ্রিয়া চলিয়া যাইতেছিল, এই কথায় ফিরিয়া আসিয়া গ্রীবা উন্নত করিয়া তীর্য্যক ভঙ্গিতে কহিল,—যদি বলি তাই।

এই বিচিত্র ভঙ্গিমাটি শঙ্করের ভাল লাগিল, তাই তাহাকে আরও উত্তেজিত করিবার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিল না, কহিল,—তা হ'লে বলব, পর্দার সিনেমাটা সেই হজম করতে পারে না, যে বাড়ীতে সিনেমা তৈরী করবার দুঃস্বপ্ন দেখে।

সুপ্রিয়া একই ভাবে প্রশ্ন করিল,—তুমি দুঃস্বপ্ন বলছ কোনটাকে?

—যে সোমনাথ স্বেচ্ছায় নিশ্চিতরূপে তোমায় ত্যাগ করে গেছে, মনে মনে তার মন পাবার দুরাশাকে।

সুপ্রিয়া বিষণ্ণ অথচ এক বিচিত্র হাসি হাসিয়া কহিল,—আর সেই দুরাশাই যখন অপরকে শঙ্কিত করে তোলে, তখন তাকে তুমি কি আখ্যা দেবে?

শঙ্কর এই প্রতি-প্রশ্নে কেমন যেন দিশাহারা হইয়া পড়িল, সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। পরে স্খলিত কণ্ঠে কহিল,—শঙ্কা আমি ঠিক করিনা সুপ্রিয়া। কিন্তু আমার দুর্ব্বলতা তুমি জানো, তাই সেই দুর্ব্বল স্থানে আঘাত করে কিছুটা চঞ্চল করে দিয়েছ, এ কথা স্বীকার করছি।

সুপ্রিয়া কহিল,—শঙ্করদা! তোমার এ স্বীকৃতিটুকুর জন্য ধন্যবাদ। এটুকু সরলতাও যে তোমার আছে তা জেনে খুশী হলুম।

শঙ্কর অপ্রসন্ন মুখে কহিল,—তোমার খুশীতে আমারও খুশী হবার কথা, কিন্তু এর পিছনে যেটুকু হুলের যন্ত্রণা আছে তাও আমার মর্ম্মে বিঁধছে। তোমার কথায় নির্গলিতার্থ হচ্ছে, আমি স্বভাবতঃ কুটিল।

এবার সুপ্রিয়া সত্যই উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কুটিলতা যে কমপ্লিমেণ্ট শঙ্কর দা! হুলের যন্ত্রণায় তুমি এটুকু বুদ্ধিও হারিয়ে ফেলছ! মনে রেখো, তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী সোমনাথ! আর সে সোমনাথ আজও ধরণীর মায়া কাটায় নি।

—কিন্তু এ কথাও সত্যি যে, মায়াবিনী। সে তোমার মায়া কাটিয়েছে। সোমনাথকে আমি ভয় করি না। সে আর যাই করুক, এ বাড়ীতে আর সে পা বাড়াচ্ছে না।

—কে বলতে পারে।

—আমি পারি। তুমি যতই আস্ফালন কর, আমি জোরের সঙ্গেই বলব, তা'হলে তুমি সোমনাথকে এতটুকু চেনো নি।

এবারে যেন সুপ্রিয়া ঈষৎ বিচলিত হইল, কহিল,—সোমনাথকে চেনা কারো পক্ষেই অত সহজ নয় শঙ্করদা!

শঙ্কর কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া পুনরায় কহিল,—আশ্চর্য্য মেয়েদের মন! এতবড় আঘাতের পরেও অপমানকে বেণীর সঙ্গে বাঁধতে ওদের বাধে না।

—তুমি কি বলতে চাইছ শঙ্করদা?

—আমি বলতে চাইছি, তুমি সব বুঝেও বুঝতে চাইছ না। কিন্তু কেন?

—শঙ্করদা! ফুটবলের মাঠ আর মেয়েদের বুক এক নয়। পুরুষের খেয়াল-খুশীর বল নিয়ে বুকের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দাপাদাপি করলেই কি গোল দেওয়া যায়?

—কিন্তু প্রত্যুত্তরে আমিও যদি বলি, পুরুষের বুকটাও ষ্টেজের প্ল্যাট-ফরম নয়। মেয়েদের খেয়াল-খুশী মত তার বুকে নাচের হুল্লোড় চালালেই কি সে অনাদিকাল ধরে তা সহ্য করে?

—সহ্য করা না করা তার শক্তির ওপর নির্ভর করে। অসময়ে মাঝ পথে যদি সে ভেঙে পড়ে, তবে তারও দুর্গতি, আর যে নাচছে তারও দুর্গতি।

আবার আশার ইঙ্গিত! সে মনে মনে বলিল, সহ্য কর শঙ্কর, সহ্য কর। আছে, আছে, শঙ্করের আশা আছে। অসময়ে ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না। তাহার শেষ শক্তি দিয়া তাহাকে সহ্য করিতে হইবে।

শঙ্কর আর কোন প্রশ্ন করিল না, প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। যে উত্তর সে আদায় করিয়াছে তাহা পুনরায় হারাইতে সে চাহে না।

সুপ্রিয়া চলিয়া গেল। নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া শয্যায় দেহটিকে এলায়িত করিয়া দিয়া গভীর অবসাদে সে ভাঙ্গিয়া পড়িল। কি ক্লান্তি! অসম্ভব ক্লান্তিতে যেন চিন্তাশক্তিটাও দুর্বল হইয়া আসিতেছে। শতবার, সহস্রবার সে নিজেকে সোমনাথের ভাবনা হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহা পারে নাই। কিন্তু এদিকে শঙ্করকে লইয়া এভাবেই বা কতদিন এ খেলা চলিবে? সে জানে, ইহা তাহার স্বেচ্ছাকৃত। শঙ্করকে আশ্বাস দিয়া না খেলাইলে তাহার অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিবে। যে মুহূর্তে শঙ্কর সম্পূর্ণ নিরাশ হইবে, সেই মুহূর্তে সেই নৈরাশ্যের মধ্য হইতে তাহার দানবীয় মূর্তি বাহির হইয়া আসিবে। সে ক্ষেত্রে সোমনাথের অবর্তমানে তাহার একার পক্ষে আত্মরক্ষা হয়ত সম্ভব হইবে না। তাহার স্থির বিশ্বাস সোমনাথ ফিরিবে। ফিরিবে এবং তাহাকে গ্রহণ করিবে। সোমনাথ সত্যাশ্রয়ী, সে কখনও মিথ্যার মায়াজালে চিরকাল বন্দী থাকিতে পারে না। সে জানে, সাধারণের নিকট যতই দুর্লঙ্ঘ্য হউক সোমনাথের নিকট একদিন এ মায়াজাল ছিন্ন হইবেই। কিন্তু সোমনাথ কোথায় এতদিন আত্ম-গোপন করিয়া আছে? আঘাতটা তাহারও সামান্য লাগে নাই। যাক্, যেখানেই থাকুক, সে সুস্থ থাকুক। বেচারী! সাংসারিক অভিজ্ঞতাহীন সরল মানুষটি হয়ত পথের প্রান্তে দাঁড়াইয়া সাধারণের বিদ্রূপ কুড়াইতেছে! হায়! তাহাকে কেহ জানে না, কেহ চেনে না, কেহ বুঝে না!

সোমনাথ প্রথমটা ভাবিয়াছিল, এবার কলিকাতায় ফিরিবে; কিন্তু চলিতে চলিতে বাস-ষ্ট্যাণ্ডের সম্মুখে আসিয়া দেখিল, দিল্লী যাইবার বাস তখনই ছাড়িতেছে। সে তৎক্ষণাৎ বাসে উঠিয়া পড়িল। যদিও দিল্লী তাহার পরিচিত, তথাপি আগ্রায় আসিয়া দিল্লীটা না ঘুরিয়া যাইতে মন চাহিল না

দিল্লী পৌঁছিয়া সে সোজা বিড়লা ধর্মশালায় আশ্রয় লইল। নূতন দিল্লী তাহার ভাল লাগে। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সহর। নগর পরিকল্পনায় একটা রসবোধের পরিচয় আছে। কলিকাতার মত প্রাসাদ-সৌধ আকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে না।

পুরাতন দিল্লী জীর্ণ অপরিষ্কার, কিন্তু অতীত-গৌরবে সমৃদ্ধ! লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ সবই পুরাতন দিল্লীতে, কাজেই দিল্লী যাইয়া পুরাতন দিল্লী দেখিতেই হইবে, নহিলে দিল্লী দেখা হইবে না।

সেদিন লালকেল্লা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে সে পদব্রজেই যাত্রা শুরু করিল। দিল্লীর ট্রামের অবস্থা শোচনীয়। কলিকাতার ট্রামের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না। ট্রাম অপেক্ষা পথের পথিক হওয়া অনেক ভাল। কিন্তু ফুটপাথের অবস্থাও আশাপ্রদ নহে। তথাপি সোমনাথ চলিতেই লাগিল। পথের পাশে পাশে ছোট ছোট কুটির। সেই কুটিরে বাসা বাঁধিয়াছে বাস্তুহারার দল। ইহাদের অধিকাংশই পাঞ্জাবী হিন্দু ও শিখ। সিন্ধীর সংখ্যা সামান্য হইলেও তাহারাও প্রতিবেশী। ভাগ্যের নিষ্ঠুর বিড়ম্বনায় কাল যাহারা ছিল শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত, আজ তাহারা করুণার পাত্র! কাল যাহারা ছিল সমাজের সম্পদ, আজ তাহারা সমাজের সমস্যা! ইহাদের ক্ষুব্ধতা সব সময় আত্ম-প্রকাশ করিবার অবসর না পাইলেও ইহাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের অভিযোগ রাষ্ট্রনায়কদের বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে।

পাঞ্জাব আর বাঙ্গলা! নদী মাতৃক দুইটি দেশের বহু সন্তান আজ কাঙ্গালের জীবন যাপন করিতেছে। স্বাধীনতার বেদীমূলে ইহারা সর্ব্বস্ব সমর্পণ করিয়াছে বা করিতে বাধ্য হইয়াছে। স্বদেশ স্বজন হারাইয়া, ইমান ইজ্জত বিসর্জন দিয়া, ইহারা আজ আখ্যা লাভ করিয়াছে বাস্তুহারা!

সোমনাথ ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছিল। সহসা একটা কোলাহলে তাহার চিন্তার সূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। একদল পাঞ্জাবী বিকট চীৎকার করিতে করিতে অদূরে একটা মোটরকার লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়াছে।

ঘটনাটা এত নিকটে যে সোমনাথও কৌতূহলী না হইয়া পারিল না। ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া ভিড়ের মধ্যে মাথা গলাইয়া সে দেখিল একজন পাঞ্জাবী রিক্সাচালক আহত রক্তাক্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে। রিক্সাখানা ভগ্নাবস্থায় কিছু দূরে নিক্ষিপ্ত এবং একজন সুবেশ ভদ্রলোক সেই উত্তেজিত পাঞ্জাবীদের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ষ্টিয়ারিং ধরিয়া বিনা প্রতিবাদে পাঞ্জাবী রসনার সুমধুর আপ্যায়নে আপ্যায়িত হইতেছেন। উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। সহসা একটা লাঠির প্রচণ্ড আঘাতে হুডের একাংশ পিষ্ট হইয়া গেল। এবার বুঝি ভদ্রলোকটিকেও উহারা নিষ্কৃতি দিবে না। নিকটে কোথাও পুলিশ নাই। এ সময় প্রায়ই থাকে না। কলিকাতাতেও না। ভদ্রলোকটি একবার মাথা বাহির করিয়া কি যেন বলিতে গেলেন। উত্তেজিত জনতার হুঙ্কারে তাহার এক বর্ণও বুঝা গেল না। সোমনাথ ভিড় ঠেলিয়া অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

একি! ডাঃ মেটা! সর্ব্বনাশ! ডাঃ মেটা বিপন্ন! সোমনাথ প্রাণপণ বলে ভিড় ঠেলিয়া একেবারে ডাঃ মেটার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মুহূর্ত্তমধ্যে হুডের উপর দাঁড়াইয়া সে ভাঙ্গা ভাঙ্গা উর্দ্দু, হিন্দি ও ইংরাজী মিশাইয়া যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ হইতেছে, ভাইসব, এ গাড়ীতে তোমরা যাহাকে আক্রমণ করিতে যাইতেছ তিনি হইতেছেন বম্বের বিখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ মেটা। দুর্ঘটনা যে ভাবেই হউক, আহতের শুশ্রূষাই এখন প্রাথমিক কর্ত্তব্য; এবং সে ক্ষেত্রে ডাঃ মেটার চিকিৎসাই বর্ত্তমানে বিশেষ মূল্যবান। রিক্সার দাম উনি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিবেন। এখন আপনারা স্থির মস্তিষ্কে বিচার করিয়া দেখুন, এ অবস্থায় উত্তেজনার বশে প্রতিশোধ গ্রহণ সঙ্গত কি ডাঃ মেটার সাহায্য গ্রহণ সঙ্গত।

সোমনাথের বক্তৃতা ফলপ্রদ হইল। জনতার গুঞ্জন না থামিলেও উত্তেজনা অনেকটা প্রশমিত হইল। একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বলিল,—ঠিক

কথা বাবুজী! আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আপনি ডাক্তার সাহেবকে বলুন এখন চিকিৎসা শুরু করতে। ওঁর কোনও ভয় নেই।

ডাঃ সেটা গম্ভীরভাবে বাহির হইয়া আসিলেন। এখনেই তিনি প্রবলবেগে সোমনাথের হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিলেন। সোমনাথ ডাঃ সেটাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিল। উভয়ে একে অপরের পানে তাকাইয়া নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন, কাহারও মুখ দিয়া একটা শব্দও বাহির হইল না।

ডাক্তার সেটা ইঙ্গিতে সোমনাথকে ব্যাগটা লইতে বলিয়া যত্নের সহিত আহতকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—আশঙ্কার কোন কারণ নেই। আর্টারী ছিঁড়ে প্রচুর রক্তস্রাব হবার ফলেই রোগী এভাবে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। আপনারা অনুমতি করলে আমি আর্টারী সেলাই করে দিতে পারি, আর তা না হলে আমারই গাড়ীতে একে হস্পিটালে ভর্ত্তি করিয়ে দিতে পারি।

দুই তিনজন পাঞ্জাবী পরামর্শ করিয়া রায় দিল ডাক্তার সাহেবই সেলাই করুন। হাসপাতালে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

ডাক্তার যথারীতি সেলাইয়ের পর ব্যাণ্ডেজ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। সোমনাথ এতক্ষণে আহতকে প্রশ্ন করিল,—তোমার নাম কি ভাই!

—অর্জ্জুন সিং!

—তুমি এখনও খুব দুর্ব্বল। যদি আপত্তি না থাকে ডাক্তারের গাড়ীতে করেই তোমার বাসায় পৌঁছে দিই। তোমার লোকদের বল বিশ্রামখানার ব্যবস্থা করতে।

—অর্জ্জুন সিং সম্মতি জানাইয়া গুরুমুখী ভাষায় তাহার দেশওয়ালী ভাইদের কি বলিল সোমনাথ তাহা বুঝিল না।

পথের পাশে এক বাস্তহারা কুটিরের সম্মুখে গাড়ী থামাইয়া অর্জ্জুন সিং ক্লান্তকণ্ঠে ডাক দিল—শর-বী!

দিলওয়ার পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা বাহিরে আসিয়া প্রথমেই অর্জ্জুন-সিংকে এ অবস্থায় দেখিয়া ব্যাকুলভাবে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—হায় ভগবান্! এ ক্যা!

সোমনাথ ও ডাক্তার উভয়েই সবিস্ময়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করিলেন,

—কি আশ্চর্য্য! শর্ম্মিষ্ঠা!

এবার শর্ম্মিষ্ঠার দৃষ্টি তাঁহাদের উপর পড়িল। সোমনাথ! ডাঃ মেটা! সে স্বপ্ন দেখিতেছে নাকি! অর্জ্জুন সিংএর ক্লান্ত দেহ তখনও তাহার বাহুবদ্ধ। অধীর বিস্ময়ে শর্ম্মিষ্ঠা প্রশ্ন করিল—সোমনাথ বাবু! ডাঃ মেটা! কি করে এসব ঘটল?

ডাঃ মেটা নীরবে অঙ্গুলি দ্বারা নিজের বক্ষ স্পর্শ করিলেন। সোমনাথ কহিল,—অকস্মাৎই দৈব দুর্ঘটনা! ডাঃ মেটার মোটরেই এই অঘটন ঘটেছে। যাইহোক ভয়ের কোন কারণ নেই। ডাঃ মেটা ওর প্রাথমিক চিকিৎসা করেছেন, তবে রক্তপাতটা বেশী হওয়ায় অর্জ্জুন সিং অতটা অবসন্ন হয়ে পড়েছে। এসকল প্রশ্ন পরে হবে। এখন ওকে খানিকটা গরম দুধ খাইয়ে দিন।

অর্জ্জুন সিংএর সংসার বলিতে বৃদ্ধা মাতা ও পত্নী শর্ম্মিষ্ঠা। বৃদ্ধা মাতা কাঁদিয়া ভাসাইল। অবোধ্য ভাষায় কত কি যে বলিয়া গেল তাহা ডাক্তার বা সোমনাথ কেহই বুঝিল না। তবে এইটুকু বুঝিল যে, সে ভাষায় মঙ্গল আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হইতেছে না। অর্জ্জুন সিং ব্যর্থ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে দুই একবার থামাইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বৃদ্ধা না থামিয়া বরং আরও উত্তেজিতা হইয়া উঠিল। শর্ম্মিষ্ঠা তখন উঠিয়া গিয়া কানে কানে কি বলিলে বৃদ্ধা শান্ত হইল। সে ডাক্তারের হাত দুইখানি ধরিয়া ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দিতে বলিল,—তুমি ডাক্তার আমি জানতুম না বাবা! ভগবান তোমার ভাল করুন। তোমার দয়াতেই আমার ছেলেকে ফিরে পেলুম, তুমি সুখী হও, দীর্ঘজীবি হও। আমার কথা

কিছু মনে কোরো না বাবা! দুঃখে ভাবিয়ে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দেখছনা, শিয়ালকোটের রইস্‌জাদা আজ দিল্লীর পথে পথে রিক্সা টেনে বেড়াচ্ছে। হায় ভগবন্‌! হায় ভগবন্‌! এও দেখতে হোলো। বৃদ্ধা কপালে হাত দিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিল। ডাক্তার বৃদ্ধাকে দুই এক কথায় সান্ত্বনা দিয়া উঠিয়া পড়িলেন, বলিলেন,

—এবার আমি উঠি শর্মিষ্ঠা! সোমনাথ বাবু! কোন দিকে যাবেন? আমার যাবার পথে হলে আমার মোটরেই আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।

—দরকার! প্রয়োজন নেই। আমি একটু পরেই যাচ্ছি।

ডাক্তার বিদায় লইলেন। অর্জ্জুন সিং খানিকটা গরম দুধ পান করিয়া সুস্থ বোধ করিল। শর্মিষ্ঠা পরস্পরের পরিচয় করাইয়া দিল।

—আমার স্বামী! আর ইনি আমার কলেজ-বন্ধু সুপ্রিয়ার ভাবী স্বামী। অর্জ্জুন সিং হাতটা বাড়াইয়া দিয়া সোল্লাসে অভিবাদন করিল,

—দোস্ত! আচ্ছা—।

অল্পক্ষণেই আলাপ জমিয়া উঠিল। বলিষ্ঠ যুবকের সুগঠিত দেহ ও উজ্জ্বল চক্ষু তাহার মনের উদারতার পরিচায়ক। ইংরাজীটা জানা আছে। বাঙলাটাও ভালই বলিতে পারে!

অর্জ্জুন সিং বলিতে লাগিল,—দোস্ত! তিন মাস আগেও যদি জানতে পারতুম যে ভাগ্যের খেলায় এভাবে পথে নামতে হবে, তা'হলে হয়ত শর্মিষ্ঠাকে বিয়ে করতুম না। কিম্বা হয়ত একথা মিথ্যে। কারণ, শর্মিষ্ঠাকে দেখবার পর স্বেচ্ছায় তাকে পাবার আশা ত্যাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।

শিয়ালকোটে আমাদের বাড়ী। জমিদারী কাজে কিছু ছিল কিন্তু আয় খুব বেশী ছিল না। অবশ্য জমি জমা যা ছিল তা নেহাত মন্দ নয়। এসকল মিলিয়ে যা আয় হোত, তা'তে আমাদের সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে যেত।

আমি এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসায়ে নামি। কলকাতার সঙ্গেই আমাদের কারবার চলত বেশী। খেলাধুলার সরঞ্জামের ব্যবসা ছিল। আমি বেশীর ভাগ কলকাতায় থাকতুম, কাজেই বাঙলাটাও চলনসই রকম শিখেছিলুম। বাঙলাদেশ আমার ভালো লাগে। সময়ে অসময়ে বাঙালী বন্ধুদের সঙ্গে আমি অনেক জায়গা বেড়িয়েছি। দক্ষিণেশ্বর আর বেলুড় মঠ ছিল আমার সব চেয়ে প্রিয়। ওদুটো যায়গায় কত সন্ধ্যা যে কাটিয়েছি তার হিসেব নেই।

একবার ভারী মজা হয়েছিল। ঘুরতে ঘুরতে গেলুম বীরভূম। তোমাদের শক্তি সাধনার অনেকগুলি পীঠস্থান আছে এই বীরভূমে। বক্রেশ্বর দেখে একটা রুক্ষ কাটা পাহাড়ের পাশ দিয়ে যখন একটা গ্রামে পৌঁছলুম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পাঞ্জাবীকে কেউ আশ্রয় দিতে চাইলো না। শেষে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক পরম যত্নে এক বিশাল প্রাসাদে নিয়ে গিয়ে হাজির করলেন। প্রাসাদ বটে তবে অত্যন্ত জীর্ণ। বুঝলুম প্রাচীন জমিদার বংশের শেষ স্মৃতি। সেই ভদ্রলোক ডাক দিলেন ছোট বাবু বলে। যে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তিনি যেন আভিজাত্যের শেষ নিদর্শন। দীর্ঘ গৌরবর্ণ অবয়ব। আভিজাত্যমাখা মুখ। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। স্বাস্থ্য ভেঙে পড়লেও একেবারে পরাজয় স্বীকার করেনি। ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন,—কি খবর সর্বেশ্বর?

সর্বেশ্বর উত্তর করল,—হুজুর! ইনি এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। অতিথি। গ্রামে কেউ জায়গা দিল না। তাই ভাবলুম, জীর্ণ হলেও বটবৃক্ষ ত এখনও রয়েছেন, তাঁরই ছায়ায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

ভদ্রলোক হেসে বললেন,—ভালই করেছ সর্বেশ্বর! পরে আমাকে আহ্বান করে বললেন, আসুন আপনি।

ভেতরে গেলুম এবং বললে অতিরঞ্জিত হবে না রাজকীয় অভ্যর্থনা পেলুম। পরিচয় পেলুম, নাম তাঁর রাজ্যেশ্বর রায়। রাজ্যেশ্বর তখন

রাজ্যহীন, তবু বলতে দ্বিধা নেই সত্যিই যেন রাজ-দর্শন হোলো। অসাধারণ পাণ্ডিত্য, লোকজ্ঞ আর উদারতায় তিনি যেন সর্বদা আমাদের বহু ঊর্ধ্বে বাস করছেন। ব্যাঙ্ক ফেল হয়ে, কোলিয়ারীর ব্যবসায়ে জলাঞ্জলী দিয়ে তিনি তখন প্রায় রিক্ত হস্ত।

তবু সে বয়সেও কী উৎসাহ! প্রায় চার পাঁচশ' বিঘা জমি নিয়ে তিনি কৃষি কর্মে মন দিয়েছেন। যেন একালের জনক রাজা। সারা পৃথিবী ঘুরেছেন তাই অভিজ্ঞতাও যেমন প্রচুর, খেয়ালেরও তেমনই অন্ত নেই। তিনি বললেন,—জানলেন অর্জুন বাবু! আমাদের কর্তারা ভুলে যান যে ভারতবর্ষটা কৃষিপ্রধান দেশ। এর মুক্তির মন্ত্র হচ্ছে 'কৃষি দেবো ভব'। কর্তারা মুখে একথা স্বীকার করলেও অন্তরে একথা স্বীকার করতে চান না। ওদের ধারণা স্বাধীনতার মূল-মন্ত্র হচ্ছে ইনডাষ্ট্রি! কিন্তু আপনিই বলুন ত, যে দেশের কৃষি-সম্পদ নেই বা যা আছে তা গণনায় তুচ্ছ, সে দেশের ইনডাষ্ট্রিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ভিন্ন আর কি উপায় আছে? আমরা ওদের প্রোপাগাণ্ডা দেখে ভাবি, ইনডাষ্ট্রিই বুঝি শেষ কথা। ফলে, দেখুন না, কোন্নগরের বিশাল ধানের ক্ষেতে বসল বিড়লার বিরাট কারখানা, আর পানাগড়ে হাজার হাজার বিঘা জমিকে অনুর্বর রেখে আদেশ দেওয়া হ'ল অধিক শস্য ফলাও। নদীমাতৃক বাংলা দেশে নদীসংস্কারমূলক কোন কাজই হোলো না। এসব তথ্যই অসহ্য! আপনি দেখবেন অর্জুন সিং, এর মূল্য দেশকে কিভাবে দিতে হয়।

সোমনাথ বলিল—আপনি কি বললেন?

—কিছুই না। কেবল শুনে যেতে লাগলুম। কিন্তু এর পরেও বিস্ময় ছিল বড় কম নয়। গভীর রাত্রে খেতে বসে দেখলুম রাজকীয় আয়োজন! বললুম, একি করেছেন আপনি? এত আয়োজন কখন করলেন? তিনি হেসে বললেন,

—সদ্ব্যবহার কর বন্ধু! পাঞ্জাবী মানের মর্য্যাদাহানি কোরো না।

পরিবেশন করতে লাগলেন তাঁরই অনূঢ়া কন্যা শর্মিষ্ঠা। মধুর স্বরে তিনি দু একটি কথা কহিছিলেন, জিজ্ঞাসা করছিলেন, আমার আর কি প্রয়োজন।

কি শান্ত আর মধুর সেই মেয়েটি। পরদিন বিদায় নিয়ে অত বড় বিশাল প্রাসাদটা যখন প্রায় অতিক্রম করে এসেছি, তখন একটা চাঁপা গাছের তলায় নিঃশব্দ-পদচারিণী সেই মেয়েটিকে আবার দেখলুম। শ্রদ্ধায় মাথা নুইয়ে এলো। দেবী মূর্ত্তি! কাছে এসে বললেন,

—বিলেতে আপনার কোনও বন্ধু আছেন?

বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলুম,—কেন বলুন ত?

মেয়েটি ইতস্ততঃ করে বললেন,—আমার স্বামী এখন বিলেতে আছেন।

—আপনার স্বামী! তবে আপনার মাথায় সিঁদুর নেই কেন!

লজ্জিত মুখে তিনি বললেন,—আনুষ্ঠানিক বিয়ে এখনও আমাদের হয় নি। তিনি ফিরে এলেই হবে। সব ব্যবস্থা ঠিক আছে। বাবাই তাঁকে বিলেতে পাঠিয়েছেন। আজ ছ' মাস তাঁর চিঠি পত্র পাইনি।

বলতে পারলুম না আমার জানা কোন বন্ধু তখন বিলেতে নেই। সংক্ষেপে কেবল তাঁর হাত থেকে ঠিকানা লেখা কাগজটুকু নিয়ে পিছন ফিরলুম, সাহস হোলো না তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখতে! কে জানে, আজও তাঁর স্বামী ফিরে এসেছেন কি না!

অর্জ্জুন সিং অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল, যেন সে সেদিনের স্মৃতিটা ভাল করিয়া মন্থন করিতেছে।

সোমনাথ ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—আপনার বাঙালী প্রীতির উৎসমূল আবিষ্কৃত হোলো, কিন্তু শর্মিষ্ঠার মত বাঙালী মেয়েকে সুদূর বক্ষের উপকূলে আবিষ্কার করলেন কেমন করে?

এবার শর্মিষ্ঠা অগ্রসর হইয়া আসিয়া কহিল,—আমাকে উনি আবিষ্কার করেন নি, বরং আমিই ওঁকে আবিষ্কার করেছিলাম, কারণ আগ্রহটা বোধ হয় আমার দিকেই ছিল বেশী!

সোমনাথ সবিস্ময়ে কহিল,—তাই নাকি? ব্যাপারটা তাহ'লে ত রীতিমত রোম্যান্টিক?

—রীতিমত! তবে আপনার মত লোকের পক্ষে এ কৌতূহল অনাবশ্যক। তাছাড়া এতে উনি লজ্জিত হয়ে পড়তে পারেন।

অর্জুন সিং প্রতিবাদ করিয়া কহিল,—মোটেই না। বাবুজীকে তুমি যেমন করেই বল আমি লজ্জিত হব না। লজ্জা পাবার যদি কিছু থাকে তা তোমার দিক থেকে, কারণ তুমি মেয়ে মানুষ।

শর্মিষ্ঠা খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল,—ভাগ্যিস্ স্মরণ করিয়ে দিলে, নইলে বিশ্বাস করা ভারী শক্ত!

অর্জুন সিং শ্রান্তকণ্ঠে কহিল,—সত্যি বাবুজী! শরমী পুরুষের মতই শক্ত। এই দুঃখে কষ্টে পুরুষরাও ভেঙে পড়ে ওর মুখের হাসি কিন্তু একদিনও মুখ ভার করে নি।

শর্মিষ্ঠা কথাটাকে চাপা দিয়া কহিল,—যাই, চা নিয়ে আসি। সোমনাথ বাবু! আপনার বৈরাগী বেশ দেখে শঙ্কা জাগে। চা পান ত্যাগ করেন নি ত?

সোমনাথ তেমনই মৃদু হাসিয়া কহিল,—না, স্বেচ্ছায় আমি কাউকে ত্যাগ করি নি বরং আমিই পরিত্যক্ত হয়েছি। চা-টা ব্যতিক্রম! একমাত্র চা-ই বোধ হয় আমাকে দুর্দ্দিনের বন্ধুর মত সঙ্গ দিয়ে জীবন যুদ্ধে লড়বার শক্তি যুগিয়ে চলেছে।

শর্মিষ্ঠা চা লইয়া ফিরিল। পাঞ্জাবী চা সত্যই লোভনীয়। সোমনাথ চক্ষু মুদিয়া চা পান শেষ করিয়া বলিল,—আঃ! চা-টা সত্যিই মর্ত্ত্যের অমৃত!

শর্মিষ্ঠা পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,—কিন্তু ব্যাপার কি সোমনাথবাবু! এ বৈরাগ্যব্রত কবে থেকে গ্রহণ করলেন এবং কেনই বা করলেন? সুপ্রিয়া গোড়ারমুখী কি মরেছে?

সোমনাথ অভিনয়ের ভঙ্গিতে হস্তোত্তলন করিয়া কহিল,—আশ্বস্ত হউন দেবী! আপনার সখি সুপ্রিয়া দেবী সুস্থ শরীরে, বহাল তবিয়তে, নিশ্চিন্ত আরামেই দিন অতিবাহিত করছেন। তাঁর সম্পর্কে উদ্বেগের কোন কারণ নেই।

—তবে সখাটির এ অবস্থা হোলো কেন?

—বা'র মৃত্যু সংবাদ আপনার জানা আছে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পিতৃবিয়োগে শোকের পাত্রটা পূর্ণ হোলো। দুঃখের পান পাত্র পূর্ণ হতে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল সেটুকু পূর্ণ করে দিয়ে গেলেন উত্তমর্ণেরা। অর্থাৎ এক কথায় বর্তমানে ক্যাপিটালিষ্ট 'বুর্জোয়া' সোমনাথ একদিনে একেবারে 'প্রোলাতিরারেত' সর্বহারার দলে নাম লিখাল। ইতি সোমনাথ চরিত কথা।

সোমনাথের প্রতিটি শব্দ শর্মিষ্ঠাকে বেদনাতুর করিয়া তুলিতেছিল, তাই সে না পারিল তাহার পরিহাসে যোগদান করিতে, না পারিল কোন প্রতিপ্রশ্ন করিতে। যে সোমনাথকে সে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে দেখিতে চাহিয়াছিল, সেই সোমনাথ কি এ ভাবে ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া লোক চক্ষের অগোচরে আত্মগোপন করিয়া থাকিবে? না না অসম্ভব। সোমনাথ সূর্য! সাময়িক দুঃখের মেঘ অপসারিত হইয়া তাহার জ্যোতির্ময় রূপ ভাস্বর হইয়া উঠিবেই।

অনেকক্ষণ পরে শর্মিষ্ঠা তাহার ব্যথাতুর দৃষ্টি মেলিয়া সোমনাথের পানে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাইল।

অপূর্ব দরদভরা কণ্ঠে ডাকিল,—সোমনাথ বাবু।

—বলুন।

—আপনি বাঙ্গলায় ফিরে যান।" এখন সুপ্রিয়ার সব আপনার অত্যন্ত প্রয়োজন। কি হয়েছে আমি জানি না। সুপ্রিয়া কি করে আপনাকে এ অবস্থায় ছেড়ে দিল তাও আমি ভেবে পাচ্ছিনা। আমার অনুরোধ, আপনি আর একটা দিনও বিদেশে অপেক্ষা করবেন না। আপনি বাঙ্গালায় ফিরে যান।

অর্জুন সিং শর্মিষ্ঠাকে অনুমোদন করিয়া কহিল,—শরমী ঠিকই বলেছে বাবুজী! আপনি বাঙ্গালায় ফিরে যান।

সোমনাথ বিষন্ন হাসি হাসিয়া বলিল,—দোস্ত! আপনি সত্যিই সুখী।

অর্জুন সিং উচ্চহাস্য করিয়া কহিল,—সচ্ বাত দোস্ত! সত্যিই আমি সুখী। আপনিও সুখী হবেন। শিগ্‌গীর আপনি আপনার সুপ্রিয়াকে বিয়ে করে ফেলুন। শরমীকে দেখবার পর আর বিয়ের আগে, আমারও ঠিক ওই রকম হয়েছিল। সে ভারী যন্ত্রণা বাবুজী, ভারী যন্ত্রণা। আমারও একসময় মনে হয়েছিল, শরমীকে না পেলে আমি সন্ন্যাসি হয়ে চলে যাবো।

—তোমার ত মাত্র ক'টা দিন দোস্ত! এদিকে আমি যে সুপ্রিয়াকে দেখছি আজ সাত বৎসর।

অর্জুন সিং বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়ন হইয়া কহিল,—ক্যা! সা—ত বরস? তবভি সাদি নেই হুয়া?

—তাইত দেখছি দোস্ত!

—আফশোষ! আফশোষ! আমি হ'লে কলজে ফেটে অনেক আগেই মরে যেতুম।

সোমনাথ হাসিয়া কহিল,—বাঙ্গালীর কলজের জোর তা' হলে পাঞ্জাবীর চেয়ে নিশ্চয় বেশী স্বীকার করছ?

শর্মিষ্ঠা কহিল,—ওর স্বীকার বা অস্বীকারে পরিবেশটার পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আপনি যেন নিজেকে চেপে যাচ্ছেন সোমনাথবাবু!

সোমনাথ রহস্যময় হাসি হাসিয়া উত্তর করিল,

—আর যাহা আছে

তাহা প্রকাশের নয়!

শর্মিষ্ঠা কিন্তু তেমনই বিষণ্ণভাবে কহিল,

—কচের গুরুগৃহ বাস কি শেষ হ'লো? সে কি পে'ল সেই অমৃত মন্ত্র? বিদায় শাখনা কি দেবযানীর প্রেমের আবেদন অবহেলা করল?

সোমনাথ দেখিল শর্মিষ্ঠা কৌশলে সুপ্রিয়ার সহিত তাহার বর্তমান সম্পর্কটা জানিবার চেষ্টা করিতেছে। কি হইবে উহাকে কথা দিয়া? তাই কহিল,—স্বর্গের কচ আর মর্ত্যের কচ এক নয় দেবী! প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে সম্ভব হলেও কলিপীড়িত কচের পক্ষে তা সম্ভব নাও হতে পারে। কারণ, মর-জগতে সত্যিকার প্রেম জীবনে একবারই আসে। তাকে উপেক্ষা করা বা অহঙ্কারে অবহেলা করা বুদ্ধিমানের কায নয়।

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার এই বুদ্ধি নির্মল হোক। বলিয়া শর্মিষ্ঠা উদ্দেশে প্রণাম করিল। সে প্রণাম প্রেমের দেবতার উদ্দেশে কি তাহার ভগবানের উদ্দেশে তাহা সেই জানে!

শর্মিষ্ঠা তাহাকে প্রচুর আহার্য দিয়া আর অর্জুন সিং তাহাকে প্রচুর আপ্যায়ন দিয়া বিদায় দিল।

সোমনাথ পথে নামিয়া পুনরায় বিড়লা মন্দিরের উদ্দেশে পদব্রজেই চলিতে আরম্ভ করিল। শর্মিষ্ঠার বর্তমান অবস্থা ভাবিয়া তাহার দুঃখ হইল। শর্মিষ্ঠা বিদ্রোহিনী! কিন্তু এ বিদ্রোহ কাহার বিরুদ্ধে? নিজের, না সমাজের, না তাহার আজন্ম পরিবেশের বিরুদ্ধে? প্রেমের পরিণয়কে কোন রেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ করা যায় না, তাই অবশ্য পাঞ্জাবী বিবাহে সোমনাথ ক্ষুব্ধ হয় নাই, সে সংস্কার তাহার নাই; তথাপি বলো বলব

হইতে দূরে এমনভাবে নিজেকে এক প্রকার অবলুপ্ত করিয়া দিবার দুর্জয় বাসনার অন্তরালে কোথায় যেন শর্মিষ্ঠার অভিমানাহত ক্রন্দিত হৃদয় গুমরাইয়া গুমরাইয়া পরোক্ষে অভিযোগ জানাইতেছে। তথাপি শর্মিষ্ঠাকে প্রশংসা না করিয়াও সে থাকিতে পারিল না। ভাগ্যের সাথে পাঞ্জা কষিবার এই যে অদম্য মনোবল, এ মনোবল সাধারণ নহে। এ মনোবল সশ্রদ্ধ অভিনন্দন আদায় করিবার দাবী রাখে। সুপ্রিয়াও যদি……

সুপ্রিয়াও যদি ধরণধারণে এমনই তীক্ষ্ণধার হইত, তবে বুঝি উহার অতখানি মনীষা অতখানি প্রাণ, এমনভাবে মাঝ পথে পথ হারাইত না।

যে নদী মরুপথে হারাল ধারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা।

সত্যই কি সুপ্রিয়া হারাইয়া যায় নাই? না, সত্যই সে হারাইয়া যায় নাই। তাহার বুকের প্রতিটি পঞ্জরে রক্তাক্ষরে উজ্জ্বল হইয়া সে জাগিয়া আছে। কিন্তু সে উজ্জ্বলতার বহ্নিজ্বালায় তাহার সর্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতেছে! সে দিনের সে দৃশ্যের স্মৃতি ক্ষণেকের জন্যও যদি তাহার মনের গোপনতম অংশে ভাসিয়া না উঠিত!

দার্শনিকরা বলেন, দৃশ্যমান জগত নাকি মিথ্যা! বলেন, আপন অস্তিত্ব দিয়াই নাকি জগতের অস্তিত্ব কল্পনা।

কল্পনা! হউক কল্পনা! তথাপি এই কল্পনা কী দুঃখময়! এই কল্পনার জগতে দুঃখ যেন পরিপূর্ণ হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। এই কল্পনা কবে খান খান হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে তাহা সে জানে না, তবে এটুকু জানে যে, সেই ভাঙনের মুখেও দুঃখের পারদকণা চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া মানুষকে আরও ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিবে।

জগত মিথ্যা। তাই সেই জগতের অন্তর্গত সব কিছু দর্শনও মিথ্যা। অর্থাৎ সুপ্রিয়া, শঙ্কর, সোমনাথ, বলিয়া কেহ জগতে ছিল না, এখনও নাই

এবং পরেও থাকিবে না। অতএব সুপ্রিয়াকে শঙ্করের বক্ষ-লগ্ন দেখিয়া সে যে কথা অনুভব করিয়াছে তাহাও সত্য নহে, মিথ্যা!

বাঃ, সে যে রীতিমত দার্শনিক হইয়া উঠিতেছে! আত্ম-প্রবঞ্চনা আর কাহাকে বলে! তবে একথা সত্য যে সময় বিশেষে এই দেখায় বিশেষ ভ্রমের সৃষ্টি করে। যেমন ধীরা! ধীরার সে কি ভুলই না বুঝিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, মায়াবিনী ধীরা বুঝি একদিন তাহাকে কামনার অন্ধকূপে টানিয়া আনিয়া অধীর উল্লাসে নৃত্য করিবে। হাস্যময়ী, লাস্যময়ী ধীরাকে দেখিয়া সে প্রেমময়ী মাধুর্য্যময়ী ধীরার কল্পনাও করিতে পারে নাই। যদি না দৈবক্রমে সে সেরাত্রে ধীরার স্বরূপ অবগত হইবার সুযোগ পাইত, তবে ধীরার প্রতি তথা সমগ্র নারী জাতির প্রতি, একটা লজ্জাজনক বিরুদ্ধ ধারণা লইয়াই সে আগ্রা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইত।

সুপ্রিয়াকে সে দীর্ঘদিন ধরিয়া নানাভাবে দেখিয়া আসিতেছে। সে দেখার সহিত সে দিনের দেখার কোথাও সামঞ্জস্য নাই। হয়ত যাহা দেখিয়াছে এবং সে দেখার যে অর্থ করিয়াছে তাহা ঠিক নহে। অকস্মাৎ কলিকাতা ত্যাগ করায় সত্যার্থ আবিষ্কারের সুযোগ হইতেও সে বঞ্চিত হইয়াছে। না, ইহা একপ্রকার হঠকারিতা। আবার হয়ত ভুল হইল। ধীরার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করিয়াই আগ্রা ত্যাগ করাটাও বোধ হয় ভুলই হইল। ধীরা হইতে যখন তাহার কোন আশঙ্কাই নাই বলিয়া সে ধ্রুব-নিশ্চিত হইল, তখন সে এভাবে পলাইয়া আসিল কেন? সমস্ত ঘটনা ধীরাকে অকপটে খুলিয়া বলিলে হয়ত ধীরা তাহাতে এমন কোন আলোকপাত করিতে পারিত, যাহার ফলে, তাহার সকল সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হইয়া যাইতে পারিত! কিন্তু ধীরাই বা কি আলোক সম্পাত করিতে পারিত? এতবড় প্রত্যক্ষ-দর্শনের পরও আর কি অর্থ করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইতে পারিত? হয়ত সে নিরুপায় লজ্জায় কোনও উত্তরই খুঁজিয়া পাইত না।

এ বরং ভালই হইয়াছে। অবশ্য অপরকে দুঃখ দিবার দুর্বিপাক হইতে সে রক্ষা পাইয়াছে। সহসা কাহার আহ্বানে সোমনাথ সচকিত হইয়া উঠিল।

—হ্যালো, সোমনাথ!

দৃষ্টি ফিরাইয়া সোমনাথ দেখিল, ট্যাক্সিতে তাহার বহুদিন পূর্বের সহপাঠী প্রদ্যুম্ন!

—কি আশ্চর্য্য প্রদ্যুম্ন! তুমি এখানে?

প্রদ্যুম্ন ততক্ষণে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া পড়িয়াছে।

—আমি এখানে এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, কারণ, এ সময়টা প্রায়ই আমি এখানে আসি। রাজধানীর রাজময়দানে আমাদের মত সম্মানিত অতিথিদের পদার্পণ না ঘটলে উভয় পক্ষেরই মর্য্যাদাহানি ঘটে।

পরক্ষণেই সোমনাথের স্কন্ধদেশে একটা আঘাত করিয়া উচ্চহাস্যে কহিল,—বুঝতে পারলে না? রেস খেলতে এসেছি হে। আজ তিন দিন হোলো বাইপ্লেনে কলকাতা থেকে দিল্লী এসেছি। কিন্তু ইউনিভার্সিটির উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক! দিল্লীর সনাতন রাজপথে 'আনব্যালেন্‌স্‌ড্‌' হয়ে এভাবে চলেছ কোথায়? ভাব-সাব দেখে মনে হচ্ছে যেন বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগটা জমাট হয়ে উঠেছে!

সোমনাথ হাসিয়া কহিল,—তোমরা বাইপ্লেনের বা এয়ারোপ্লেনের মানুষ কাজেই আর্থপ্লেনের উচ্চাবচ ভূমির সংবাদ তোমাদের না রাখাই স্বাভাবিক! অভিযোগ আমার কারো বিরুদ্ধেই নেই। তোমাদের বাইপ্লেন দিবারাত্র নিরাপদ হোক, তোমার অশ্ব প্রতিযোগিতায় নিত্য সাফল্য লাভ করুক, তাতে আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নেই! উপস্থিত পথ ছাড়, আমার গন্তব্য পথ স্বতন্ত্র।

—তা জানি। চিরদিনই তুমি আমাদের এড়িয়ে চলে এসেছ। তখন তার একটা অর্থ ছিল। কিন্তু তোমার বর্তমান অবস্থায় যে সুর ভেসে উঠছে, তাতে বৈরাগ্যটা যেন পঞ্চাশ পারসেন্টের কিছু

ভাগ্যের বজ্রেই মনে হচ্ছে! না, এ অবস্থায় তোমায় ছেড়ে দিতে পারি না। এস আমার সঙ্গে।

বলিয়া একরকম জোর করিয়াই তাহাকে ট্যাক্সিতে টানিয়া তুলিল। কহিল,—তারপর সোমনাথ ব্যাপার কি বলত? তুমি রেস খেল না, মদ খাওনা, কোন বিশেষ পল্লীতে রাত্রি যাপন করো না, তবে সব খোয়ালে কেমন করে? তোমাদের 'প্যাকার্ড কার' দেখে আমরাও যে একসময় সসম্ভ্রমে দূরে সরে যেতুম!

সোমনাথ সংক্ষেপে তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কাহিনী কহিল। সহানুভূতির কণ্ঠে প্রদ্যুম্ন কহিল,—আই সি! তা যাক্‌গে! তুমি হতাশ হোয়োনা সোমনাথ! আমি তোমায় ভালো ভালো টিপ দেবো। ভালো ভালো জকীর সঙ্গে আমার আলাপ আছে। বিশ পঞ্চাশ হাজার কামিয়ে আবার তুমি রিসার্চ্চে লেগে যাও। আমি তোমার চেয়ে অনেক বড়। বি, এস, সিতে তিন বার ফেল করবার পর তুমি আমায় ধরেছিলে। আমি বলছি তুমি লেগে যাও। অবশ্য প্রথম টাকাটা আমিই লোন দেবো।

সোমনাথ কোন উত্তর না করিয়া বিষণ্ণ হাসি হাসিল। প্রদ্যুম্ন কহিল,—আই সি। তুমি এতে রাজী নও! সত্যি, তুমি এসব পারবে না ভাইত! তা হলে কি করা যায়! বলিয়া সে সত্যই চিন্তিত হইয়া পড়িল।

সোমনাথ কহিল,—তা তুমি এত ভাবছ কেন?

প্রদ্যুম্ন উত্তেজিত কণ্ঠে কহিল,—আমি ভাববনা? বল কি সোমনাথ! আমি একটা হতভাগা! স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, ত্রিসংসারে কেউ কোথাও নেই! আছে শুধু কতকগুলো টাকা, আর সে টাকা ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে মদ, মেয়ে মানুষ আর মাঠের মত্ত বিলাসে। ডিয়ার সোমনাথ! আমি ভাববনা? না না, তুমি আমায় বাধা দিওনা। আমায় ভাবতে দাও সোমনাথ! আমায় ভাবতে দাও। বলিয়া সোমনাথের হাত দুইখানি ধরিয়া সত্য সত্যই সে কাঁদিয়া ফেলিল। এতক্ষণে সোমনাথ দেখিল,

দুয়ারেবীর কৃপায় প্রদ্যুম্ন এখন উদার এবং বিগলিত হৃদয়। ভাবিল, হইল মন্দ নয়। বিদেশে এক মাতালের পাল্লায় পড়িয়া আবার এক জাল বিপদে জড়াইয়া পড়িলাম। সোমনাথ সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—বেশ বেশ, ভালো করে ভেবে দেখ প্রদ্যুম্ন! বাধা তোমায় আমি দিচ্ছি না। তুমি ভালো করেই ভাবো। তবে কাল সকালে তোমার এ সকল সাধু প্রস্তাব মনে থাকবে কি?

প্রদ্যুম্ন একগাল হাসিয়া কহিল,

—ভাবছো আমি মাতাল হয়ে যা তা বকছি? না সোমনাথ, মদ খেলেও আমি মাতাল হই নি। আমি ঠিক আছি। আমার হিসেবও ঠিক আছে। আচ্ছা, ভাবত সোমনাথ, প্রদ্যুম্ন সেন যেদিন মরে যাবে, সেদিন সে কি রেখে যাবে? সে রেখে যাবে কতকগুলো পাওনাদারের বিল, আর পাহাড় প্রমাণ দুর্নাম। কিন্তু তারই ফাঁকে যদি সে সংসারে এটুকু সহানুভূতি রেখে যেতে পারে যে, ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিককে একদিন যে বাঁচিয়েছিলো সেও এই দুনিয়ার জঞ্জাল প্রদ্যুম্নই, তবে বলত সোমনাথ! সে প্রলোভন আমি ত্যাগ করব কেমন করে?

ট্যাক্সি আসিয়া সহরের শ্রেষ্ঠ হোটেলে থামিল।

পরদিন প্রাতে প্রাতরাশ সারিতে বসিয়া প্রদ্যুম্নই প্রথমে গতকল্যের জের টানিয়া কহিল,

—সোমনাথ! কালকের কথাটা আমি ভুলিনি। তবে আমার বর্তমান অবস্থাটাও ঈর্ষাপ্রদ নয়। যা টাকা এনেছিলুম, এ যাত্রাতে তা সব খুইয়েছি। তাই আজই কলকাতার উদ্দেশে রওনা হতে হবে, নইলে টাকায় টান ধরবে। হোটেলের পাওনা মিটিয়ে অল্পই অবশিষ্ট থাকবে, তাতে দুজনের কোন মতে থার্ডক্লাশে যাওয়া যাবে। জনতা এক্সপ্রেসই ভালো। মানও থাকবে সঙ্গে সঙ্গে টাকার টানটাও সামলান যাবে।

সোমনাথ কহিল,

—কিন্তু আমাকে না নিলে তুমি অপেক্ষাকৃত আরামে যেতে পারতে। দিল্লী এক্সপ্রেসে ইন্টার ক্লাসটা ততটা কষ্টকর না হতেও পারে।

—না গেলে জার্নির কষ্টটা একেবারেই নাও হতে পারে। কিন্তু তা হয় না। কাজেই যা হবে না, তা নিয়ে মাথা ঘামানর অর্থ অনর্থক সময় নষ্ট করা। তার চেয়ে বরং এস, সকাল সকাল ষ্টেশনে গিয়ে ভীড় জমবার আগেই টিকেটটা কেটে আনি।

প্রদ্যুম্নের পরামর্শ মত টিকেট কিনিয়া সেই দিন সন্ধ্যায় উভয়ে কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করিল।

সোমনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া প্রদ্যুম্নের বাড়ীতেই সাময়িকভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের উপর নাতিবৃহৎ বাড়ীখানায় আশ্রয় লাভ করিয়া সোমনাথ স্বস্তি বোধ করিল। প্রদ্যুম্নর সংসার বলিতে বিশেষ কিছুই নাই। এক দিদি আছেন, তিনিও এলাহাবাদেই সংসার জীবন যাপন করেন। বৎসরান্তে কয়েক দিনের জন্য কলিকাতায় আসিলে প্রদ্যুম্ন সেই কয়টা দিন শান্তশিষ্ট জীবন যাপন করে। তখন তাহার উচ্ছৃঙ্খলতা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। দিদিকে সে সত্যই ভক্তি করে। দিদির স্নেহ ভালবাসার মূল্য সে কোন দিনই দিতে পারিবে না তাহা সে জানে, তাই দিদির উপস্থিতিতে তাহার সংযমটা সত্যই প্রশংসনীয় হইয়া উঠে। সেই যে বাল্যকালে দিদির কোলে পিঠে চড়িয়া সে মানুষ হইয়াছিল, তাহার দিদি যে তাহাকে অসীম স্নেহে পিতা মাতার কঠিন অনুশাসন হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা সে আজও ভুলিতে পারে নাই।

দিদি আসিয়াছেন। ছেলেমেয়েদের আনেন নাই। একাই আসিয়াছেন। দিদির শান্ত পবিত্র মুখে একটা ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে। প্রদ্যুম্নও সংযত আছে। গভীর রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একমাত্রা ঔষধের ন্যায় অমৃত পানেই সে নিজেকে তৃপ্ত রাখিয়াছে। সে জানে, সাত দিনের বেশী দিদি থাকিবেন না।

দিদিকে সোমনাথের ভালই লাগিল। দিদি একদিন কথায় কথায় বলেন,

—সোমনাথ! তোমরা বিয়ে করনা কেন? প্রদ্যুম্নকে বলে বলে মিত হার মেনে গেছি। তুমি একবার বলে দেখ না। এলাহাবাদে টি গরীবের মেয়ের জন্তে তার মা ছবেলা হেঁটে হেঁটে আমায় অপ্রস্তত র তুলেছে।

সোমনাথ কহিল,

—আপনার কথাই যদি এতদিন উড়িয়ে দিয়ে এসে থাকে, তবে আমার থায় যে ও আমল দেবে তা ভরসা হয় না। তবুও আপনি যখন বলছেন, , আজই আমি ওকে বলে দেখব।

রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সোমনাথ প্রদ্যুম্নকে প্রশ্ন করিল,

—প্রদ্যুম্ন! তুমি এখনও বিয়ে করনি কেন?

প্রদ্যুম্ন হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল,—দিদি বলেছেন বুঝি?

—যদি বলি তাই, তাতেই বা এত হাস্তরস আসে কোথা থেকে?

—আছে, সোমনাথ প্রচুর হাস্তরস আছে। আমি বলে যাই, এবং মি তা অবহিত হয়ে শ্রবণ কর। প্রত্যেক ছেলে এবং প্রত্যেক মেয়েরই য়ে সম্বন্ধে একটা বিশেষ ধারণা আছে। অবশ্ব ছেলে এবং মেয়ে তে এখানে পরিণত বয়স্ক ছেলে মেয়েই বোঝাচ্ছে। এই ধারণায় তারা কটা প্রেরণা পায়। কিন্তু বাস্তবের বনভূমিতে সেই ধারণায় আর রণায় কোন সামঞ্জস্তই থাকে না। কাজেই সামঞ্জস্তহীনতায় আত্মসমর্পণ রা সকলের পক্ষে সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠে না।

—বুঝলুম! তা তোমার ধারণা এবং তার পশ্চাতের প্রেরণাটি কি?

—আমার ধারণা ছিল, আমি যদি সাহিত্যসেবী হই, তবে আমার জিনী হবেন বৈজ্ঞানিকা। আর আমি যদি বৈজ্ঞানিক হই, আমার নি হবেন সাহিত্যিকা; এবং তা হলেই আমরা একে অপরের পরিপূরক

রকম আর

হয়ে প্রেরণা লাভ করব। আমার বিশ্বাস 'কনট্রাক্ট' করে না হলে মিলন সম্পূর্ণ হয় না।

সোমনাথ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

দিদি চলিয়া গিয়াছেন। সোমনাথ নিশ্চিন্ত আলস্যে দিন কাটাইতেছে। ইতিমধ্যে চাকুরীর জন্য সে খান পনর কুড়ি আবেদনপত্র পাঠাইয়াছে। বর্ত্তমানে একটা চাকুরী না পাইলে এভাবে বেশী দিন চালানো যাইবে না। বন্ধুর স্কন্ধে কত দিন আর ভর করিয়া থাকিবে? অবশ্য প্রদ্যুম্নের আপত্তি নাই, বরং উৎসাহই আছে। প্রদ্যুম্নর অবস্থা এখনও নৈরাশ্যজনক নহে। এখনও দুইখানি বাড়ী ভাড়ার আয় হাতে আছে। মাসিক আট শত টাকায় অবিবাহিত জীবনে একা ভালভাবেই চলিবার কথা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠিকমত চলিতেছে না। আর একখানা বাড়ী বন্ধক পড়িয়াছে। উচ্ছৃঙ্খল জীবনে অর্থের অপব্যবহার অপরিহার্য্য। একদিন হয়ত অর্থ আর থাকিবে না, তথাপি উচ্ছৃঙ্খলতা উহাকে পরিহার করিবে না। অনাগত দিনের প্রদ্যুম্নকে কল্পনা করিয়া সোমনাথ শিহরিয়া উঠিল। প্রদ্যুম্ন শিক্ষিত, উদার! কিন্তু এ শিক্ষা, এ ঔদার্য্য সেদিন তাহার কোন সাহায্যেই আসিবে না।

প্রদ্যুম্ন প্রবেশ করিয়া কহিল,—কি ভাবছ সোমনাথ?

—ভাবছি, শিক্ষা এবং যোগ্যতা থাকলেও এ যুগে সহজে চাকরী মেলে না। দেখতে দেখতে বিশ দিন হতে চলল, একখানা আবেদনেরও জবাব এলো না।

—সোমনাথ, তোমার শিক্ষা এবং যোগ্যতা চাকরীর অনুকূল নয়। বড়দের আত্মীয় না হলে যোগ্যতা জমে না। আমি বলি, তুমি ও দুরাশা ত্যাগ করো। চাকরী পেলেও তিন দিনের বেশী তুমি টিকতে পারবে না।

—টিকতে পারব কি পারব না বলে এরকম নিশ্চিন্ত আলস্যে বসে থাকব ?

—মন্দ কি ? তুমি বরং চেষ্টা করে আবার রিসার্চেই লেগে যাও।

সোমনাথ ধীরে ধীরে মস্তক আন্দোলিত করিয়া কহিল,

—নাঃ, তা আর এখন সম্ভব নয়।

প্রদ্যুম্ন চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়া দীর্ঘ ঘন কুণ্ডলীর সৃজন করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল,—সোমনাথ! আমার হাতে একটা চাকরী আছে, করবে ? যদি তোমার প্রেজুডিস না থাকে ত বলি।

—চাকরীতে প্রেজুডিষ্ট হতে গেলে চলে না! তুমি নির্ভয়ে বল।

—'কলাবতী ফিল্ম কর্পোরেশনে' একজন কেমিষ্টের প্রয়োজন। তুমি ইচ্ছা করলে এ পোষ্ট পেতে পার, কারণ এ 'কনসার্নে' আমার খানিকটা হাত আছে। শ্রীমতী কলাবতীই এর প্রযোজিকা এবং পরিচালিকা। আমার অনুরোধেরও সেখানে একটা বিশেষ মূল্য আছে। অবশ্য মাইনেটা খুবই কম। বর্ত্তমানে মাসিক দু'শ টাকা মাত্র।

সোমনাথ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করিয়া কহিল,—আমি রাজী! দু'শ টাকাই এখন আমার কাছে দু'লাখ টাকা!

পরদিনই প্রদ্যুম্ন সোমনাথকে কলাবতীর নিকট লইয়া গিয়া চাকরীর ব্যবস্থাটা পাকা করিয়া দিল। সোমনাথ একশত টাকা অগ্রিম লইয়া একটা সস্তা 'মেসে' আশ্রয় লইল।

প্রথম দিন ল্যাবরেটরিতে প্রবেশ করিয়া সোমনাথের চক্ষে জল আসিল। সোমনাথের জীবনে দুইশত টাকার এই চাকুরিই আজ বড় হইয়া দাঁড়াইল! ভাগ্যের পরিহাস! সোমনাথের সাধনা, সোমনাথের উচ্চাশা, সোমনাথের সিদ্ধি বুঝি এই ল্যাবরেটরি কক্ষেই সমাধি লাভ

করিল। না, এ দুর্বলতা ত্যাগ করিতেই হইবে। তাহার কর্তব্য সে করিয়া যাইবে। ভবিষ্যতের ভাবনা সে ভবিষ্যতের গর্ভেই বিলীন করিয়া দিল।

অনেকে বলে, কলাবতীর প্রথম জীবনে যত কলঙ্ক মাখা হইয়াছিল বর্তমান জীবনে যশের প্লাবনে তাহা সকলই নাকি ধুইয়া মুছিয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে! সিনেমা সম্রাজ্ঞী কলাবতীকে আজ আর তাহার গুণ-মুগ্ধের দল অলক্ষ্য-গুঞ্জনে কলঙ্কবতী বলিয়া উপহাস করে না। চিত্র-জগতে অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়া, অভিজাত ধনী পুত্রকে বিবাহ করিয়া, ক্ষেত্র বিশেষে মোটা অঙ্কের দানে বিশেষ মহলকে চকিত ও চমকিত করিয়া, কলাবতী এখন ধনে, মানে, সৌজন্যে, শিষ্টাচারে, সহরের তথাকথিত শ্রেষ্ঠ সমাজে বরণীয়া ও স্মরণীয়া হইয়া উঠিয়াছে। কলাবতীর বাক্যে এখন সৌজন্য মিশ্রিত ব্যঙ্গের সুতীব্র ক্ষুরধার, অপাঙ্গের তীর্যকভঙ্গিমায় পুষ্পধনুর নিশিত শায়ক, কণ্ঠে মদিরময় মধুর আবেশ। এক কথায় অশনে, বসনে, চলনে, বলনে, হাস্যে, লাস্যে নিজেকে সে আজিও অদ্বিতীয়ার দাবীতে চালাইয়া যাইতেছে। বয়সটা ছত্রিশ পার হইলেও ছাব্বিশে বাঁধিয়া রাখিতে সে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখাইয়াছে!

এই কলাবতীর একদিন অকস্মাৎ আবির্ভাব ঘটিল ল্যাবরেটরিতে। সোমনাথের সহকারী সে দিন অনুপস্থিত। সোমনাথ একাই কায করিতেছিল। শ্রান্ত সোমনাথের কপালে ঘর্মবিন্দু ভাসিয়া উঠিয়াছে।

কলাবতী সহাস্যে নমস্কার করিয়া সোমনাথকে কহিল,—পরিশ্রমটা বোধ হয় আপনার পারিশ্রমিকের তুলনায় বেশীই হচ্ছে সোমনাথবাবু! এবার একটু বিশ্রাম করুন।

সোমনাথ না ফিরিয়া হাতের কাযটায় দৃষ্টি রাখিয়া কহিল,—পরিশ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের অনুপাত ঠিক করা হয়ত সব সময় সহজ নয়, তাই ও নিয়ে অনুযোগ করা আমাদের অর্থাৎ শ্রমিকদের শোভনও নয়, সঙ্গতও নয়। কারণ, পারিশ্রমিকটা পূর্ব্বেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

কলাবতী আহতা হইল। তাহার উপস্থিতি ছেলেটা গ্রাহ্য করিল না। কহিল,—কিন্তু পরিশ্রমের অনুপাতটা ঠিক করা আপনার হাতে। অত্যধিক পরিশ্রমে আপনার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হতে পারে।

সোমনাথ এবার হাতের কাযটা শেষ করিল। একটা ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া কহিল,—ধন্যবাদ! আপনার এই সহানুভূতিটুকুর জন্য অশেষ ধন্যবাদ! শ্রমিকরা কিন্তু এর বিপরীত অর্থ করে।

কলাবতী ওষ্ঠ চাপিয়া শীতল কণ্ঠে কহিল,—তারা কি বলে?

—তারা বলে, শ্রমিকের স্বাস্থ্যে আছে ধনিকের লোভ। তাই ধনিক চক্রান্তে স্বাস্থ্যটা যাতে একেবারে ভেঙে না পড়ে সেদিকেও সে দৃষ্টি রাখে। লোভটা লাভের ওপর থাকলেও সে জানে, সেই লাভটা শ্রমিকের কর্মশক্তির ওপরই অনেকটা নির্ভর করছে।

—লাভ লোকসানের খতিয়ানটা এর মধ্যেই ঠিক করে ফেলেছেন সোমনাথবাবু! কিন্তু প্রদ্যুম্নবাবুর কাছে যেটুকু জেনেছি তাতে আপনার সখের শ্রমিকত্ব আজ সাতদিনও অতিক্রম করে নি।

—সত্যি। প্রদ্যুম্ন সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু মনটা আমার সাত দিনেই সাত বৎসর এগিয়ে গিয়েছে।

কলাবতী বেয়ারাকে ডাকিয়া দুই গ্লাস সরবতের আদেশ দিল। একগ্লাস নিজে লইয়া অপর গ্লাসটা সোমনাথের দিকে বাড়াইয়া দিয়া অত্যন্ত দরদ দিয়া কহিল,—কাযটা আপনার অত্যন্ত 'বোরিং' লাগছে, না?

সোমনাথ চুপ করিয়া রহিল।

কলাবতী পুনরায় কহিল,—আপনার জন্যে আমি আর কি করতে পারি বলুন?

স্বরে অভিনেত্রীর সেই মদির তরলতা!

সোমনাথ কোটটা গায়ে দিতে দিতে কহিল,—বর্তমানে আমাকে বিদায় দিতে পারেন, আর পারেন কাযের সময় আপনার বাধা দান

হতে অব্যাহতি দিতে। কারণ, কায আমায় করতে হবে এবং তা আমি নিরঙ্কুশ ভাবেই করতে চাই।

সোমনাথের রূঢ়তায় কলাবতী আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ছেলেটার মাথার কিছু গোলমাল আছে নাকি? সে ধৈর্য্যের প্রায় শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, তথাপি আত্মসংযম করিয়া ধীর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,—আপনি ভুলে যাচ্ছেন সোমনাথবাবু, আমিই এ প্রতিষ্ঠানের একমাত্র কর্ত্রী। কাযেই এর যে কোন অংশে যা কিছু কায হচ্ছে তা পরিদর্শন করবার অধিকার আমার আছে।

—অধিকার থাকলেই যে যোগ্যতা থাকবে তার নিশ্চয়তা কি?

প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সোমনাথ পুনরায় একটা ক্ষুদ্র নমস্কার করিয়া ল্যাবরেটরী পরিত্যাগ করিল।

আহতা কলাবতী তাহার গমন পথে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া দৃঢ় অনুচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করিল,—আচ্ছা!

পরদিন সোমনাথ পত্র পাইল,—

'প্রিয় সোমনাথ বাবু!

আমার গতকল্যকার আচরণে আমি লজ্জিত। আপনি নিরঙ্কুশ ভাবেই আপনার কার্য্য পরিচালনা করিতে থাকুন, আর কেহ আপনাকে বাধা দিবে না বা বিরক্ত করিবে না।

মাসিক দুইশত টাকায় আপনার মূল্য নির্দ্ধারণ করা অত্যন্ত ভুল হইয়াছে। আপনি মাসিক পাঁচশত টাকা করিয়া পাইবেন। অবশ্য মাসিক পাঁচশত টাকাও আপনার উপযুক্ত মূল্য নহে। তবে তাহার অধিক ব্যবসা মঞ্জুর করিবে না। ব্যবসা বাঁচাইবার জন্যই সব কিছু আয়োজন। আমার অক্ষমতা ক্ষমা করিবেন।

নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি—

কলাবতী।'

প্রদ্যুম্নের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কলাবতী কহিল,

—তোমার সোমনাথের স্পর্দ্ধাটা আকাশ স্পর্শ করেছে।

'তোমার সোমনাথ' শব্দটায় ইচ্ছা করিয়াই একটু চাপ দিয়া কলাবতী প্রদ্যুম্নকে আঘাত করিল। আঘাতের জ্বালাটা অনুভব করিলেও গ্রাহ্য না করিয়া নির্লিপ্ত কণ্ঠেই প্রদ্যুম্ন উত্তর করিল,—আকাশ শুধু স্পর্শ করেনি, আকাশ ভেদ করে তার স্পর্দ্ধিত মাথাটা সেই আকাশের মাঝে আত্মগোপন করেছে। তোমার দৃষ্টি তার নাগাল না পেয়ে ব্যর্থতায় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

—বন্ধুগর্ব্বে তোমার মাত্রাধিক্য ঘটেছে।

—বিন্দুমাত্র না। ও সোমনাথ! সোমরস পানে ও অমর হয়ে আছে! আপন তপস্যায় ও মহিমময়!

—শিবেরই অপর নাম সোমনাথ। শিবেরও তপোভঙ্গ হয়েছিল।

—সেটা সাধারণ ঘটনা নয়, ফলে রতিকে মৃত্যু দক্ষিণা দিয়ে বিরত হতে হয়েছিল। কিন্তু তোমার এ দুর্ম্মতি কেন? তুমি অনায়াসেই ওকে উপেক্ষা করতে পারো।

কলাবতী ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া কহিল,—পারি, কিন্তু করবো না। কেন জান?

—আমিও জানি, কিন্তু বলব না। কেন জান?

—জানি, আমার বিরাগকে তুমি ভয় কর।

—আমি বৈরাগী নই, তাই পূর্ব্বেই অভয় চেয়ে নিচ্ছি।

—নির্ভয়ে বল। তোমায় অপ্রসন্নতা দিয়ে অপরাধী করব না।

—এতদিন তুমি যা পেয়ে এসেছ, তোমার দেবার অনুপাতে তার পারসেণ্টেজটা ছিল পঞ্চাশের ওপর। সেই অহঙ্কারে তোমার পারসেণ্টেজ কষবার প্রয়োজন কোনদিনই হয় নি। এর ফলে, তুমি তোমার প্রতিপক্ষকে যতটা জর্জ্জরিত করেছ, অনুপাতে তুমি নিজে জর্জ্জরিত হয়েছ অতি অল্পই।

তাই তোমার জীবনটা পান করেছে অফুরান জীবনানন্দ! তবে এও জেনো, কামনার ওই পারসেন্টেজের তারতম্যের মধ্যেই অলক্ষ্যে লুকিয়ে আছে মৃত্যুবাণ। অর্থাৎ পারসেন্টেজ যতক্ষণ থাকে পঞ্চাশের নীচে ততক্ষণ মৃত্যু থাকে দূরে, আর সেই পারসেন্টেজ যখন পঞ্চাশের উর্দ্ধে ওঠে তখনই মৃত্যু আসে দ্রুত এগিয়ে। অনেককে এর আগে তুমি মৃত্যু-মদিরা পান করিয়েছ। আজ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে সেই তরল মদির-পাত্র নিজে পান করতে ছুটেছ কেন অভিনেত্রী!

কলাবতী উচ্চহাস্য করিয়া অভিনয়ের ভঙ্গিতে কহিল,—তোমার বিশ্লেষণটার বিশেষত্ব উপভোগ করছি। বল প্রদ্যুম্ন, আরও বলে যাও।

—বলব। অভয় যখন দিয়েছ, তখন ভালো করেই বলব। বাল্য, কৈশোর, যৌবন পার হয়ে এখন প্রায় প্রান্তযৌবনে এসে তুমি পৌঁছেছ। এতখানি জীবন এনে দিয়েছে তোমায় কেবল একটানা জয়ের মাল্য। পরাজয়কে দাক্ষিণ্য দিয়ে দীন প্রতিপন্ন করেছ, কোন দিন ভাবোনি যে সেই পরাজয় একদিন তোমাকেও অতর্কিতে আক্রমণ করতে পারে!

—একই কথার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

প্রদ্যুম্ন একই ভাবে বলিয়া যাইতে লাগিল,—প্রথম জীবনে তুমি স্বামী গ্রহণ করেছিলে আত্মরক্ষার্থে, প্রান্তযৌবনে তুমি বিবাহ করলে সমাজের সম্ভ্রম ক্রয় করতে।

ভ্রুকুটি করিয়া কলাবতী কহিল,—ও প্রসঙ্গের সঙ্গে সোমনাথের কি সম্পর্ক?

—আছে। ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। স্বামী ত্যাগ করে সোমনাথকে সঙ্গী করবার বাসনা জেগেছে।

—তাই যদি জেগে থাকে, তাকে রক্ষা করবে কে? পারবে তুমি তোমার বন্ধুকে রক্ষা করতে?

—কোনও প্রয়োজন নেই। ও একাই একশ'। আজ তোমার উত্তেজিত চোখমুখ তোমার গভীর পরাজয়-বার্তা বহন করে এনেছে। বিশ্বাস না হয় আয়নার একবার ভালো করে নিজের মুখটা দেখে এসো। কিন্তু ও সোমনাথ! মামুদের মত ওকে লুণ্ঠন করতে পারো, তবু ওকে জয় করতে পারবে না, জাগবে না ও তোমার আকুল আহ্বানে।

—জানি, মামুদ পারেনি, কিন্তু সে দিন তার ভক্তের দলও ত তাঁকে জাগাতে পারেনি!

—পারে নি; কারণ ভক্তির অভিনয় করলেও সত্যিকার ভক্ত সে দিন একটিও ছিল না। যেমন সারা জীবন বহুবিধ প্রেমের অভিনয় করলেও সত্যিকার প্রেমিকা তুমি আজও হতে পারো নি!

একটা বিলোল কটাক্ষ হানিয়া কলাবতী কহিল, —ভালো কথা! এর পর তোমার বন্ধুর পতনে যেন আমার অভিশাপ দিওনা।

—অভিশাপ তোমাদের গায়ে লাগে না। যদি লাগত তাহলে......না, থাক সে কথা। তবে তুমিও স্মরণ রেখো, কামনার পারসেন্টেজটা তোমার অংশে পঞ্চাশের ওপর উঠেছে। অতএব তোমার আসন্ন মৃত্যুটার কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও মনের প্রসন্নতা হারিও না।

—প্রসন্ন মনেই বিদায় নিচ্ছি। শেষ মীমাংসা আজ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে একদিন দেখতে পাবে।

—আজ আর তোমার জয় কামনা করতে পারলুম না কলাবতী!

সহসা কলাবতীকে প্রত্যুষ ইচ্ছা করিয়াই যেন চাবুক হানিল।

—প্রত্যুষ!

—অপ্রসন্নতা দিয়ে এখনই আপন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ কোরো না।

মুহূর্তে নিজেকে সম্বরণ করিয়া কলাবতী হাসিয়া উত্তর করিল, —থ্যাঙ্ক ইউ!

কলাবতী নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

কলাবতী জীবনে বহু পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করিয়াছে। কামনা করিবার মত পুরুষও সে অনেক পাইয়াছে। তাহারা সকলেই কলাবতীর কামনা যজ্ঞে স্বেচ্ছায় আত্মাহুতি দিয়াছে। পুরুষ-চিত্ত লইয়া যাদুকরীর ন্যায় নৃত্য করা তাহার বিলাসের অন্যতম বিশেষ অঙ্গ। বিলাসিনী কলাবতীর এই বিলাসে আলস্য নাই, কারণ আজিও আলস্য আসিবার মত উৎসাহের অভাব সে বোধ করে নাই। প্রদ্যুম্ন সত্যই বলিয়াছে, প্রতি পদে বিজয়িনীর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া করিয়া তাহার নিজের সম্পর্কে সে সর্ব্বদা একটা উচ্চ ধারণায় অধিষ্ঠিতা।

সোমনাথের নির্লিপ্ততা সে প্রথম দিনেই লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তাহাকে একটু নৃত্য-দোদুল হিন্দোল দোলায় দোলাইতে বাসনা হইয়াছিল। এই বাসনার মূলে প্রথমে সার্কাসের কৌশল প্রদর্শন ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কিন্তু আলাপের সূচনাতেই আহতা হইয়া সে তির্য্যক পথ ধরিল। সোমনাথকে একেবারে ভূলুণ্ঠিত করিবার দুর্জ্জয় সঙ্কল্পে সে কঠিন হইয়া উঠিল। উত্তেজনায় সোমনাথকে বিশ্লেষণ করিবার ধৈর্য্যটুকুও সে হারাইয়া ফেলিল।

কলাবতী এতদিন দেখিয়া আসিয়াছে শুধু দেহের দাহ, আর মনের মত্ততা। বিশেষ পরিবেশ সৃজন করিতে পারিলে সকল পুরুষ, সকল নারীই সমান। সকলেই স্বেচ্ছায় সে পরিবেশে সাড়া দেয়। সাড়া না দেওয়াটার যে ভীরুতা আছে তাহাতে তাহারা অপমানিত বোধ করে। অবশ্য সকল নরনারী বলিতে আজ পর্য্যন্ত সে যাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছে।

হায়, সে জানে না কিম্বা জানিবার সুযোগ পায় নাই যে, আত্মার আত্মীয়তায় যাহারা বিশ্বাসী, এবং সেই আত্মীয়তার সন্ধান যাহারা পাইয়াছে, মনের মত্ততাকে তাহারা শীতল পরিবেষ্টনী রচনা করিয়া দূরে সরাইয়া রাখিতে সক্ষম। এই শীতলতাকে বিদ্রূপ করা সহজ, কিন্তু উপেক্ষা করা সহজ নহে।

সোমনাথের অপাপবিদ্ধ আত্মার জ্যোতির্ময়তায় সে নিজের অজ্ঞাতসারেই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু তাহার স্বরূপ সে উপলব্ধি করিতে পারে নাই। পারে নাই বলিয়াই অহঙ্কারে কলাবতী অন্ধ হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ, তাহার সযত্ন রক্ষিত তূণ হইতে নিক্ষিপ্ত এক একটি তীক্ষ্ণ শায়ক যখন সোমনাথের বর্ম্ম ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া ধূলি চুম্বন করিতে লাগিল, তখন কলাবতী নব নব কলা কৌশল আবিষ্কারে অত্যধিক সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, জীবনে সে এমন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী পাইয়াছে যাহাকে জয় করিতে পারিলে তাহার জীবন সার্থক হইবে এবং পরাজিতা হইলেও সেই পরাজয়ের গ্লানি গৌরব বহন করিয়া তাহার জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত মাধুর্য্যে মহিমময় করিয়া তুলিবে।

সুপ্রিয়া শঙ্করকে লইয়া শেষে বিশেষ দুশ্চিন্তায় পড়িল। সোমনাথের প্রতীক্ষায় বসিয়া বসিয়া একদিকে সে নিজেও যেমন হতাশ হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল, অপরদিকে তেমনই মিথ্যা আশায় আশায় ঘুরাইয়া শঙ্করেরও ধৈর্য্যের বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধরাইবার কারণ ঘটাইল। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এভাবে আর বেশী দিন চলিবে না। কিন্তু শঙ্করকেই বা কিভাবে নিরস্ত করিবে। শঙ্করকে সে কোন দিন চাহে নাই, বর্ত্তমানে চাহে না, ভবিষ্যতেও চাহিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এই রূঢ় সত্যকে স্পষ্ট ভাষণ দিয়া অলঙ্কৃত করিবার মত মনোবল আজ সে হারাইয়া বসিয়াছে। শঙ্কর ছলনায় ভুলিয়াছে। তবে সান্ত্বনা এই যে, তাহার মনে যত দুরভিসন্ধিই থাকুক, তথাপি সে সহসা তাহার সম্মানহানি করিয়া নিজেকে তাহার নিকট হেয় প্রতিপন্ন করিবে না। এটুকু শিক্ষা ও শালীনতাবোধ তাহার আছে।

শঙ্করের ভালবাসায় যে কোন সাধারণ নারী সুখী হইতে পারে। সুপ্রিয়া তাহার কামনাতপ্ত দেহের সেই উষ্ণতা আজিও ভুলে নাই। কুমারী

জীবনে তাঁহার প্রভাব অনতিক্রম্য। কিন্তু দেহের দাবীটাই যদি তাহার নিকট বড় হইত, তাহা হইলে হয়ত এ সকল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইত বহু পূর্বেই। কিন্তু না, সোমনাথের আত্মার জ্যোতির্ময়তা যে উপলব্ধি করিয়াছে, তাহার পক্ষে এ প্রশ্ন অবান্তর। দুঃখের পানপাত্র পূর্ণ হউক। সোমনাথের আত্মিক স্পর্শ সে অবহেলা করিতে পারিবে না।

চিন্তায় চিন্তায়, স্বল্পাহারে, অনিদ্রায় সুপ্রিয়ার স্বাস্থ্যহানি ঘটিল। তাহার নয়নের দীপ্তি, দেহের লাবণ্য, মলিন হইয়া আসিতে লাগিল। একটা রুক্ষতা তাহাকে পরুষ করিয়া তুলিল। স্বভাবেও তাহার স্বাভাবিক সাম্য যেন প্রতিপদে আঘাত খাইতে লাগিল।

রাজলক্ষ্মী সকলই লক্ষ্য করিলেন কিন্তু সেই যে তিনি নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছিলেন আর মুখ খুলিলেন না। সোমনাথের প্রতি বিরক্তি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। তাই বলিয়া শঙ্করকেও তিনি পছন্দ করিতেন না। অবশ্য তাহার নিত্য আগমনে কোন দিন বাধাও দিতেন না। ভাবটা অনেকটা—আজকালকার ছেলেমেয়ে, যাহা ইচ্ছা হয় করুক। ইচ্ছা হয় বিবাহ করুক, তিনি বাধাও দিবেন না সম্মতিও দিবেন না।

শঙ্করই একদিন সন্ধ্যায় আসিয়া সুপ্রিয়াকে জানাইল যে, সে আজই সোমনাথকে সহরের শ্রেষ্ঠ চিত্রাভিনেত্রী কলাবতীর সহিত একই মোটরে বেড়াইতে দেখিয়াছে। বেশভূষা দেখিলে মনে হয়, আজকাল সে ভালই আছে এবং সুখেই আছে। দৃষ্টি বিনিময় হইলে সে ইচ্ছা করিয়াই দৃষ্টি সরাইয়া লইয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই সে তাহাকে চিনিতে চাহে নাই।

সুপ্রিয়া সোমনাথের সংবাদ শুনিয়া ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল। সোমনাথ কলিকাতায় ফিরিয়াছে এবং বর্তমানে কলিকাতায় রহিয়াছে এই চিন্তাটাই তাহাকে অন্যমনস্ক করিয়া তুলিল, ফলে কলাবতীর প্রসঙ্গটায় ভাল করিয়া কান দিবার মত মনঃসংযোগ করিতে পারিল না। তাই শঙ্কর যখন

বিদ্রূপ-তরল কণ্ঠে মন্তব্য করিল যে, অদূর ভবিষ্যতে একদিন শহরের সোমনাথকে কলাবতীর নায়কের ভূমিকায় পর্দায় অভিনয় করিতে দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, তখন যেন সুপ্রিয়া সহসা সম্বিৎ ফিরিয়া পাইল। বঙ্কিম-গ্রীবা উন্নত করিয়া ভ্রূকুঞ্চিত চাহনি দিয়া কহিল,—কি বললে?

—ওইত বললাম। সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী কলাবতীর নায়ক সোমনাথের সৌম্যমূর্তি ছায়াচিত্রে প্রতিফলিত হয়ে সহরের সাধারণ জনের কৌতূহল পরিতৃপ্তি করবে। সংবাদ পত্রে, রাস্তার প্লাকার্ডে প্লাকার্ডে চারিদিকে দেখা যাবে সোমনাথের পাশে প্রেমপূরিত-লোচনা-কলাবতী! সোমনাথ-কলাবতী! সোমনাথ-কলাবতী!

সুপ্রিয়া তীব্র প্রতিবাদে চীৎকার করিয়া উঠিল,—মিথ্যা কথা! সোমনাথ সিনেমায় নামছে, কোন কাগজে বেরিয়েছে?

সেই তীক্ষ্ণ রুক্ষ করুণ স্বর আর্ত্তনাদের মত আছাড় খাইয়া পড়িল। শঙ্কর তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অত্যন্ত মিষ্টকণ্ঠে বলিয়া যাইতে লাগিল,

—আহা, অত অধৈর্য্য হচ্ছ কেন? এখনও বেরোয় নি, তবে দু'দিন অপেক্ষা কর সব কাগজেই বেরুবে। তখন সোমনাথের গুণের গন্ধ হতে তুমিও বঞ্চিতা হবে না। শিক্ষিত, সুদর্শন, সহরের অভিজাত বংশোদ্ভব সোমনাথের প্রশংসায় প্রতিটি সংবাদপত্র মুখর হয়ে উঠ্‌বে। সোমনাথের পাব্লিসিটির প্রকাণ্ড পরিচয় পত্র এখনই আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি!

তেমনই রুক্ষ স্বরে সুপ্রিয়া কহিল,—সোমনাথের প্রতি ঈর্ষায় তুমি এতটা অন্ধ হয়েছ যে তার অসাক্ষাতে তার অসম্মান করতে, তার প্রতি কটূক্তি করতে তোমার এতটুকু বাধছে না।

—ঈর্ষা? বিন্দুমাত্র না। সোমনাথের যশঃসৌরভে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হোক, কলাবতীর কলকণ্ঠের সঙ্গে সোমনাথের উদাত্ত স্বর দর্শক চিত্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলুক, তাতে আমার এতটুকু ক্ষোভ নেই। শুধু তোমার প্রসন্নতা থেকে আমায় বঞ্চিত কোরোনা, এইটুকু প্রার্থনা।

—মিথ্যার আশ্রয় নিয়েই তুমি সে প্রসন্নতা দাবী করতে চাও?

—বারবার মিথ্যা শব্দটা প্রয়োগ করে তুমি আমাকেও সম্মানিত করছ না সুপ্রিয়া! বেশ, কালই চল আমার সঙ্গে হগমার্কেটে; তোমার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়ে আনি!

—হগমার্কেটে কেন? এর মধ্যে এত খবর তুমি কোথায় পেলে?

শঙ্কর হিসাব করিয়া হগমার্কেটের উল্লেখ করে নাই, কিন্তু এখন ফিরিবার উপায় নাই। মিথ্যাটা এত শীঘ্র ধরা পড়িয়া যায় দেখিয়া তাড়াতাড়ি কহিল,

—মনে আছে, একদিন তুমি আমায় স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলে যে আমার প্রতিপক্ষ সোমনাথ? স্মৃতিতে সে কথাটা ভালো করেই ধরে রেখেছি, একদিনের জন্যেও ভুলিনি, ভোলা সম্ভবও নয়। প্রতিপক্ষকে হীনভাবে জয় করতে আমি চাই না, তাই বলে তার গতিবিধি সম্পর্কে আমি উদাসীন থাকব, এতটা আশা করাও কি উচিত হবে? তাই সোমনাথ আমায় চিনতে না চাইলেও বর্ত্তমানে সোমনাথের স্বরূপটা আমিই চিনতে চাইলুম, এবং প্রাথমিক সংবাদগুলো সংগ্রহ করেই তোমায় প্রথম পরিবেষণ করছি।

সুপ্রিয়া কিছুক্ষণ স্থির থাকিয়া বলিল,—বেশ, আমি কালই তোমার সঙ্গে হগ মার্কেটে যাবো। যথা সময়ে ট্যাক্সি নিয়ে এলো।

শঙ্কর বিস্মিতকণ্ঠে কহিল,—সেকি! মাসিমা যেতে দেবেন কেন?

তীক্ষ্ণকণ্ঠে সুপ্রিয়া উত্তর করিল,—তিনি যেতে দেবেন কি দেবেন না, সে ভাবনা তোমার নেই। তবে আমি কাল তোমার সঙ্গে হগমার্কেটে যাচ্ছি, এটা তুমি নিশ্চয় জেনে যাও।

শঙ্কর স্খলিতকণ্ঠে কহিল,—বেশ ত! বেশ ত! দেখো, আমার কথা সত্যি কি না।

সোমনাথ সেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে ষ্টুডিও হইতে বাহির হইতেই দেখিল, কলাবতী তাহার প্রকাণ্ড 'কার'টায় বসিয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছে। সোমনাথ সম্মুখে পড়িতে তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কলাবতীই প্রথমে কহিল,—নমস্কার! কাষ শেষ হয়ে গেল? ফিরছেন নাকি?

সোমনাথ ক্ষুদ্র একটি প্রতি-নমস্কার করিয়া সম্মতিসূচক মস্তক আন্দোলিত করিয়া উত্তর করিল—হাঁ!

—যদি আপত্তি না থাকে আমার গাড়ীতেই আসতে পারেন।

সোমনাথ আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিয়া বিনয়ের সহিত কহিল,—প্রয়োজন নেই।

—আপনার প্রয়োজন না থাকলেও আমার আছে। মার্কেটে যাচ্ছি। আমার এক বান্ধবীর পার্টিতে রাত্রে নিমন্ত্রণ আছে। কিছু ভালো ফুল আর কিছু উপহার দ্রব্য কিনতে হবে। ষ্টুডিওর বাইরে আমাকে সাহায্য করার জন্য এ অনুরোধটুকু কি করতে পারি?

সোমনাথ তথাপি সাড়া না দিয়া অপ্রসন্ন কণ্ঠে কহিল,—অনুরোধ না আদেশ?

সঙ্গে সঙ্গে হাত জোড় করিয়া কলাবতী অত্যন্ত সৌজন্য সহকারে কহিল,—না না, একান্তই অনুরোধ! আপনি অনায়াসেই এ অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারেন। তবে না করলে, আজ সত্যিই আমার অত্যন্ত উপকার করা হবে।

সোমনাথ কি ভাবিয়া ভিতরে গিয়ে বসিল।

হগমার্কেটে প্রবেশ করিয়া কলাবতী প্রচুর ফুল ফল কিনিয়া ফেলিল। এক সময় সোমনাথ থাকিতে না পারিয়া কহিল,—এত ফুল ফল উপহার দেবেন? এ অপব্যয়!

কলাবতী হাসিয়া কহিল,—জানি। উপার্জ্জনটাও সব সময় যেমন সৎ হয় না, ব্যয়টাও তেমনই সব সময় সদ্ব্যয় হয় না। অপব্যয়ের আনন্দ আপনি

ঠিক বুঝতে পারবেন না সোমনাথবাবু! বলিতে বলিতে সে একটা জুয়েলারীর দোকানে প্রবেশ করিল। দেখিতে দেখিতে একটা মূল্যবান 'ক্যাটস্ আই' অঙ্গুরী তুলিয়া কহিল,—কত দাম?

দোকানী বিনীতভাবে উত্তর করিল,—নেপালের যুবরাজ আজই দেড় হাজার দিতে চেয়েছিলেন, শেষ পর্য্যন্ত একটা নীলায় তাঁর দৃষ্টি পড়ায় এটা আর নেওয়া হয় নি।

—বেশ দেড় হাজারই আমি দেব। দেখুনত সোমনাথবাবু! এটা আপনার 'রিঙ ফিঙ্গারে'র মাপে হয় কিনা? সোমনাথ ইতস্ততঃ করিয়া শান্তকণ্ঠে কহিল,—গরীবকে প্রলোভন দেখাবেন না।

—সামান্য 'ক্যাটস্ আই' আপনাকে প্রলুব্ধ করতে পারবে না, তা আমি জানি। ভয় নেই, উপহারটা আপনাকে নয়, আমার বান্ধবীকেই। কিন্তু তার আঙ্গুলের মাপ আনতে ভুল হয়েছে। আমার আঙ্গুল মোটা। আপনার আঙ্গুলগুলো অনেকটা তারই মত। তাই মাপটার জন্যেই বলছি।

সোমনাথ দেখিল, এ অনুরোধ অন্যায় নয়। অঙ্গুরী পরিয়া দেখিল, ঠিক হইয়াছে। কলাবতী চেক লিখিয়া দিল। সোমনাথ অঙ্গুরীটা খুলিতে যাইবে এমন সময় দেখিল, শঙ্কর সুপ্রিয়াকে লইয়া অনতিদূরে তাহাদের লক্ষ্য করিতেছে। সোমনাথের মুখ দিয়া অজ্ঞাতে বিস্ময়টা প্রশ্নের আকারে বাহির হইয়া আসিল, সুপ্রিয়া?

শঙ্কর বিজয়ীর ভঙ্গিমায় উন্নতবক্ষে আগাইয়া আসিয়া দক্ষিণ কর প্রসারিত করিয়া চাপা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে আহ্বান করিল,

—সোমনাথ! কনগ্র্যাচুলেসন্স্!

সোমনাথ প্রত্যুত্তরে তাহার প্রসারিত করটা উপেক্ষা করিয়া আপন হাত সরাইয়া লইল। উত্তরে একটা শব্দও উচ্চারণ করিল না, কিন্তু তাহার অঙ্গুলিশোভিত 'ক্যাটস্ আই' অঙ্গুরীটা শঙ্কর বা সুপ্রিয়া কাহারও দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

ততক্ষণে কলাবতী সোমনাথের পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সোমনাথকে তদবস্থায় দেখিয়া, শঙ্করের বিদ্রূপ শুনিয়া, এবং অদূরবর্তী সুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া, অবস্থাটা মোটামুটি সে অনুমান করিয়া ফেলিল। সে ইচ্ছা করিয়াই এই পারিপার্শ্বিকতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল। বাহুতে একটা মৃদু আকর্ষণ করিয়া অভিনেত্রীসুলভ তরল দরদীকণ্ঠে কহিল,

—এস সোম! এখনও আমাদের অনেক কায বাকী।

শঙ্কর ফিরিলে সুপ্রিয়া কহিল,—বাড়ী ফিরে চল শঙ্করদা!

এমন একটা কাকতালীয় যোগাযোগের জন্য শঙ্কর কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিল না। আজ বিধাতা তাহার প্রতি প্রসন্ন! নহিলে এমন যোগাযোগ সযত্নে ষড়যন্ত্র করিলেও বড় একটা ঘটিয়া উঠে না। অত্যধিক উল্লাসে শঙ্কর উদার হইয়া উঠিল। তাই তৎক্ষণাৎ সম্মতি দিয়া কহিল,—বেশ ত, চল না।

ট্যাক্সিতে উঠিয়া এক অবসরে শঙ্কর সুপ্রিয়ার হাতখানি তুলিয়া লইল। সুপ্রিয়া বাধা দিল না। শঙ্কর কহিল,—আশা করি এবার তুমি অমত করবে না সুপ্রিয়া! বলত, কালই আমি যথারীতি বিয়ের প্রস্তাবটা করে ফেলি।

সুপ্রিয়া স্বপ্নোত্থিতার মত প্রশ্ন করিল,—কালই?

শঙ্কর হাসিয়া কহিল,—হাঁ কালই! তবে বিয়েটা নয় প্রস্তাবটা।

সুপ্রিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া ধীরে উচ্চারণ করিল,—ভেবে দেখি!

শঙ্কর সহসা উত্তেজিত হইয়া কহিল,—ভেবে দেখি, ভেবে দেখি, ভেবে দেখি! আর কি ভাববে সুপ্রিয়া? এর পরেও তুমি ভাবতে চাও?

সুপ্রিয়া শান্ত শ্রান্তকণ্ঠে কহিল,—বিয়ের পরও কি তুমি এই ভাবেই আমাকে পীড়ন করবে? আমার ওপর জুলুম চালাবে শঙ্করদা?

সেই শীতল কণ্ঠস্বর শঙ্করকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। সে খলিতকণ্ঠে কহিল,—আশ্চর্য্য কথা সুপ্রিয়া! আমি তোমায় পীড়ন করব? জুলুম

চালাবো ? এমন কথা তুমি বললে ? বল বল সুপ্রিয়া, তুমি কি চাও ? আমি কি শেষে আত্মহত্যা করব ?

সুপ্রিয়া ইতিপূর্ব্বেই হাতখানা সরাইয়া লইয়াছে ! বলিল,—আত্ম-প্রত্যয় হারালে আত্মহত্যার কথাটাই আগে মনে আসে। মনে রেখো, আত্মহত্যার উল্লেখটা নিজের প্রতি এবং যাকে শোনানো হয় তারও প্রতি চরম অপমান। গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে থামিল। সুপ্রিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলে শঙ্কর একইভাবে অনেকক্ষণ গাড়ীর মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ট্যাক্সীওয়ালা প্রশ্ন করিল,—বাবুজী ! এবার কোথায় যাবেন ?

বিরক্তিভরে শঙ্কর উত্তর করিল,—জাহান্নম্-মে।

রসবোধহীন শিখ ড্রাইভারের এমন একটি মনোরম স্থানের সঙ্গে সাক্ষাত পরিচয় না থাকায় সে পুনরায় জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

—ঘুমাও। ড্রাইভার বুঝিল, যে কোন কারণেই হউক বাবুজীর তবিয়ত ভাল নাই। সে গাড়ী ঘুরাইয়া প্রশস্ত রাজপথে পড়িল।

এদিকে সোমনাথ সেই যে নিশ্চুপ হইয়া গিয়াছিল আর একটিও কথা কহে নাই। কলাবতীও তাহাকে আর প্রশ্ন করিয়া বিরক্ত করে নাই। এস্‌প্ল্যানেডের মোড়ে পুলিশ গাড়ী থামাইল। এবার কলাবতী প্রশ্ন করিল,—আপনাকে কোথায় নামিয়ে দেব ?

—এইখানেই। বলিয়া সোমনাথ সহসা নামিয়া পড়িল। সে তাড়াতাড়িতে কলাবতীকে তাহার অঙ্গুরীয়কটা প্রত্যর্পণ করিতে ভুলিয়া গেল।

গাড়ীর পর গাড়ী জমিয়া যাইতেছে। কলাবতী ভাবিল, সম্মুখে কোন অঘটন ঘটিল নাকি ? সেও গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। মুহূর্ত্তে একদল পথচারী তাহাকে প্রায় ঘেরিয়া ধরিল। সকলের মুখে চোখে দারুণ বিস্ময় ও উত্তেজনা ! কলাবতীকে এভাবে তাহাদের মধ্যে পাইয়া তাহারা যেন একদিনে স্বর্গরাজ্য লাভ করিয়াছে। এই আকস্মিক ঘটনাটাকে ফেনাইয়া করিয়া আত্মীয় বন্ধু সমাজে মুখরোচক করিয়া পরিবেষণ

করিবে তাহাই সকলে মনে মনে রিহার্সাল দিতে লাগিল। পুলিশের হুইসিল বাজিয়া উঠিল। রাস্তা পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

কলাবতী পুনরায় মোটরে আত্মগোপন করিল।

সোমনাথ চলিয়া যাইবার পর ডাঃ লাহিড়ী দেখিলেন, বাড়ীটা যেন নিরানন্দে ডুবিয়া গিয়াছে। সোমনাথ থাকিতে প্রতিদিন সন্ধ্যাটা নানাবিধ আলোচনায় বেশ ভরাট হইয়া থাকিত।

ধীরা একদিন একখানা পত্র হাতে প্রবেশ করিয়া ডাঃ লাহিড়ীকে বলিল, কলিকাতা হইতে তাহার দিদি আমন্ত্রণ করিয়া বার বার অনুরোধ জানাইয়াছে। ডাঃ লাহিড়ী তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মতি দিয়া বলিলেন, ভালই হইয়াছে। তাঁহার ছুটিও পাওনা হইয়াছে আর সোমনাথ চলিয়া যাইবার পর বাড়ীটাও যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিতেছে। অতএব আগামী পরশুই যাত্রার আয়োজন করা হউক।

যথারীতি ছুটি লইয়া তাঁহারা মাস দুয়েকের জন্য কলিকাতার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া প্রতিদিন যেন উৎসব লাগিয়া গেল। ধীরার দিদি মীরার স্বভাবটি অত্যন্ত মিষ্ট। অনেকগুলি সন্তানের মা হইলেও আনন্দ পরিবেষণের সুযোগ পাইলে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে সে এখনও তৎপর। স্বামী জয়দেববাবু ইনকম-ট্যাক্স অফিসর। মীরার বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাঁহার বিশ্বাস অগাধ, তাই সাংসারিক দিকটা মীরাকেই ছাড়িয়া দিয়াছেন ষোল আনা।

সাতদিনেই কলিকাতা সহর পুরাতন হইয়া গেল। মীরার তৃতীয় পুত্র সুচারু মাট্রিক দিয়া বাড়ীতে বসিয়াছিল। তাহার অবসরের সুযোগ লইয়া মা ও মাসীমা দুইজনে মিলিয়া দুর্দান্ত অশ্ব দুরন্ত করিবার কাজটা কাজে লাগাইয়া লইল।

চিড়িয়াখানা, মিউজিয়ম, বোট্যানিক্যাল গার্ডেন, পরেশনাথ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল, লেক, ইডেন গার্ডেন, রাজেন্দ্র মল্লিকের মার্বেল প্যালেস প্রভৃতি সকল দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখা হইয়া গেলে আরম্ভ হইল নিত্য সিনেমা সন্দর্শন। উপর্য্যুপরি পাঁচ সাত দিন পরে তাহাতেও ভাঁটা ধরিলে বাছিয়া বাছিয়া পুরাতন বান্ধবী ও আত্মীয়াদের বাড়ী হানা দেওয়া আরম্ভ হইল। পনের দিন পরে তাহাতেও যখন আর বৈচিত্র্য রহিল না, তখন ধীরা ভাবিল আগ্রাই ভাল। আগ্রা তাহাকে টানিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন ডাঃ লাহিড়ী ধীরাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, —সুপ্রিয়ার সন্ধান পেয়েছি। যাবে একদিন তার সঙ্গে আলাপ করতে?

ধীরা সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া কহিল,—কোথায়, কী ভাবে তার সন্ধান পেলে?

ডাঃ লাহিড়ী বলিতে লাগিলেন,—ডাঃ ঘোষাল হচ্ছেন আমাদের আমলের পুরোনো প্রফেসর। সে দিন রাস্তায় হঠাৎ মুখোমুখি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি তখন ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরী থেকে ফিরছেন। পথের মাঝখানে প্রণাম করতেই তিনি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন, চিনতে পারলেন না। অবশ্য এতদিন পরে চেনা সম্ভবও ছিল না। পরিচয় দিলুম। পথের মাঝেই আমায় জড়িয়ে ধরে আলাপ জমালেন। শেষে, আমাকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন এবং প্রচুর আদর আপ্যায়নসহ প্রচুর চা জলযোগে পরিতৃপ্ত করিয়ে তবে ছাড়লেন। তাঁর মেয়েটির নাম শুনলুম সুপ্রিয়া! নামটা আমরা কেউই ভুলিনি নিশ্চয়। কৌশলে সোমনাথের প্রসঙ্গটা তুলতেই জানতে পারলুম, রিসার্চ্চ স্কলার সোমনাথই আমাদের সেই সোমনাথ! সোমনাথ তাঁদের কাছে বর্ত্তমানে নিরুদ্দিষ্ট।

ধীরা কহিল,—ভালই হয়েছে। বাড়ীটার নম্বর দাও। আমি কাল একাই যাবো।

—কেন অধীন কি অপরাধ করলো?

—অপরাধ অনেক। তুমি পুরুষ।

ডাক্তার যেন অপ্রতিভকণ্ঠে উত্তর করিলেন,—ওঃ, সে কথাটা ভুলেই গিয়েছিলুম! ভাগ্যিস্ তুমি স্মরণ করিয়ে দিলে! তবে আর একটা খবর জেনে যাও। শঙ্কর নামে একটি স্মার্ট এবং সুচতুর যুবক সেখানে যাতায়াত করে। ভাবে মনে হোলো, সুপ্রিয়ার ওপর যেন তার কিছুটা প্রভাব আছে।

—ধন্যবাদ! তোমার সংবাদটুকু আমাদের সাক্ষাতকারের প্রয়োজনীয় অংশ।

পরদিন দ্বিপ্রহরে ধীরা সুপ্রিয়ার ওখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই দুই বাহু দিয়া সুপ্রিয়াকে বন্দিনী করিয়া কহিল,—এতদিন পরে ধরেছি। ওঃ, কি কঠিন মেয়ে তুমি সুপ্রিয়া!

অপরিচিতা এই নারীকে দেখিয়া এবং তাহার এই রহস্যজনক উক্তি শুনিয়া সুপ্রিয়া কি জবাব দিবে ভাবিয়া পাইল না। তথাপি তাহারই গৃহাগতা অপরিচিতাকে একটা কিছু বলিয়া আহ্বান না জানাইলে অসৌজন্য প্রকাশ পাইবে, তাই ধীরে মৃদু হাসিয়া বলিল,—কঠিন কি কোমল তার বিচার পরে হবে। এখন ছাড়ুন, আপনাকে ভালো করে দেখি।

বন্ধন মুক্ত করিয়া দিয়া সামনাসামনি ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া ধীরা কহিল,—দেখ দেখি, চিনতে পারো কি না?

সুপ্রিয়াও দুষ্টামির হাসি হাসিয়া করজোড়ে বিনীতভাবে কহিল,

—চিনি চিনি করি চিনিতে না পারি,
ধরা দিতে তাই অনুরোধ করি।

ধীরা হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল, কহিল,—চমৎকার! সার্থক হোলো আমার আসা!

পরক্ষণেই বাহুটা বাড়াইয়া দিয়া কহিল,—দেখত, গন্ধে কিছু পরিচয় পাও কি না?

গম্ভীর কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,—জীব বিশেষের স্বগোত্রা হ'লে ও বিভা থাকত। দুঃখের বিষয় তাদের সঙ্গে আমার কোন দিনই আত্মীয়তা নেই। কোনও জন্মে ছিল কি না জানি না।

ধীরা আবার হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়িল। ঝরণার স্রোতের মত মিষ্ট অবিরাম সে হাসি।

সুপ্রিয়ার ভারী ভাল লাগিল এই নারীকে! বয়সে তাহাপেক্ষা অনেক খানিই বড়, তথাপি কি সুন্দর! সুন্দর তাহার দেহ, সুন্দর তাহার বেশ, সর্ব্বোপরি সুন্দর তাহার আচরণ।

ধীরা কহিল,—পদ্ম-গন্ধ ইতর জীবের উপভোগ্য নয়। মানুষের আঘ্রাণেই তার গৌরব! আমায় চিনতে পারলে না? আমি সেই পদ্মাসনা পদ্মা!

সুপ্রিয়া কৃত্রিম সন্ত্রাসে পিছাইয়া গিয়া কহিল,—সর্ব্বনাশ! পদ্মিনী নয়, পদ্মজা নয়, পদ্মাবতী নয় একেবারে পদ্মা? শুধু পদ্ম হলেও সান্ত্বনা ছিল, পান করতুম পদ্মমধু! মালা করে মাথায় পরতুম। কিন্তু পদ্মার ভাঙনকে ভয় করি যে আমি! কখন অজ্ঞাতে কোন কূল ক্ষইয়ে দেবে কে জানে? যাক, এদিকে কথায় কথায় পরিচয়টা যে কেবলই আড়ালে রয়ে যাচ্ছে দিদি!

—দিদি বলে ডাকলে এইত পরিচয়! এর বড় পরিচয় আর কি হতে পারে? আমি ধীরা। সোমনাথকে চেন?

সুপ্রিয়া সহসা যেন নিভিয়া গেল। ধীরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে এ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। সুপ্রিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল,—বুঝলুম, আপনি সমীদার আত্মীয়া! বসুন, একটু চা নিয়ে আসি।

—কোন প্রয়োজন নেই। চা আমি এখন খাইনা। তুমি বোসো।

ধীরা কহিল,—সোমনাথ আগ্রায় গিয়ে আমাদের ওখানেই ওঠে। অসুস্থ হয়ে পড়ে' একদিন তোমার নামটা ও উচ্চারণ করে। সুস্থ হলে এ

সম্পর্কে ও উত্তর দিতে অনিচ্ছা জানায়। তখনই বুঝেছিলুম ওর ব্যথা ওই নামটায় জড়িয়ে আছে, তাই আমরাও অবিশ্যি তা নিয়ে আর পীড়াপীড়ি করিনি। এখন বুঝলুম, ব্যথাটা এদিকেও বড় কম নয়। সোমনাথের নামের সঙ্গে সঙ্গে ব্যথায় তোমার মুখখানি ম্লান হয়ে এলো। জানি না, এ শুধু অভিমান, না এর পিছনে আছে অপমান।

সুপ্রিয়া দেখিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী এই নারী একেবারে তাহার অন্তরের অন্তঃপুরে প্রবেশপত্র আদায় করিতে চাহে। ইহাকে এখনই ছাড়পত্র দেওয়া কতটা সঙ্গত হইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া সে কৌশলে কহিল,

—এ সবের মানদণ্ড আমার গোচরে নেই দিদি! তাই আপনার প্রশ্নের জবাব নিক্তির ওজনে দিতে পারলুম না বলে ক্ষমা করবেন। তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এটুকু বুঝেছি যে আপনি সমীদা'র কল্যাণ কামনা করেন এবং ঠিক সেই কারণেই আমার কল্যাণ বুদ্ধির পরিচয় লাভে উৎসুক হয়ে উঠেছেন।

ধীরা সুপ্রিয়ার কথায় চমৎকৃত হইল, কহিল,—একেবারে খাঁটি কথা বলেছ ভাই। জানি, এত শিগ্‌গীর আমার মত একজন অপরিচিতাকে বিশ্বাস করা শক্ত, তবুও অকপটে জানাচ্ছি, তোমার বিশ্বাস আমাকে আদায় করতেই হবে। তোমায় দেখে আমি একটা কথা ভেবে পাচ্ছি না যে, কোথায় রয়েছে সেই খেয়ালীর বিচিত্র খেলা, যেখানে তোমার মত বুদ্ধিমতীকেও হতবুদ্ধি করে তুলেছে!

সুপ্রিয়া কপালে করস্পর্শ করিয়া কহিল,—বুদ্ধির অহঙ্কারে চিত্তের চৈতন্য হারালে কা'কে দোষ দেবেন দিদি?

ধীরা এই কথায় একেবারে নিশ্চুপ হইয়া গেল। সুপ্রিয়া হয়ত অন্তর-খানিই প্রকাশ করিয়া ফেলিল, কিম্বা হয়ত কিছুই প্রকাশ করিল না। ধীরা একইভাবে তাহার অঞ্চলপ্রান্তস্থ চাবির গোছাটা অঙ্গুলিতে জড়াইতে

কাঁপিল আর দুলিতে লাগিল। সহসা একসময় উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—আজ আসি ভাই! কাল আবার আসব, কিছু মনে কোরো না।

—সে কি কথা! নিশ্চয় আসবেন, নিশ্চয় আসবেন। তবে আর একটু বসুন। চা নিয়ে আসি। সুপ্রিয়া হরিণীর ন্যায় ত্বরিত-গতিতে কক্ষ ত্যাগ করিল।

ধীরা পরদিন পুনরায় আসিল, অজস্র হাসিল এবং অজস্র বাক্যের বন্যায় সুপ্রিয়াকে ভাসাইয়া দিল।

পর পর তিন দিনে ধীরা সুপ্রিয়াকে স্নেহ দিয়া, সহানুভূতি দিয়া, দরদ দিয়া, একেবারে আপন করিয়া ফেলিল। কোথায় ঘুচিয়া গেল বয়সের ব্যবধান; কোথায় ঘুচিয়া গেল অনাত্মীয়তার অতি-দুস্তর দুরতিক্রম্যতা!

এমন একটি আপন জনের নিকট আজ নিজেকে ব্যক্ত করিতে পাইয়া সুপ্রিয়াও যেন বাঁচিয়া গেল। যে বেদনার গুরুভারে ভারাক্রান্ত হইয়া সে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল, সেই বেদনাকে সাময়িকভাবে মুক্ত করিয়া দিতে পাইয়া সুপ্রিয়ার মনে হইল যেন বহুদিনের সঞ্চিত আবর্জ্জনা নিঃশেষে পরিষ্কার হইয়া গেল। সুপ্রিয়া কখন হাসিয়া কখন কাঁদিয়া তাহার বক্তব্য শেষ করিয়া লঘুচিত্তে শেষে কহিল,—এখন এই জটিল গ্রন্থি মোচন করি কেমন করে বলুন ত দিদি! একদিন বুদ্ধিমতী বলে, মনে মনে আমার অহঙ্কার ছিল। আজ দেখছি, সেই বুদ্ধির ঘট শূন্য। সেই শূন্য ঘট পূর্ণ হবে কি দিয়ে?

ধীরা বিষণ্ণ অথচ উৎসাহিত হাসি হাসিয়া বলিল,—নিশ্চয়ই হবে। অঙ্কশাস্ত্রে বলে শূন্যের মূল্য হচ্ছে বামে নয় দক্ষিণে! অর্থাৎ শূন্যের আগে সংখ্যা না বসালে শূন্য শূন্যই থেকে যায়। দক্ষিণান্ত করলে সেই এক সংখ্যাটাকে যথাস্থানে বসাতে পারি, অন্ততঃ চেষ্টা করতে পারি।

—আপনাকে দক্ষিণা দেব তেমন সাধ্য কই। বরং আপনারই দক্ষিণা ভিক্ষা করছি। ধীরা প্রবলবেগে মস্তক আন্দোলিত করিয়া কহিল,

—দক্ষিণা আমার চাই-ই, নইলে যজ্ঞ অসমাপ্ত থেকে যাবে এবং যজ্ঞেশ্বরও আসবেন না।

—কি সে দক্ষিণা ?

—সে দক্ষিণা তোমার বুদ্ধি! আমার বুদ্ধিতেই এখন তোমায় চলতে হবে, ফিরতে হবে, হাসতে হবে, কাশতে হবে, বসতে হবে, উঠতে হবে……

সুপ্রিয়া তরলকণ্ঠে কহিল,—হেলতে হবে, দুলতে হবে, নাচতে হবে, গাইতে হবে……

—খেতে হবে, খাওয়াতে হবে, বলতে হবে, বলাতে হবে। রাজী ?

—রাজী। কিন্তু চুক্তিতে সময় উল্লেখটা নিশ্চয়ই বে-আইনী নয় ?

—নিশ্চয়ই নয়। সময়, এই জন্মটা মাত্র। আগামী জন্মে এ চুক্তির দায়িত্ব কারো থাকবে না।

উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল! ধীরা কহিল,—শোন সুপ্রিয়া! একের পীঠে শূন্য দিলে দশ হয়। এখন দশের শূন্যটা বেশ দেখা যাচ্ছে, কিন্তু একের ওপর একটা কালোমাছি বসে থাকাতে সেই শূন্যটা মূল্য পাচ্ছে না। মাছিটাকে যতই তাড়ানো যাচ্ছে, ততই সে একটাকে চেপে দিয়ে শূন্যটাকে মূল্যহীন প্রমাণ করে দিচ্ছে।

—এখন উপায় ?

—মাছি মারা কাব আমার নয়। তবে মাছিটাকে আমি ঝড়ের বেগে তাড়া করব, এমন তাড়া করব যে, সে যেন আর একের ওপর বসতে না পারে।

—সে উপায় কি ?

—মন্ত্রগুপ্তি কি প্রকাশ করতে আছে ? এখন তুমি শঙ্করের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও।

সুপ্রিয়া শিহরিয়া কহিল,—একটা কথা, শঙ্করদা যদি আজ সহসা জেনে বসে যে এতকাল আমি তার সঙ্গে মিথ্যে ছলনা করে এসেছি, তা হলে

কিন্তু কারো বাক্ষে থাকবে না দিদি! আপনি তাকে চেনেন না। বাইরে সে অতি শান্ত ভদ্র, কিন্তু অন্তরে সে সাপের চেয়েও ক্রূর, বাঘের চেয়েও হিংস্র!

ধীরা শান্তকণ্ঠে কহিল,—জানি। তবু তা'কেই আমার সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ভুলে যাচ্ছ, বুদ্ধিটা তোমার দক্ষিণা স্বরূপ আমায় দান করেছ, কাযেই নির্ব্বিচারে আমাকে আপন পথ অনুসরণ করতে দেওয়াই তোমার কর্ত্তব্য। কারণ তুমি চুক্তিবদ্ধ!

সুপ্রিয়া মৌনতা দিয়া ধীরাকে মানিয়া লইল।

শঙ্কর সেদিন সেই যে চলিয়া গিয়াছিল আর এ কয়দিন আসে নাই। কতকটা নিরাশায়, কতকটা পরবর্ত্তী ভূমিকার চিন্তায়, সে কয়দিন গভীর ভাবে ব্যাপৃত ছিল। অবশ্য মাঝে দুই দিন ব্যবসাসংক্রান্ত কাযে তাহাকে একটু বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। তাই ফিরিয়া আসিয়া যখন সে সুপ্রিয়ার আমন্ত্রণ পত্র পাইল, তখন উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। সুপ্রিয়া তাহাকে স্বেচ্ছায় আহ্বান করিয়াছে এত বড় আনন্দ সে গোপন রাখিতে পারিল না। বারকয়েক চুলটা আঁচড়াইয়া, দু'তিন রকম পাঞ্জাবী পরিবর্ত্তন করিয়া, কয়েকটা সিগারেট ধ্বংস করিয়া শেষে যথাসময়ে সে প্রফুল্লমনে যাত্রা করিল।

ভাবিয়াছিল, সুপ্রিয়াকে সে একা পাইবে। কিন্তু সুপ্রিয়ার পরিবর্ত্তে ধীরা আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সুপ্রিয়াও আসিয়া উভয়ের পরিচয় ঘটাইয়া দিয়া প্রকোষ্ঠান্তরে আত্মগোপন করিল। শঙ্কর ভাবিল মন্দ নয়। এ ধরণের পরিহাসে সে অনভ্যস্ত, তথাপি তাহার ভালই লাগিল। ধীরার সরস সংলাপ যে কোন পুরুষচিত্তে আনন্দ পরিবেষণ করিতে সক্ষম। ধীরার কণ্ঠে, চক্ষু-তারকার বিচিত্র ভঙ্গিমায় যেন যাদু আছে। শঙ্কর মুগ্ধ হইয়া গেল।

ধীরা প্রথমে অতীত দুর্ঘটনার উল্লেখ করিয়া তাহার প্রতি গভীর সহানুভূতি দেখাইল, তাহার দীর্ঘ-দিনব্যাপী শয্যা-যন্ত্রণার বর্ণনায় কণ্ঠটাকে করুণ করিয়া তুলিল, তাহার পর ধীরে ধীরে তাহাকে অন্য প্রসঙ্গে টানিয়া আনিয়া তাহার চিত্তকে সরস করিয়া তুলিল। কৌশলে বহু প্রশংসাবাদে শঙ্করকে অহঙ্কৃত করিয়া এক অবসরে কহিল,—আমি ভেবে পাইনা শঙ্করবাবু! আপনাদের মত লোক জগতের বঞ্চনা কুড়োয় কেন! আপনি হয়ত বলবেন, ভাগ্য। না না, ওটা কোন যুক্তির কথা নয়। আমি প্রায়ই দেখি, আপনাদের মত মহৎ উদার যারা, তা'রা নিঃশব্দে অপেক্ষাকৃত অনুপযুক্তদের জন্যেই পথ ছেড়ে দেয়।

শঙ্কর এ অবতারণা ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—আপনার কথা ঠিক বুঝলাম না। হতভাগ্যেরা বঞ্চনা কুড়োয় এ কথা মানি। কিন্তু আমি কি করে সেই হতভাগ্যদের তালিকায় পড়লুম জানি না। বুঝিয়ে বললে হয়ত বুঝতে পারি। আমি ভালোই জানি যে, কারো জন্যেই আমি আপন পথ ছাড়িনি এবং ছাড়তে প্রস্তুতও নই।

ধীরা বিপদে পড়িল। শঙ্কর সোজাসুজি আক্রমণ করিয়াছে। সে কহিল,—আপনি নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান। আমার বলায় হয়ত ত্রুটি রয়ে গেছে, সে জন্যে ক্ষমা চাইছি। আপনি সঙ্কল্পে স্থির, একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য। আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনাদের মহত্ব-ভিখারীদের আপনারা অনাদর দেখিয়ে দূর করে দেন না বরং অনুপযুক্ত জেনেও অনুকম্পা দিয়েই তাদের পুরস্কৃত করেন। এ উদারতা আপনাদের স্বাভাবিক।

শঙ্কর সম্পূর্ণ প্রসন্ন হইতে পারিল না, তথাপি হাসিয়া কহিল,

—ক্ষমা চেয়ে লজ্জা দেবেন না। আলোচনার গতি হয়ত সব সময় সরল হওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই বলে, কথায় কথায় ক্ষমা চেয়ে বসলে অপরাধী হয়ে পড়তে হয়।

—ঠিক তাই। তবু সরল ভাবেই বলছি, আপনার সঙ্গে আলাপে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। কাল সন্ধ্যায় যদি আমার ওখানে চায়ের আমন্ত্রণ করি, তা হলে দয়া করে কি সে আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন? বলিয়া জোড়করে উত্তরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রায় অপরিচিতা সুরসিকা সুন্দরী রমণীর অনুরোধ বড় কম প্রলোভন নহে। শঙ্কর এতটা আশা করে নাই, তাই সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল,—এ ত আমার পরম সৌভাগ্য! আচ্ছা এখন আসি, নমস্কার।

—নমস্কার! ভুলবেন না যেন!

শঙ্কর আর উত্তর না করিয়া নামিয়া গেল। ধীরার অনুরোধ তাহার কর্ণে যেন মধু-বৃষ্টি করিতে লাগিল—'নমস্কার! ভুলবেন না যেন!' জগতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত সে শুনে নাই! তাহার মনে হইল সেই অশ্রুত শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতেও বুঝি এত মাধুর্য্য নাই। তাহার চারিদিক ছাইয়া যেন অজস্র আনন্দের মধু-বৃষ্টি নামিল!

শঙ্কর পরদিন সন্ধ্যায় ধীরার ওখানে উপস্থিত হইয়া দেখিল আয়োজন সম্পূর্ণ। সে একাই অতিথি, আর কেহ নাই। ধীরা প্রথমেই প্রচুর জলযোগ সহ চা-পানে শঙ্করকে আপ্যায়িত করিল! শঙ্কর একটা সিগারেট ধরাইয়া প্রশংসাসূচক ধ্বনি করিয়া কহিল,—জীবনে এমন সন্ধ্যা যদি নিত্য আসত!

ধীরা হাসিয়া কহিল,—কিন্তু জীবনটাই যে অনিত্য শঙ্করবাবু!

শঙ্কর কহিল,—আপনি কি বলেন অনিত্য জীবনে নিত্য বলে কিছু নেই?

—আছে।

—সে নিত্য বস্তুটি কি?

—মানুষের প্রেম। জীবন অনিত্য, তাই সে কালের কোলে নিজেকে সমর্পণ করতে বাধ্য হয়; কিন্তু প্রেম নিত্য, তাই সে কালকে তুচ্ছ করে অমর হয়ে থাকে।

শঙ্কর চিন্তিত ভাবে কহিল,

—প্রেম কি শুধুই মনোবিলাস ? দেহের সঙ্গে কি তার কোন সম্পর্কই নেই ?

—আছে। সে সম্পর্ক গড়ে ওঠে দেহকে উপভোগ করে নয় বরং সেই দেহধারীকে উপলব্ধি করে।

শঙ্কর দুইহাতে কপালের দুই প্রান্ত চাপিয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল,

—আমি সাধারণ মানুষ! আমি 'ফিলসফি' বুঝি না।

—কিন্তু 'ফিলসফি' মানুষকে বোঝে। সে সকল মানুষকেই অল্প-বিস্তর ঘিরে আছে।

—থাক ঘিরে। ও নিয়ে আমি মাথা ঘামাতে চাই না।

—না চাইলেও আপনার মাথা কিন্তু সত্যিই ঘেমে উঠেছে।

—আপনি কি বলতে চাইছেন ?

—সুপ্রিয়া……

—সুপ্রিয়া কি ?

—সুপ্রিয়াকে আপনি রক্ষা করুন। তাকে হত্যা করবেন না

—সুপ্রিয়াকে হত্যা করব আমি? আপনার কি মাথা খারাপ হোলো নাকি ?

ধীরা করজোড়ে গদগদ-কণ্ঠে বলিতে লাগিল,

—শঙ্করবাবু! সুপ্রিয়াকে সত্যিই কি আপনি ভাল করে তাকিয়ে দেখেন না ? ও দিন দিন কিভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে, তা কি আপনি লক্ষ্য করেন না! ওর ঝরে পড়বার দিন বুঝি আর বেশী দূরে নয়। একদিকে সোমনাথ আর একদিকে আপনি, কি নির্ম্মমভাবেই না ওকে পীড়ন করে চলেছেন। সেই পীড়ন ওর স্নায়ুর সহ্যশক্তি অতিক্রম করে গেছে। এতে কা'র কি লাভ হবে শঙ্করবাবু ? ও মরবে এটা ততটা দুঃখের নয়, যতটা দুঃখের সেই মৃত্যু ব্যর্থ করে দেবে তিনটি জীবনকে। জানিনা, আপনি সুপ্রিয়াকে কতটা ভালবাসেন, জানিনা সে ভালবাসায় সুপ্রিয়ার

প্রতি আপনার মমত্ব-বোধ, কল্যাণ-বোধ কতটা গভীর। কিন্তু সুপ্রিয়ার অকপট উক্তিতে যেটুকু আমি বুঝেছি তাতে আমি সরলভাবেই নিবেদন করছি, সুপ্রিয়া আপনাকে দিয়েছিল সেবা, দিয়েছিল স্নেহ, কিন্তু দেয়নি হৃদয়! ভালবাসা দিয়েছিল সে সোমনাথকে। বলুন শঙ্করবাবু! সেই সেবা, সেই স্নেহের প্রতিদানে কি আপনি সুপ্রিয়াকে হত্যা করবেন? তার জীবন ব্যর্থ করে দেবেন? বলুন, বলুন শঙ্করবাবু! আপনার সত্যিকার মনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বলুন। আপনি বলেছেন, আপনি সাধারণ মানুষ! সেই সাধারণ মানুষের মনুষ্যত্বের কাছে এক অভাগিনী মেয়ের জন্য আমি প্রার্থনা জানাচ্ছি। দয়া করুন, আমার কথার উত্তর দিন।

ধীরার কপোলদেশ ভাসাইয়া অশ্রুর বন্যা নামিল।

শঙ্কর শান্তভাবে সকল কথা শুনিল, কিন্তু তাহার মুখ দেখিয়া বুঝা গেল না, সে এই সকল কথায় বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিয়াছে বা বিচলিত হইয়াছে। অখণ্ড নির্লিপ্ততায় সে মুখ আচ্ছাদিত! শঙ্কর কহিল,

—সবই বুঝলুম। কিন্তু ও পক্ষের কান্নায় এ পক্ষের করুণতা মুছে যায় না ধীরা দেবী! আমার দিকটাও নিশ্চয়ই উপেক্ষণীয় নয়। তা ছাড়া, এভাবে আমাকে আশা দিয়ে দিনের পর দিন পদ্মদিঘির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খেলিয়ে নিয়ে বেড়ানর অর্থ কি?

—এ ছাড়া আত্মরক্ষার ওর দ্বিতীয় উপায় কি ছিল বলুন ত? সোমনাথ ভুল বুঝে ওকে পরিত্যাগ করে চলে গেল, আপনার মত একজন শক্তিমান পুরুষ মত্ত ঐরাবতের বেগে এগিয়ে আসছেন, এ ক্ষেত্রে দুর্বলা নারীর কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া আর কোন্ উপায় ছিল? সাধারণ নারী হলে এত দিনে ও অনিচ্ছাসত্ত্বেও আপনার কবলিত হয়ে পড়ত কিম্বা মৃত্যুবরণ করে মুক্তিলাভ করত। শুধু ওর শিক্ষিত-পটুত্বই ওকে সেই অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করেছে। বলুন, ওর অপরাধ কোথায়?

শঙ্কর উঠিয়া পড়িয়া, এক বিচিত্র হাসি হাসিতে হাসিতে কহিল,—নাঃ, সুপ্রিয়ার অপরাধ নেই, সোমনাথের অপরাধ নেই, সংসারে কারো কোনও অপরাধ নেই, অপরাধ কেবল একমাত্র শঙ্করের! শঙ্করের ক্ষয়-ক্ষতিতে কোথাও কারও এতটুকু উদ্বেগ নেই! বলিতে বলিতে শঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল,—চমৎকার আপনার আজকের অভিনয় ধীরা দেবী! ধন্যবাদ! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! কিন্তু আমারও জ্ঞান হোলো—'ফ্রেল্‌টি দাই নেম ইজ ওম্যান'।

বলিয়াই শঙ্কর কক্ষ পরিত্যাগ করিল। ধীরা কহিল,—একটা কথা!

নামিতে নামিতে শঙ্কর কহিল,—'নো—নো—নো! নো মোর ওয়ার্ডস্! ইউ হ্যাভ প্লীডেড নাইস্‌লি। লেট মি থিঙ্ক ফ্রম ডিফারেন্ট এ্যাঙ্গল্।'

সোমনাথ কলাবতীর 'কার' পরিত্যাগ করিয়া সোজা আপন মেসে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। হাত মুখ ধুইয়া চেয়ারে বসিয়া চিরুণী তুলিতেই মুকুরে অঙ্গুরীয়কটা জ্বল জ্বল করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। সহসা যেন সোমনাথের অঙ্গুলিটা তপ্ত অগ্নিকণায় জ্বলিয়া গেল। সোমনাথ অঙ্গুরীয়কটা সাবধানে খুলিয়া সুটকেশে রাখিয়া দিল। ভাবিল, কাল ল্যাবরেটরী হইতে ফিরিবার পথে কলাবতীকে ফিরাইয়া দিয়া আসিবে। কিন্তু আজই রাত্রে তাহার বান্ধবীকে উহা উপহার দিবার কথা! যাহা হয় হউক। প্রয়োজন থাকে, সেই লোক পাঠাইবে। এখন সে কোথাও যাইতে পারিবে না।

সোমনাথ ইচ্ছা করিয়াই আজিকার ঘটনাটা ভুলিতে চেষ্টা করিল। শঙ্কর, সুপ্রিয়া, সোমনাথ, কলাবতী, সব কয়টা নাম সে জোর করিয়া সরাইয়া দিয়া একখানা 'পেঙ্গুইন' সিরিজের লঘু উপন্যাস পড়িতে আরম্ভ করিল। মাঝপথে কিন্তু এক সময় সে লক্ষ্য করিল, কখন সে পাঠচিন্তা ত্যাগ করিয়া শঙ্কর সুপ্রিয়াকেই ভাবিতেছে। তাহাদের চক্ষে সে যেন

অপরাধী! সোমনাথ যেন আসামী, আর শঙ্কর-সুপ্রিয়া যেন তাহার বিচারক! না, এ ঔদ্ধত্য অসহ্য। পুস্তকখানা সরাইয়া রাখিয়া আহারের উদ্দেশ্যে সে নীচে নামিয়া গেল।

সোমনাথ পরদিন ল্যাবরেটরীতে গেল এবং যথারীতি কায সারিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অঙ্গুরীয়কটার কথা সে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল। প্রায় পাঁচদিন পরে একদিন তাহা মনে পড়িতেই সে লজ্জিত হইয়া পড়িল। ছিছি, কলাবতী কি ভাবিতেছে! ভাবিতেছে সে লোভী! অবশ্য কলাবতী ইচ্ছা করিয়াই যে অঙ্গুরীয়কটা ফিরিয়া চাহে নাই তাহা সে বেশ বুঝিতে পারিল। কলাবতীর নিকট এরূপ একটা মূল্যবান অঙ্গুরী তুচ্ছ না হইলেও বিশেষ আকর্ষণীয় নয়। হয়ত সে পরোক্ষে সোমনাথকেই উহা উপহার দিয়া অনুকম্পার হাসি হাসিতেছে! ঐশ্বর্য্যের ইন্ধনে আত্মসমর্পণ করে না সংসারে এমন পতঙ্গ কয়টা? কলাবতী কৌশলে তাহাকে করুণামিশ্রিত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছে। কেন? নিশ্চয়ই ইহা উদ্দেশ্যহীন নহে। সেদিন সে তাহাকে 'এস সোম' বলিয়া আহ্বান করিয়াছে। ইচ্ছা করিয়াই সে ও সম্বোধন করিয়াছে। কিন্তু কোন দিন সে তাহাকে অতটা ঘনিষ্ঠ হইবার সুযোগ দেয় নাই। অত্যন্ত কৌশলী অভিনেত্রী তাই সে সুযোগ স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। সে তাহাতে বাধা দেয় নাই। বাধা দিবার স্থান-কাল-পাত্র অনুকূল ছিল না। অসহ ব্যথা ও বিস্ময় তাহাকে মূক করিয়া তুলিয়াছিল। সেই মৌনতাটাকে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থে বেশ কাযে লাগাইয়া লইয়াছে!

পরদিন ফিরি-এর পথে সে কলাবতীর ভবনে উপস্থিত হইল। বাহিরের সজ্জিত কক্ষে সহ-পরিচালক, আলোক-চিত্রশিল্পী প্রভৃতি সিনেমার বীরবৃন্দ সিগারেটের ধূমে কক্ষমণ্ডল ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া নানাবিধ সরস কথা আদি-রসাত্মক রসালোচনায় পরম পরিতৃপ্তিলাভ করিতেছিলেন। সোমনাথ প্রবেশ করিতেই গুঞ্জন-ধ্বনিটা যেন সাময়িক স্তব্ধ হইল।

সহ-পরিচালক অভ্রকুমার অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—আসুন সোমনাথ বাবু! নমস্কার!

—নমস্কার!

এই সময়ে পশ্চাদ্দিকের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া সুসজ্জিতা কলাবতী প্রবেশ করিয়া সম্বোধন করিল,—নমস্কার!

সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বিনয়ে বিগলিত হইয়া করজোড়ে ন্যুব্জ-পৃষ্ঠে সকলেই অমায়িকতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া প্রতিনমস্কার করিয়া উচ্চারণ করিলেন,—নমস্কার! নমস্কার!

সোমনাথ শুধু চেয়ারটায় উপবেশন করিয়া যুক্তকর উদ্দেশে উত্তোলন করিল, মুখে কোন শব্দ করিল না। সকলেই ইহা লক্ষ্য করিলেন কিন্তু কলাবতীর সমক্ষে কেহ কিছু মন্তব্য করিলেন না বা করিতে সাহস করিলেন না! যেহেতু কলাবতী নিজে তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সোমনাথকেই সর্বাগ্রে সম্বোধন করিয়া কহিল,—এই যে সোমনাথবাবু কতক্ষণ?

সোমনাথ সংক্ষেপে উত্তর করিল,—বেশীক্ষণ নয়। এইমাত্র আস্‌ছি।

—তবু ভালো। কাযের লোকের সময় নষ্ট করাটা অপরাধ।

বলিয়াই অপর সকলের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তায় মন দিল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে সকলকে বিদায় দিয়া সোমনাথকে আহ্বান করিয়া বলিল, —আসুন!

সোমনাথ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—কোথায়? আমি আংটিটা ফেরত দিতে এসেছিলুম। সত্যিই আংটির কথাটা একেবারে বিস্মৃত হওয়াটা অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।

—দয়া করে যখন পদধূলি দিয়েছেন, তখন আরও খানিকক্ষণ বসে গেলে আশা করি আর অন্যায় হবে না। প্রদ্যুম্ন হঠাৎ বম্বে চলে যাওয়ায় একটু মুস্কিলে পড়ে গেছি।

কলাবতীর অভিনেত্রী জীবনে পর পর তিনটি পর্য্যায় আছে। প্রথম পর্য্যায়ে সে সামান্তা সহ-অভিনেত্রী, দ্বিতীয় পর্য্যায়ে সে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর অসামান্য গৌরবে অধিষ্ঠিতা, তৃতীয় পর্য্যায়ে সে নিজেই এক বিরাট প্রতিষ্ঠানের একচ্ছত্রী সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। তাহার এক এক পর্য্যায়ের সঙ্গী তাহার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিদায় লইয়াছে বা কলাবতীর অনিচ্ছা লাভ করিয়া বিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। একমাত্র প্রত্যুম্নই সেই ব্যক্তি যে তাহার তিনটি পর্য্যায়েই তাহার সঙ্গে জড়িত আছে। একদা প্রত্যুম্নের সহিত একবার তাহার বিবাহের রটনাটাও সহরে কিছুটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিয়াছিল। যাহা হউক, আজিও তাহার উপর প্রত্যুম্নের প্রভাবটা খুব সামান্য নহে। কলাবতী ইচ্ছা করিয়াই কাযের অছিলায় প্রত্যুম্নকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে।

সোমনাথ এত ব্যাপার জানিত না, তাই কহিল,—শুনেছি সে-ত আপনার কাযেই বম্বে গেছে।

কলাবতী অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া কহিল,—হাঁ আমারই কাযে গেছে, তবে হঠাৎই গেছে। আচ্ছা একটু বসুন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে স্নানটা সেরে নিই। উঃ, এমন মাথাটা ধরেছে। বলিয়াই কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

ক্ষণপরে এক দাসী আসিয়া আহ্বান করিল,—আসুন!

সোমনাথ তাহাকে অনুসরণ করিল। এক সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করিয়া একটা সজ্জিত কেদারায় সে আপন দেহটাকে এলায়িত করিয়া দিল। দাসী চলিয়া গেল এবং ক্ষণপরে প্রচুর ফলাদি লইয়া প্রবেশ করিল। সোমনাথ ইঙ্গিতে তাহা সরাইয়া লইতে বলিল, কিছুই স্পর্শ করিল না। কেবল একগ্লাস সরবৎ মাত্র পান করিল। তৃষ্ণাও পাইয়াছিল। দাসী কহিল,—চা আনব?

—না, দরকার নেই। দাসী চলিয়া গেল।

বিলাসিনীর কক্ষ! কক্ষগাত্রে মূল্যবান সামঞ্জস্যহীন চিত্রাবলী! একই গাত্রে রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দের পার্শ্বে মোনালিসার নগ্ন চিত্র! স্বভাব প্রকৃতির চিত্রের পার্শ্বে পার্থিব পুরুষ-প্রকৃতির নগ্ন চিত্র! সে চিত্রে যত না আর্ট আছে তদপেক্ষা বেশী আছে নিম্নশ্রেণীর কুৎসিত ইঙ্গিত!

সহসা ফুলের মিষ্ট গন্ধে মনটা যেন মুক্ত হইল। দাসী আসিয়া কখন প্রকাণ্ড একঝাড় রজনীগন্ধা বসাইয়া দিয়া গিয়াছে। কক্ষের আলোক পরিবর্তিত হইল। বাসন্তী রঙে কক্ষ প্লাবিত হইয়া গেল। সোমনাথ বুঝিল বাহির হইতে সুইচ পরিবর্তন করা হইতেছে। মনে মনে হাসিল, ভাবিল, এ একরকম মন্দ খেলা নয়।

সোমনাথ বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করিল। টেবিলের উপর কয়েকখানি ম্যাগাজিন ও পুস্তক সযত্ন-বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া রহিয়াছে। ম্যাগাজিনগুলি প্রায় সবই কলা ও বিজ্ঞানের নামে নিম্নশ্রেণীর কুৎসিত বিজ্ঞাপন! পুস্তকগুলিও প্রায় তাই। উহারই মধ্যে একখানা পুস্তক সে বাছিয়া লইল। পুস্তকখানার নাম 'লেডিজ্-ম্যান'।

পড়িতে পড়িতে একসময় তাহার মাথাটা যেন ঘুরিয়া গেল। পুস্তকের পাতা মুড়িয়া সে কক্ষটাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। না, সে ঠিকই আছে। মনটা যেন বেশ সতেজ প্রফুল্ল হইয়া উঠিতেছে। সে পুনরায় পুস্তকে মনোনিবেশ করিল।

সহসা আর এক সময় তাহার মনে হইল, সে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিতেছে। হাতঘড়িটা উল্টাইয়া দেখিল, প্রায় আধ ঘণ্টা সে বসিয়া আছে। মনে মনে সে বিরক্ত হইল।

মুকুরে প্রতিবিম্ব ভাসিয়া উঠিল। মুকুরে দৃষ্টি পড়িতেই সোমনাথ বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া গেল! সেই স্বল্প পীতালোকপ্লাবিত কক্ষে যেন বসন্ত-রাণী অপরূপা হইয়া আবির্ভূতা হইয়াছেন। সূক্ষ্ম বাসন্তী-সিল্কের

শাড়ীশোভিতা কলাবতী যেন পরিপূর্ণ যৌবনের জয়ধ্বারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথ চক্ষু মুদ্রিত করিল।

বিজয়িনী কলাবতী একটা প্রচণ্ড উল্লাস চাপিতে গিয়া আপন উন্নত উরসে প্রবল আন্দোলন তুলিল। পরে ধীর শান্ত বিচিত্র ভঙ্গিমায় নিজেকে আরও মনোমোহিনী করিয়া, সুরে সুরায় তরঙ্গিত উচ্ছ্বাস ঢালিয়া, অপূর্ব কণ্ঠে কহিয়া উঠিল,—কই সোমনাথবাবু! আঙুলে আমার আংটীটা পরিয়ে দিন।

সোমনাথের চক্ষে যেন ইন্দ্রজাল রচিত হইয়াছে। প্রাণপণ বলে নিজেকে কঠিন করিয়া সোমনাথ উত্তর করিল,—এ মন্ত্রের অর্থ কি কলাবতী দেবী?

কলাবতীর চক্ষে খেলিতেছে ভুবন বিজয়ী লাস্যময় অপাঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শায়ক। সে শায়কে বিদ্ধ হইয়া ধরা-শয্যা গ্রহণ করে না এমন বীর আজিও কলাবতী দেখে নাই। কলাবতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি যেন সপ্ত সুরে বাঁধা! সে হাসির ঝঙ্কার কক্ষগাত্রে আছাড় খাইয়া সোমনাথের বক্ষে ঝাপাইয়া পড়িল। কলাবতী কহিল,

—অর্থ? কীসের অর্থ? কার অর্থ? সোম! প্রতি কথায় অর্থ জানতে চেওনা। তা হলে জীবনের অর্থ হারাবে!

—জীবনের অর্থ কি?

—জীবনের অর্থ, জীবনকে আকণ্ঠ পান করা। বিজ্ঞদের জীবনে, মুহূর্তের মূর্খতায় সেই জীবন সরে যায় দূরে। এই মুহূর্তগুলি মানুষের জীবনে আসে নিঃশব্দে অলক্ষ্যে। সময়ে লক্ষ্য করতে না পারলে হতাশ্বাসের সঙ্গেই তাদের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়। বলিয়াই মায়াবিনী দূরে জানালার ধারে গিয়া একটা অতি করুণ অথচ মধুর সঙ্গীতে সোমনাথকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। সোমনাথ মনে মনে প্রশংসা করিয়া কহিল, লক্ষ বক্ষ জয় করিবার সাধনা তোমার নিষ্ফল হয় নাই কলাবতী!

কলাবতী সঙ্গীত শেষে সোমনাথের সম্মুখে আসিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, ডাকিল,—সোম!

সোমনাথ সবিস্ময়ে দেখিল কলাবতীর নয়নে অশ্রুবিন্দু। সোমনাথ কহিল,—একি! আপনি কাঁদছেন?

কলাবতী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। সেই শ্বাসবায়ু তাহার দেহের সুরভিসহ সোমনাথকে স্পর্শ করিল। কলাবতী বিষণ্ণ করুণ কণ্ঠে কহিল,

—হাঁ কাঁদছি! আজ নয় বহু দিন থেকেই কাঁদছি। এ কান্নার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই! সোম! সংসারে সত্যিকার পুরুষ দুর্লভ! বহু পুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি, কিন্তু একজন সত্যিকার পুরুষের সন্ধান আজও পাই নি। প্রথম দিনেই আমি বুঝেছিলুম তুমিই সেই পুরুষ যার একটি স্পর্শে নারী ধন্যা হয়ে যায়, পাষাণী উদ্ধার হয়। আজ যখন সেই সুযোগ পেয়েছি, তখন তুমি আমায় বঞ্চিত করবে কোন অধিকারে সোম!

বলিতে বলিতে সেই মায়াবিনী উদগ্র কামনার উন্মত্ত আবেগে সোমনাথের কণ্ঠলগ্ন হইয়া তাহার পিপাসা-শুষ্ক আতপ্ত অধর অধীর আগ্রহে উন্মুখ করিয়া ধরিল। ক্ষণেকের জন্য সোমনাথ এক অব্যক্ত অনুভূতিতে শিথিল হইয়া পড়িল। তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে! তাহার সমগ্র চেতনা যেন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে!

মুহূর্তমাত্র! পরমুহূর্তে সোমনাথ সমগ্র বলে কলাবতীকে দূরে ছুড়িয়া ফেলিল। কলাবতী সশব্দে মেঝের পড়িয়া গেল। টেবিলের কোণে কপাল কাটিয়া গিয়া রক্তের স্রোত ছুটিল। সোমনাথ পিছনে না ফিরিয়া মাতালের মত টলিতে টলিতে নীচে নামিয়া গেল। পকেটে হাত দিতেই দেখিল, অঙ্গুরিটা তখনও পকেটেই রহিয়া গিয়াছে। পুনরায় উপরে উঠিয়া সে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, কলাবতী তখনও কপালটা চাপিয়া রক্ত রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। রক্তে মেঝেটা লাল হইয়া গিয়াছে। অঙ্গুরীটা টেবিলে রাখিয়া সোমনাথ নতজানু হইয়া কলাবতীকে পরীক্ষা

করিতে গেল। সে যে এমন একটা হৃদয়হীন কাণ্ডের নায়ক হইয়া বসিবে তাহা সে কল্পনা করে নাই। সে অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিল,—সত্যিই ভারী অন্যায় হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন।

রক্তসিক্ত হাসি দিয়া অভিনেত্রী উত্তর করিল,—ক্ষমা চেয়ে আর আমার অপরাধ বাড়াবেন না। যান, এখুনই এ ঘর থেকে চলে যান। পারেন ত ঝিটাকে যাবার পথে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

সোমনাথ যাইবার পথে ঝিকে বলিল, তাহার কর্ত্রী সহসা পড়িয়া গিয়া আহতা হইয়াছেন, এখনই ডাক্তার ডাকিয়া উঁহার শুশ্রূষার প্রয়োজন।

বাসায় আসিয়া সোমনাথ সোজা কলঘরে চলিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া সে স্নান করিল। পরে নিজ কক্ষে ফিরিয়া বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া ভৃত্যকে চা আনিতে আদেশ করিল। চা পান করিতে করিতে দুঃস্বপ্নের মত আকস্মিক এই ঘটনাটাকে সে পর্য্যালোচনা করিতে চেষ্টা করিল। কলাবতীর কলুষ স্পর্শে এখনও যেন সে অশুচি হইয়া আছে। কিন্তু তাই বলিয়া উত্তেজনায় উন্মত্ত হইয়া তাহাকে ওভাবে আহত করাও অমানুষের কার্য্য হইয়াছে। তবে সে ইচ্ছা করিয়া তাহাকে আঘাত করে নাই। ইহা একান্তই আকস্মিক ঘটনা। আকস্মিক ঘটনা! সোমনাথের কণ্ঠলগ্ন কলাবতী এক আকস্মিক ঘটনা! তাই যদি হয়, তবে শঙ্করের বক্ষলগ্ন সুপ্রিয়াও ত এক আকস্মিক ঘটনা হইতে পারে? হয়ত কলাবতীর ন্যায় শঙ্করও কৌশলে এই আকস্মিকতার আবির্ভাব ঘটাইয়াছিল। তাহার ন্যায় সুপ্রিয়াও হয়ত মাত্র ঘটনা-চক্রে অনিচ্ছায় আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সত্যই তাই। সোমনাথের চক্ষের সম্মুখ হইতে যেন একটা কৃষ্ণ-যবনিকা সরিয়া গেল। সোমনাথের সত্য দৃষ্টি সুপ্রিয়াকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। সে দেখিল, সুপ্রিয়ার আত্মা শুভ্র, শান্ত, পবিত্র। সে আত্মা এতটুকু ধূলি-মলিন নহে। সোমনাথের প্রতি প্রেমে ও শ্রদ্ধায় সে আত্মা ঊর্দ্ধমুখীন অগ্নিশিখার ন্যায় দিবারাত্র উন্মুখ হইয়া জ্বলিতেছে।

চেষ্টা ও চিন্তা দ্বারা অগ্রসর হইতেছিল। অরুণের সহিত কথায় কথায় নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে লজ্জিত হইল। এখন তাহার পরীক্ষা দেওয়া ব্যতীত আর গত্যন্তর রহিল না।

যথা সময়ে অপর্ণা পরীক্ষা দিল এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইল। সংবাদটা অরুণই দিল এবং সেই সঙ্গে সে তাহাকে তাহার নিজের ফাউণ্টেন পেনটি উপহার দিল। অপর্ণা কহিল—আর কিন্তু পাশের প্রশ্ন তুলো না!

অরুণ বিমর্ষভাবে কহিল,

—আমি হেরে গেছি অপর্ণা! কিন্তু তুমি আরও পাশ করলে আমি সত্যিই ভারী খুসী হ'তুম।

—ওইখানেই যে আমার সত্যিকার আপত্তি তা' তোমায় ত আগেই বলেছি অরুণদা! কাউকে খুশী করতে আমি পড়ছি, এ আমি ভাবতেই পারি না।

—অপর্ণা তোমায় আমি ভালো বুঝতে পারি না, তাই ব'লে তোমার চিন্তার ধারাকেও আমি আঘাত করতে চাই না। এক এক জন এ পৃথিবীতে আসে, যারা সরকারী বাঁধা রাস্তায় পা ফেলতে চায় না। তা'রা নিজেরাই পথ তৈরী ক'রে যাত্রা সুরু করে এবং অপরকেও সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যায়। তুমি হয়ত তা'দেরই দলের!

এই প্রশস্তিতে অপর্ণা কুন্ঠিত হইয়া পড়িল, কহিল,

—চা দেবো?

—চা? দাও।

চা পান করিতে করিতে অরুণ কহিল,

—সিনেমায় যাবে? 'জোয়ান অব আর্ক' হচ্ছে।

—সিনেমায়! সিনেমায় ত আমি যাই না।

—সিনেমার নামে তুমি অমন চমকে উঠলে কেন?

সেদিন পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষাকে চায় নি, তাই মেয়েরা সেদিন শিক্ষিতা হ'য়ে ওঠে নি। আজ পুরুষরা মেয়েদের শিক্ষিতা দেখতে চাইছে, তাই তাদের খুশী করতেই তা'রা শিক্ষিতা হয়ে উঠছে। এ এক রকমের দাসী মনোবৃত্তি! প্রভুর ইচ্ছাই জয়ী হোক! সকলের সঙ্গে আমিও যদি এই ইচ্ছাকে মাথা পেতে না নিতে পারি, তবে তোমার আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে?

অপর্ণার যুক্তিতে অরুণ বিস্ময় বোধ করিলেও নিবৃত্ত হইল না। গত দুই বৎসরের মধ্যে সে অপর্ণাকে অনেক দিন অনেক ভাবে দেখিয়াছে; কিন্তু বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিমতী আজিকার অপর্ণাকে দেখিয়া, তাহার মৌলিক চিন্তার মাঝে বিদ্রোহিণীর দৃপ্ত মহিমার পরিচয় পাইয়া, সে মনে মনে প্রশংসা না করিয়া পারিল না! বাহিরে কিন্তু তেমনই স্মিতহাস্যে কহিল,

—কলেজে যে সব ছেলেরা বারবার ফেল করে, তা'দের মুখেও এ রকম জবাব অনেক শুনেছি। তা'রা বলে,—যারা চাকরীর জন্যে দিবারাত্র পরিশ্রম ক'রে ডিগ্রি নেয়, তা'রা অনুকম্পার পাত্র! তা'রা ছাত্র-জীবনেও খেটে সারা হোল, আবার কেরাণী-জীবনেও খেটে সারা হবে।

—তা'রা যা বলে বলুক, আমার তা'তে মাথা ব্যথা নেই। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করাটাই জীবনের শ্রেষ্ঠ কাম্য নয় এ কথা বলতে পারে তারাই, যারা ইচ্ছা করলেই পাশ ক'রে তা' প্রমাণ করতে পারে।

—তুমি পারো?

—পারি, চেষ্টা করলে আসছে বারেই ম্যাট্রিক দিয়ে তা' প্রমাণ করতে পারি।

অপর্ণা ভিতরে ভিতরে তাহার বয়সের অনুপাতে অনেক কিছুই পড়াশুনা করিত। সে কথা কিন্তু কেহই জানিত না। সাহিত্য ও ইতিহাস ছিল তাহার প্রিয়-পাঠ্য। সমস্ত পড়াশুনায় সে কাহারও সাহায্য না লইয়াই নিজস্ব

সোমনাথ ভ্রান্তি-কুহকে পড়িয়া ঘুরিয়া মরিতেছে। কিন্তু কেন? কেন সে মিথ্যায় আবরিত হইয়া গেল? কারণ, প্রেম তাহার জীবনে সত্য হইয়া তাহাকে সত্যদৃষ্টি দান করে নাই। একদিকে বিজ্ঞানের সাধনা, অন্যদিকে সুপ্রিয়ার প্রেম, উভয়ের মধ্যে বিজ্ঞানই তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে বেশী। তাই আহত প্রেম তাহাকে ভুলের বালুচরে নামাইয়া পরিহাস করিয়াছে প্রচুর! এই মুহূর্ত্তে তাহার মনে হইল, সুপ্রিয়ার প্রেমকে সে সুবিচার করে নাই। সুপ্রিয়াকে অকারণ আঘাত হানিয়া সে অন্যায় করিয়াছে, অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছে। সে অকপটে তাহার ভুল স্বীকার করিবে, সে অকপটেই সুপ্রিয়ার ক্ষমা চাহিয়া লইবে।

আহারাদি সারিয়া সেরাত্রে সোমনাথ গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

পরদিন সোমনাথ শয্যাত্যাগ করিয়া দেখিল আটটা বাজিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি শৌচাদি সারিয়া কাগজখানায় চোখ বুলাইতে গিয়া দেখিল টেবিলে একখানা পত্র রহিয়াছে। কাগজখানা একপাশে সরাইয়া রাখিয়া সোমনাথ পত্রখানাতেই প্রথম মনোযোগ দিল।

'প্রিয় সোমনাথ!

এ পত্রে আমি তোমাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমেই বলি, আমি একথা ভুলতে পারি না যে, আমি একজন আজন্ম স্পোর্টস্‌ম্যান্! পরাজয়ের গ্লানি উপেক্ষা করে প্রতিপক্ষের জয়কে করমর্দ্দন দিয়ে সম্বর্দ্ধিত করা আমাদের স্বভাব-ধর্ম্ম! বিশেষতঃ সেই প্রতিপক্ষ যদি সত্যই সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয়, তা হলে সেই সম্বর্দ্ধনায় আন্তরিকতার অভাব ঘটে না।

সোমনাথ! কাল নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়ে গেছে যে তুমিই জয়ী! আমার সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হয়ে গেছে। দুঃখিত হলেও এ পরাজয়কে আমি

স্পোর্টিং স্পিরিটেই স্বীকার করে নিয়েছি। অবশ্য এ সম্পর্কে যাঁরা দেবীও আম্পায়েরের ভূমিকায় প্রশংসার দাবী করতে পারেন।

আজ এ সম্পর্কে দু' একটি কথা উল্লেখ করতে চাই। আশা করি তা'তে তুমি বিরক্ত হবে না।

আমার ধারণা ছিল, দেহের দাবীটা, কী পুরুষ, কী মেয়ে সকলের কাছেই বড়। কী নারী, কী পুরুষ, তাই সেই দেহ-সৌন্দর্যের সাধনায় ঐকান্তিক যত্ন নেয়, কারণ, মন ছোটে ওই দেহের পিছনে পিছনেই! চেয়ে দেখ, তোমাদের শিল্প, সাহিত্য, কাব্যকলা, সবই এই দেহের জয় গানই ঘোষণা করে গেছে। মাঝে মাঝে দু' একজন কেবল অতি-কৌশলী লেখক 'আত্মা' 'আত্মিক' প্রভৃতি দু' একটা আধ্যাত্মিক বুলি জুড়ে দিয়ে বহুজনের হাততালি আদায় করে নিয়েছেন। এ যেন শাড়ীর ওপর জড়োয়া গহনা। মেয়েদের শাড়ী জড়োয়ার দাবী কেন? পুরুষের কামনার পরিপূরক বলেই ওদের মূল্য, কিন্তু আসল মূল্য ওই দেহটার। দেহটাকে ও সর্ব্ব প্রযত্নে সজ্জিত করেছে! ও জানে, সকল সজ্জা দূরে সরিয়ে দিয়ে গভীর নিশীথে ও হয়ে উঠ্‌বে অপরূপা! ওর তনুদেহ ঘিরে যে রহস্য রচিত হবে, তারই পরে রয়েছে পুরুষের লুব্ধ হিংস্র কামনা!

শক্তিমান পুরুষের প্রতি নারীও তাই অন্তরে অন্তরে আসক্ত। জ্ঞান, বিদ্যা, যশ, অর্থ, এগুলো পুরুষের জড়োয়া গহনা। এতে পুরুষকে করে তোলে লোভনীয়। নারীর কামনা কিন্তু ঠিক একই কারণে তাইতেই সীমাবদ্ধ নয়! তাই যদি হোতো, তবে সর্ব্বগুণান্বিত পঞ্চস্বামী পেয়েও দ্রৌপদী কর্ণের কামনা করত না। একথা ভুললে চলবে না যে, দ্রৌপদী আমাদের আদর্শ সতী!

কিন্তু দেহকে লুণ্ঠন করায় আছে অপৌরুষ! দেহের পিছনে মনেরও কিছুটা সাড়া থাকা চাই। সেটুকু না থাকলে শব নিয়ে সংসার করার সামিল হ'য়ে পড়ে।

তাই সুপ্রিয়ার সৌন্দর্য্য আমাকে প্রলুব্ধ করলেও আমি তার মনের একাংশকে আয়ত্ত করতে আয়াস স্বীকার করলুম। সোমনাথ! তুমি কল্পনা করতে পারো যে, আমার মত একজন সুস্থ সবল লোক কেমন করে দিনের পর দিন এক অসহায় রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে চলেছিলো? সেই ভূমিকা অভিনয় করতে গিয়ে যে যন্ত্রণা নিত্য আমায় পেষণ করেছে তার পরিমাপ করতে পারো?

ভুল কোরো না। তোমার করুণা উদ্রেক করতে একথার উল্লেখ করছি না। আমি শুধু আমার ধারণাটার স্বরূপ তোমায় স্পষ্ট করে খুলে দেখালাম।

আজ অকপটে স্বীকার করছি রহস্যময়ী সুপ্রিয়া যে কেমন করে একজন সক্ষম পুরুষের নিত্য সাহচর্য্যকে, তার সহস্র প্রলোভনকে, অনায়াসে অত্যন্ত কৌশলে উপেক্ষা করে গেল তার হিসাব আজও আমার কাছে অজ্ঞাত!

তুমি হয়ত বলবে, ভালবাসার হিসাব অঙ্ক দিয়ে কষা যায় না। হয়ত তাই! ভালবাসার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিয়ে কোন দিন আমি মাথা ঘামাই নি, আজও ঘামাতে চাই না। সুপ্রিয়াকে চেয়েছিলাম, অর্থাৎ সুপ্রিয়ার দেহটাকেই চেয়েছিলাম, সাধারণ মানুষের চাওয়া হিসেবেই। ওর ছন্দিত তনুদেহের সুষমায়, নয়নের নিঃসীম গভীরতায়, আর লাবণ্যের কণায় কণায় কামনার যে অগ্নিকণা প্রতিমুহূর্ত্তে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার 'পরেই ছিল আমার প্রচণ্ড লোভ। কিন্তু আমার ভয় ছিল। ভয় ছিল ওর স্পর্শ-কাতরতায়। একদিনের আকস্মিক আকর্ষণে ও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। ও সহসা সে দিন নিভে গেল হিমশীতল মৃত্যুর শীতলতায়! সেই শীতলতা স্মরণ করলে আজও আমি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় শিউরে উঠি! বোধ হয়, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ রাবণ রাজাও এই শীতলতা অনুভব করেছিলেন, তাই সীতাকে স্পর্শ করতে সাহস করেন নি।

সোমনাথ তুমি পণ্ডিতলোক হলেও মূর্খ। কিন্তু দুঃখ এই যে, তোমার সেই মূর্খতার সুযোগ লাভ করেও আমি পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হলুম।

আজ বিদায় নেবার আগে জানিয়ে যাচ্ছি তোমার সে দিনের প্রত্যক্ষ-দর্শন তোমায় বিড়ম্বিত করেছে। ঘটনাটা একান্তই আকস্মিক। সুপ্রিয়া কোনও দিনই আমার ডাকে সাড়া দেয় নি। সে দিনও না, আজও না।

আমি বলি, আজ সাহস করে তোমার বলিষ্ঠ দাবী নিয়ে সুপ্রিয়ার পাশে এসে দাঁড়াও। তোমাদের মিলনের অন্তরায় হতে পারে এতবড় শক্তি জগতে আজও দেখতে পাচ্ছি না। সুপ্রিয়া সমগ্রভাবেই নিজেকে তোমায় উৎসর্গ করেছে। তুমি তাকে গ্রহণ কর। উভয়ে পরস্পর পরস্পরকে ধন্য কর, সার্থক কর।

বিদায় বন্ধু বিদায়।

সুপ্রিয়াকে পাই নি, ভালই হয়েছে। আমার কামনা-তপ্ত দেহ হয়ত অপর নারীতে তৃপ্ত হবে; কিন্তু সুপ্রিয়ার মৃত্যু সে তৃপ্তিকে ক্ষণে ক্ষণে রেখে বিষণ্ণ করে। তাই সুপ্রিয়াকে তার অপমৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পেরে আমিও বোধ হয় বেঁচে গেলুম। আবার বলছি, সুপ্রিয়া চলেছে মৃত্যুর মুখে। আমার কামনা যজ্ঞে তার দেহকে আহুতি দিতে বাধ্য হলে সে মৃত্যু হয়ত আসত আরও দ্রুত পদক্ষেপে। তোমার প্রেমের সঞ্জীবনী মন্ত্রে সুপ্রিয়াকে তুমি বাঁচাও।

তোমাদের মঙ্গল কামনা করি।

আবার বলি, বিদায় বন্ধু বিদায়। ইতি—

শঙ্কর।'

পত্রে ঠিকানা নাই, তারিখ নাই।

সোমনাথের মনে হইল, এখনই সে সুপ্রিয়ার নিকট ছুটিয়া যায়; কিন্তু নিজেকে সংযত রাখিয়া সে আপন কর্ত্তব্যে মন দিল। প্রথমেই সে

ফিল্ম-ল্যাবরেটরীর কাজে জবাব দিয়া পদত্যাগ পত্র লিখিয়া ফেলিল। গত সন্ধ্যার ঘটনার পর ওখানে নাসিকা প্রবেশ করান আর যুক্তিযুক্ত নহে। তাহার পর যথারীতি আহারাদি সমাপন করিয়া কিছুটা বিশ্রাম লইতে পুনরায় শয্যাশ্রয় গ্রহণ করিল। ভৃত্য আসিয়া একখানি বিলাতী খাম রাখিয়া গেল। এতদিন পরে তাহার বহু আবেদনের একখানি উত্তর আসিয়াছে। পত্র উন্মোচন করিয়া দেখিল, সুইজারল্যাণ্ড হইতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত জনৈক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক তাহাকে সহকারীরূপে পাইতে আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন। মাসিক পারিশ্রমিকটাও তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় অল্প লোভনীয় নহে!

বাহিরে প্রবল বর্ষণ সুরু হইয়াছে। সোমনাথ শুইয়া শুইয়া সেই বর্ষার রাগিনী শুনিতে শুনিতে কখন যে নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল তাহা সে নিজেই জানে না।

বর্ষণমুখর দ্বিপ্রহরে জানালার ধারে বসিয়া সুপ্রিয়া আকাশ পাতাল ভাবিতেছিল। এই যে প্রকৃতির ঘনঘটা, এই যে সজল জলদাকাশের মেদুর-মন্থন, এই যে ভিজামাটির সুস্নিগ্ধ গন্ধভরা বাতাবী ফুলের সুরভি পরিবেশণ, ইহার কিছুই সে উপভোগ করিতেছিল না। তাহার সকল ইন্দ্রিয়-দ্বার যেন রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার সমগ্র মনটা পড়িয়া আছে বীরার লঘু পদধ্বনির আশায়! সে মন এত তীক্ষ্ণ সজাগ যে, এ বাটীর ত্রিসীমানায় তাহার আবির্ভাব ঘটিলে সেই মন সমগ্র বাড়ীখানার সঙ্গে বোধ হয়, কলকোলাহলে তাহাকে অভিনন্দিত করিয়া তুলিবে।

বীরা সেই যে গিয়াছে আর আসে নাই। আসে নাই এবং কোন সংবাদও দেয় নাই। হয়ত শঙ্করের সহিত সম্মুখ সমরে সে পরাজিতা হইয়াছে। সেই পরাজয়ের লজ্জাকে লঘু করিবার জন্যই সে সময়

লইতেছে। কিন্তু ভাল হউক মন্দ হউক সংবাদ তাহার চাই-ই। শঙ্করকে লইয়া এভাবে প্রাণান্তকর সংশয়ের নাগর দোলায় আর সে দুলিতে পারিবে না।

ধীরা হয়ত পরাজিতা হইয়াছে। হয়ত শঙ্কর এতক্ষণে সমগ্র পরিস্থিতিটা আপন মনের স্বচ্ছমুকুরে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেছে! এইবার সে আসিবে তাহার নগ্ন ক্রুর বীভৎস মূর্ত্তি লইয়া! এইবার সে আসিবে তাহার সব আবরণ দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া তাহার ভয়াবহ বিষাক্ত লোলিহ জিহ্বা বিস্তার করিয়া! এইবার সে প্রবলবেগে ছুটিয়া আসিবে তাহাকে নির্ম্মম-ভাবেই দংশন করিতে। তাহার সেই বিষাক্ত দংশনের জ্বালায় মৃত্যুও হইয়া উঠিবে মনোরম! নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, ক্রুদ্ধ সর্প দংশনের পর দংশনের আঘাতে তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া প্রচণ্ড উল্লাসে নৃত্য করিবে নরককে ধিক্কার দিয়া! সেই উল্লাসের নারকীয় হা হা শব্দ তাহার কর্ণকুহর ভেদ করিয়া হৃদপিণ্ডটাকে বিরাট হাহাকারে পূর্ণ করিয়া তুলিবে। তাহার চূর্ণিত দলিত,পিষ্ট, হৃদয়টা একটা পিণ্ডের আকারে পুতিগন্ধময় আবর্জ্জনায় নিক্ষিপ্ত হইবে! ভাবিতে গিয়া সুপ্রিয়া আশঙ্কায় তীব্র আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। সেই করুণ আর্ত্তনাদ বায়ু তরঙ্গে ভর করিয়া নিঃসীম আকাশের বুকে বিলীন হইয়া গেল।

প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে সমগ্র পৃথিবীটাই যেন থর থর করিয়া কাঁপিতেছে! সুপ্রিয়ার বিস্রস্ত কেশপাশ প্রবল বায়ুভরে শূন্যে উড়িতেছে। পরিধেয় সিক্ত দুকূল তাহার অঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে। সুপ্রিয়া যেন মূর্ত্তিমতী ঝড়! বাহিরের প্রচণ্ড দাপাদাপি যেন তাহার অন্তরের ঝড়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পারিয়া না উঠিয়া পরাজয় স্বীকার করিতে চাহিতেছে!

কেমন এক আচ্ছন্নভাবে সুপ্রিয়া উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিল। যেন কতকটা নিজের অজ্ঞাতসারেই সে ল্যাবরেটরীর দ্বার উন্মোচন করিল।

ল্যাবরেটরীর কক্ষে একাকী এভাবে সে এই প্রথম প্রবেশ করিল। সে সবিস্ময়ে দেখিল সেই ল্যাবরেটরী যেন শরীরী হইয়া তাহাকে বাধা দিয়া বলিতেছে,—আমাকে স্পর্শ করিও না তুমি, আমার শুচিতা নষ্ট করিও না। সোমনাথ আসিতেছে, সোমনাথের অমৃত স্পর্শেই আমার মুক্তি!

সোমনাথের অমৃত স্পর্শে সুপ্রিয়ারও মুক্তি! না না, সুপ্রিয়া স্বেচ্ছায় সোমনাথকে তাহার হাতে তুলিয়া দিবে না। সে-ই সোমনাথকে তাহার অন্তর হইতে অপহরণ করিয়াছে! সোমনাথ একমাত্র তাহার। জগতে আর কাহারও নহে, হইতে পারে না। সে দেখে নাই নারীর প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি! তাহার প্রলয় নিঃশ্বাসে সে পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাহাকে বাধা দিবার স্পর্দ্ধা সে আজ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবে।

সুপ্রিয়া যেন ক্ষেপিয়া গেল। প্রথমেই সে সম্মুখস্থ সূক্ষ্ম মানদণ্ডটা টান মারিয়া দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল। তাহার পর ছুটিয়া গিয়া উপরিস্থিত কাচের র‍্যাকে প্রবল মুষ্ট্যাঘাত করিল। কাচ ভাঙিয়া র‍্যাক অন্তর্গত কয়েকটা ভগ্ন শিশির নিঃসৃত দ্রাবক মেঝেতে পড়িয়া গেল।

এতক্ষণে সুপ্রিয়া যেন কতকটা জ্ঞান ফিরিয়া পাইল। সে দেখিল, তাহার পদনিম্নে কাচ আচ্ছাদিত গ্যাসের একটা স্তর রচনা করা রহিয়াছে। সেই স্তর ভেদ করিয়া সেই দ্রাবক মেঝেকে পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া দিতেছে।

হায়, সাময়িক উত্তেজনায় সে এ কি করিয়া বসিল? সে কি সত্যই পাগল হইয়া গিয়াছে? সে তাহার পিতার, তাহার স্বামীর এত দিনের সাধনা ব্যর্থ করিয়া দিল! তাহার স্বামী! হাঁ হাঁ, এ জগতে একমাত্র সোমনাথই তাহার স্বামী!

সুপ্রিয়া উপর হইতে লাফাইয়া পড়িল, কিন্তু পদাঙ্গুলির একাংশে সেই তরল দ্রাবক স্পর্শ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সে মৃত্যু যন্ত্রণায় চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রাণপণ বলে দ্বারপ্রান্তে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই সে সশব্দে অচেতন হইয়া লুটাইয়া পড়িল।

সেই প্রবল ঝড় জলের মধ্যেই ধীরাও ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করিল। সুপ্রিয়াকে ঐ অবস্থায় পাইয়া সে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়া গেল। রাজলক্ষ্মীকে ডাকিয়া দিয়া ধীরা তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার আসিয়া পরীক্ষান্তে আশ্বাস দিলেন ভয় নাই। একটা ইনজেকসন দিয়া কহিলেন, এখনই জ্ঞান ফিরিবে। কিন্তু ক্ষত পরীক্ষা করিতে গিয়া তিনি বিষণ্ণ হইয়া গেলেন, কহিলেন,—এ ধরনের ক্ষত কিভাবে হোলো?

ধীরা সংক্ষেপে উত্তর করিল,—বোধ হয়, কোন কেমিক্যাল সংশ্রবের ফল। ও ডাঃ ঘোষালের ল্যাবোরেটরীতে ছিল।

—আই সি। আচ্ছা, আমি একটা মলম পাঠিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এ ক্ষত সারতে দু চার দিন দেরী লাগবে।

—ধন্যবাদ! আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ! এই ঝড় জলের মধ্যে যে আপনি আসবেন তা আমি ভাবতেই পারি নি।

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—ইট ইজ মাই ডিউটি! তা ছাড়া ডাঃ ঘোষাল আমার এককালের প্রফেসর! আচ্ছা এখন উঠি, কোনও ভয় নেই। আকাশ ধরে আসছে। জ্ঞান ফিরলে গরম দুধ দেবেন। বিশ্রামই এখন শ্রেষ্ঠ ওষুধ!

ডাক্তার চলিয়া গেলেন। ক্ষণপরে সুপ্রিয়ারও জ্ঞান ফিরিল। ধীরা এক গ্লাস গরম দুধ পান করাইয়া প্রশ্ন করিল,—ব্যাপার কি সুপ্রিয়া? এখন কেমন বোধ করছ?

—বেশ ভালই ত মনে হচ্ছে! বলিয়া সুপ্রিয়া উঠিয়া বসিতে গেল। ধীরা তাড়াতাড়ি তাহাকে ধরিয়া শোয়াইয়া দিল, বলিল,—চব্বিশ ঘণ্টা এখনও এইভাবে শুয়ে থাকতে হবে। ডাক্তারের আদেশ।

সুপ্রিয়া ক্ষীণ দুর্বল হাসি হাসিয়া কহিল,—চব্বিশ ঘণ্টা! সুস্থ শরীরে একি শাস্তি?

—শঙ্করকে এই শাস্তি তুমি দিয়েছ ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাসের পর মাস।

শঙ্করের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিয়া আবার নিভিয়া গেল। শুষ্ক কঠিন কণ্ঠে কহিল,—এ শাস্তি সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল, আমি তার জন্যে দায়ী নই!

—প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে তুমি এ দায় অস্বীকার করতে পারো না।

সুপ্রিয়া ইঙ্গিতটা বুঝিয়া চুপ করিয়া গেল। কিন্তু শঙ্কর ধীরাকে কি জবাব দিল তাহা জানিবার জন্য ভিতরে ভিতরে অধীর হইয়া উঠিল, কহিল,—শঙ্করদা কি বলল?

ধীরার নিকট শঙ্করের উত্তরটা আশাপ্রদ বোধ হয় নাই, কিন্তু সে কথা এখন সুপ্রিয়াকে বলা চলে না; তাই কৌশলে উত্তর দিল,—বোধ হয়, আর সে এখানে আসবে না। সত্যি সুপ্রিয়া! সে যে একজন সত্যিকার স্পোর্টস্‌ম্যান তা সে প্রমাণ করে গেল। বাট, আই হ্যাভ এ সফট্ করনার ফর হিম।

সুপ্রিয়া তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিল,—আমার তাতে আপত্তি নেই। বাট আই হ্যাভ নো সিম্‌প্যাথী ফর হিম। হি ইজ এ ভিলিয়ান্।

তিরস্কারের সুরে ধীরা কহিল,—সুপ্রিয়া! পরাজিত শত্রুর প্রতি এ মনোভাব প্রশংসনীয় নয়।

সুপ্রিয়া কিন্তু সে তিরস্কার গ্রাহ্য না করিয়া হাসিয়া পাশ ফিরিল।

ঔষধের গুণেই হউক বা অবসাদের প্রভাবেই হউক সুপ্রিয়া শীঘ্রই গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল।

ধীরা সংক্ষেপে ঘটনাটা উল্লেখ করিয়া স্বামীকে সংবাদ পাঠাইল যে, হয়ত আজ রাত্রে তাহার বাড়ী ফেরা সম্ভব হইবে না। তিনি যেন অযথা চিন্তিত না হন। পত্রখানা পাঠাইয়া দিয়া জানালায় দাঁড়াইতেই

ধীরা সবিস্ময়ে দেখিল, ডাঃ ঘোষাল সোমনাথকে লইয়া ট্যাক্সি হইতে নামিতেছেন।

ঘুম ভাঙ্গিতেই সোমনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেখিল পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। বীতবর্ষণ সহরটা সর্বাঙ্গে স্নিগ্ধতা লেপন করিয়া যেন পথচারীদের আহ্বান করিতেছে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি পথে নামিয়া পড়িল। কিছু দূর যাইতেই একখানা ট্যাক্সি সশব্দে একেবারে তাহার অত্যন্ত সন্নিকটে আসিয়া থামিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে প্রফেসর ঘোষালের হর্ষোজ্জ্বল কণ্ঠ ভাসিয়া উঠিল,

—কী আশ্চর্য্য! সোমনাথ! তুমি এখানে? এস এস শীগ্‌গীর উঠে এস! এতদিন কোন সংবাদ না দিয়ে ছিলে কোথায়? এখনই বা যাচ্ছ কোথায়?

সোমনাথ সংক্ষেপে উত্তর করিল, এতদিন সে কলিকাতার বাহিরে ছিল, সম্প্রতি সে কলিকাতায় ফিরিয়াছে এবং আজ সে তাঁহারই ওখানে যাইতেছিল।

সোমনাথের পৃষ্ঠে একটা মৃদু আঘাত হানিয়া প্রফেসর কহিলেন,—আমি জানতুম, তুমি আসবেই সোমনাথ! তোমাকে আসতেই হবে। দুই মা বেটিতে আমায় এক সময় এমন ভাবিয়ে তুলেছিল যে, আমিও ভেবেছিলুম হয়ত তুমি আর এলে না। বলিতে বলিতে বৃদ্ধের গলাটা ধরিয়া আসিল। পরক্ষণেই যেন আপন কৃতিত্বে গর্ব্বিত হইয়া কহিলেন, —কিন্তু দেখ! আজ আমার কথাই সত্যি হ'ল কি না। আমি তখনই বলেছিলুম, সোমনাথ পৃথিবীর যেখানেই থাক সে ফিরবেই, তাকে ফিরতে হবেই।

বৃদ্ধ কেমন এক আনন্দ-বিহ্বল অদ্ভুত হাসি হাসিতে লাগিলেন।

—কিন্তু সোমনাথ তুমি কতদূর অগ্রসর হ'লে? আমি আর বেশী পরিশ্রম করতে পারি না, তবু এগিয়ে যাচ্ছি। এবার একটা নতুন ফরমূলা নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছি। চল, তোমায় গিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছি, তারপর তোমার মত দিও।

বৃদ্ধ অনর্গল বলিয়া চলিয়াছেন।

উভয়ে ট্যাক্সি হইতে নামিয়া সোজা ল্যাবরেটরী ঘরের দিকে অগ্রসর হইলেন।

দরজায় তালা নাই! বৃদ্ধ ভাবিলেন, হয়ত অন্যমনস্কতার জন্য ভুল হইয়া গিয়াছে। কখন কখন এমন হয়। সুপ্রিয়াই সে ভুল সংশোধন করিয়া লয়। তাহার নিকটও স্বতন্ত্র চাবি আছে।

ধাক্কা দিয়া দরজা খুলিতেই একটা তীব্র গন্ধ উভয়কে অভিনন্দন জানাইল। বহুদিন পরে ল্যাবরেটরী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমনাথ আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল। শিশুরা যেমন নূতন পুস্তক লইয়া বার বার তাহার মলাটের গন্ধ পানে উল্লসিত হয়, সোমনাথও তেমনই সেই ল্যাবরেটরীর গন্ধে উল্লসিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল কতদিন —কতদিন সে এই স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া বৃথা ঘুরিয়া ঘুরিয়া সময়ের অপব্যবহার করিয়াছে!

সোমনাথ!

সোমনাথ প্রফেসরের চীৎকার শুনিয়া পিছন ফিরিল। এ কি! উত্তেজনায় আনন্দে প্রফেসর চৈতন্যহারা হইবার উপক্রম করিয়াছেন। প্রফেসর রীতিমত কাঁপিতেছেন!

তাড়াতাড়ি প্রফেসরকে ধরিয়া সোমনাথ কহিল,—কী হয়েছে? কী হয়েছে স্যর!

—দেখছ না—দেখছ না, ঘরে নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছিল। সব তচ্‌নচ্‌ করে হতভাগা সরে পড়েছে। কিন্তু এদিকে তাকিয়ে দেখ—তাকিয়ে দেখ,

অঘটন ঘটে গেছে। স্ট্র্যাটস্‌ফিয়ার ভেদ করে 'কসমিক রে' মেঝে ফুঁড়ে চলে গেছে!

—তাইত! তাইত! আশ্চর্য্য স্যর আশ্চর্য্য! আপনি বসুন আপনি বসুন, আমি দেখ্‌ছি। এমন অসম্ভব কাণ্ড কী করে ঘটল? ইট ইজ সিম্প্‌লি মিয়ার এ্যাক্‌সিডেন্ট!

—এ্যাকসিডেণ্ট! বাট হোয়াট ওয়াণ্ডারফুল কয়েনসিডেন্স!

উভয়ে দুইটি চেয়ারে বসিয়া গভীর চিন্তায় মনোনিবেশ করিলেন। প্রফেসর মাঝে মাঝে উঠিয়া ভগ্ন শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া সেই মিশ্রিত দ্রাবক নিজে আরোপ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া হতাশাব্যঞ্জক মস্তক আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

এইভাবে পুরা চব্বিশটি ঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল। গুরু শিষ্য পরস্পরের মুখের পানে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া আছেন।

এক সময় প্রফেসর উঠিয়া আসিয়া সোমনাথের হাত দুইখানি ধরিয়া ভগ্ন করুণ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—আই ফেল, আই ফেল সোমনাথ! আই ফেল! মাই মিশন ইজ ওভার! আই ফাইণ্ড নো হোপ! আই অ্যাম ফিনিশ্‌ড্‌!

সোমনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ বিশ্বাসে বৃদ্ধের হস্তে চাপ দিয়া কহিল,—নো নো নো স্যর! ইউ কান্‌ট্‌ ফেল। বিশ্বাস করুন আমাকে! ভগবানের আর আমার মায়ের পবিত্র নাম নিয়ে আমি শপথ করছি, আপনার সাধনা আমি ব্যর্থ হতে দেবো না। জীবন দিয়েও তাকে আমি সার্থক করে তুলবো। যে আবিষ্কার একবার ধরা পড়েছে, তাকে ধরা বেশীদূর নয়। কিন্তু আমি ভাবছি আরও দূরের কথা। আমি ভাবছি, মানব-কল্যাণে তার ব্যবহারের কথা! এই দেখুন স্যর, সুইজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আমাকে তাঁর গবেষণাগারে আহ্বান করেছেন।

বলিয়া সে সেই পত্রখানা বাহির করিল। পত্র পাঠান্তে প্রফেসর সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিয়া অধীর উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন,—সোমনাথ! ইউ আর সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল! ওয়াণ্ডারফুল!

দ্বারে করাঘাত হইল,—আসতে পারি? ধীরার কণ্ঠস্বর!

সোমনাথ প্রফেসরকে ত্যাগ করিয়া দ্বার খুলিল। সম্মুখে ধীরা!

—আশ্চর্য্য! ধীরা! তুমি!

—সিম্প্লি ওয়াণ্ডারফুল। কিন্তু বেশী কথা নয়, শিগ্গীর আমার সঙ্গে একবার ওপরে এস। পরে প্রফেসরের পানে তাকাইয়া কহিল, —আপনি দয়া করে আর এখন উঠবেন না, আমি এখানেই চা জলখাবার নিয়ে আস্ছি। আপনি ভয়ানক পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন।

বলিয়াই প্রফেসরকে আর দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়া সোমনাথকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিল।

সুপ্রিয়া শয্যায় বসিয়াছিল। ধীরার সহিত সোমনাথকে কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দুই হাতে নয়ন আবৃত করিয়া উভয় জানুর অন্তরাল হইতে সে ক্রন্দনের সুরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—আমিই তোমাদের ল্যাবরেটরী নষ্ট করেছি সমীদা! আমায় শাস্তি দাও, শাস্তি দাও।

সোমনাথ ক্ষমা-সুন্দর প্রসন্ন হাসি হাসিয়া উত্তর করিল,—স্তাকারিন আবিষ্কারের মত তোমার দুরন্তপনা আমাদের আবিষ্কারকে অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে সুপ্রিয়া! কাযেই লজ্জা পাবার কারণ তোমার নেই বরং অভিনন্দন পাবার দাবীই তোমার আছে।

সুপ্রিয়া মুখ না তুলিয়া একইভাবে বসিয়া রহিল, ভাবিল, ইহা সোমনাথের স্বাভাবিক ঔদার্যময় সান্ত্বনা। ধীরা তাহার পাশে বসিয়া কানে কানে সোমনাথের অশ্রুতকণ্ঠে কহিল,

শোনগো প্রিয়া খোলগো আঁখি,
সম্মুখে প্রিয় দেখিবে নাকি?

বলিয়াই হাসিতে হাসিতে কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সোমনাথ গাঢ়কণ্ঠে ডাকিল,—সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়ার পক্ষ হইতে কোন সাড়া জাগিল না।

—শোনো সুপ্রিয়া! আকস্মিকভাবেই একদিন ভুলের চোরাবালিতে আকণ্ঠ আটকে গিয়ে আমাদের প্রাণ সংশয় হয়ে উঠেছিল। আজ আবার আকস্মিকভাবেই আমরা সে চোরাবালি হ'তে উদ্ধার পেলুম। অপরাধ আমারও কম নয়। কিন্তু ক্ষমা আজ আমি তোমার কাছে চাইব না, কারণ তাতে তোমারই অপরাধ বেড়ে যাবে। শোন তবে শঙ্করের চিঠিখানা। সোমনাথ পরিষ্কার কণ্ঠে শঙ্করের পত্রখানা পড়িয়া গেল। শুনিতে শুনিতে সুপ্রিয়া এক সময় সোমনাথের আশ্চর্য্য-সুন্দর চোখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। পাঠ সমাপ্ত হইলে সুপ্রিয়া একটা প্রকাণ্ড স্বস্তির নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া কহিল, —শঙ্করদা ওয়াণ্ডারফুল।

—সত্যিই ওয়াণ্ডারফুল! আরও ওয়াণ্ডারফুল কিন্তু তার ওই উপমা! যেখানে ও লিখেছে—তোমার নয়নে নিঃসীম গভীরতা! তাকাও দেখি একবার সুপ্রিয়া, আমার পানে?

লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া সুপ্রিয়া কহিল,—তুমি যেন কি! দেখছ না, ধীরাদি আড়াল থেকে সব দেখছে।

সোমনাথ কহিল,—দেখুক তোমার ধীরাদি আড়াল থেকে। গ্রাহ্য করি না আজ আমি তোমার ধীরাদিকে, গ্রাহ্য করিনা জগৎকে। আমার সব আড়াল আজ ভেঙে গেছে। এই দেখ সুইজারল্যাণ্ডের পত্র। আজ এইমাত্র ভগবানের নামে, আমার মায়ের পবিত্র নামে তোমার বাবার কাছে শপথ করে এলুম যে, তাঁর সাধনা আমি ব্যর্থ হতে দেব না। আমরা দু'জনে চলে যাবো দূর সুইজারল্যাণ্ডে। সেখানে তুমি আমার পাশে বসে দেবে শুধু প্রেম আর প্রেরণা। সে প্রেরণায় আমরা হয়ে উঠব

[illegible]! সেই অতিমানবের লোক থেকে আমরা বর্ষণ করব অমৃত বৃষ্টি! সেই বৃষ্টি ধারায় স্নাত হবে জগতের সাধারণ মানব!

বলিতে বলিতে সোমনাথের বলিষ্ঠ ঋজু দেহ যেন স্বর্গীয় আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! • তাহার নয়ন হইতে ক্ষরিত হইতে লাগিল অতিমানবের ক্ষমা-সুন্দর অমৃত বিন্দু!

সুপ্রিয়ার নয়নে দেখা দিল সেই নিঃসীম গভীরতা! সেই নিঃসীম গভীরতায় যেন বিশ্বের বেদনা! তাহাকে যেন আর্ত্ত মানবতা আহ্বান জানাইতেছে তাহার করুণা-স্নিগ্ধ সহানুভূতির আশায়! সোমনাথের আবেগকম্পিত কণ্ঠস্বরে সেই আবেদন যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। সুপ্রিয়ার চক্ষু তারকায় ভাসিয়া উঠিল সোমনাথের প্রতিবিম্ব!

সুপ্রিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই সম্মোহিতা হরিণীর ন্যায় ধীরে, অতি ধীরে, সোমনাথের বক্ষের একান্ত সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িল! সে সান্নিধ্য এতই একান্ত যে তাহা তখন স্পর্শ দিতেছে সোমনাথের গভীর উষ্ণ নিঃশ্বাস!… …

আমাদের প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের

চিতা-বহ্নিমান ৪৲ জীবন-রুদ্র

জ্যোতির্ময় ৪৲ কালরুদ্র

নীলালক্তক ২৷৷০ মহারুদ্র

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (১ম) ৩৷৷০

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (২য়) ৪৲

হে মোর দুর্ভাগা দেশ (৩য়) ৪৲

শ্রীপঞ্চানন চট্টোপাধ্যায়ের

রাত্রির যাত্রী ৩৷৷০

শ্রীশান্তিকুমার দাশগুপ্তের

বন্ধনহীন গ্রন্থি ৩৲

শ্রীমাখনলাল রায়চৌধুরীর

বিশ্বের বিচিত্র পত্রাবলী ২৷৷০

শ্রীশৈলেশ বিশীর

বিপ্লবী শরৎচন্দ্রের জীবন-প্রশ্ন ২৲

রুবেন রায়ের

আরক্তিম ৪৲ জাগ্রত জীবন ২৲

স্পন্দন ৩৲ মুখর মুকুর ৪৲

শ্রীআনন্দের

সবুজ বনে দুরন্ত ঝড় (কিশোর উপন্যাস) ১৷০

দেবশ্রী সাহিত্য-সমিধ

১১এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬

যাবার শেষে সোমনাথ কহিল,

—আজ সন্ধ্যায় সময় একবার আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

সোমনাথ সন্ধ্যার পর টাকা লইয়া বসিয়া ছিল। দ্বারে আঘাত করিয়া শর্মিষ্ঠা কহিল,—আসতে পারি ?

—নিশ্চয়ই! আপনারই জন্যে বসে আছি।

'আপনারই জন্যে বসে আছি।' শর্মিষ্ঠা সহসা বিহ্বল হইয়া পড়িল। প্রতীক্ষমান সোমনাথ যদি সত্যই তাহার জন্য বসিয়া থাকিত! না, দুর্বলতা জয় করিতেই হইবে। শর্মিষ্ঠা দৃঢ়পদক্ষেপে দ্বার উন্মুক্ত করিয়া কক্ষে প্রবেশ করিল, দেখিল, সোমনাথ একতাড়া দশটাকার নোট হাতে করিয়া বসিয়া আছে।

সোমনাথ কহিল,—আপনার পারিশ্রমিকটা···

শর্মিষ্ঠা কহিল,—হাঁ, ঠিক আছে! কাগজ দিন রসিদ লিখে দিই।

—রসিদ! না না, রসিদ লেখবার কোন প্রয়োজন নেই।

—বিস্‌নেস এক তরফা হয় না সোমনাথ বাবু! আপনার কর্ত্তব্য যেমন আপনি করছেন, তেমনই আমার কর্ত্তব্যেও আমাকে বাধা দেওয়া উচিত হবে না।

সোমনাথকে যেন ইচ্ছা করিয়াই শর্মিষ্ঠা আঘাত হানিল। সোমনাথ অপ্রসন্ন মুখে একখানা কাগজ দিল।

—একখানা রেভিনিউ ষ্ট্যাম্প!

—ষ্ট্যাম্প নেই!

—এই চারটে পয়সা রইল, লাগিয়ে নেবেন। বলিয়া যথারীতি রসিদ লিখিয়া দিয়া টাকাটার জন্য হাত বাড়াইল।

এবার সোমনাথ ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,

—জানিনা, টাকাটা নিজের হাতে তুলে দিতে কোথায় যেন বাধছে। কেবলই যেন মনে হচ্ছে কোথায় যেন আপনাকে অপমান করছি।

একটা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া শর্মিষ্ঠা উত্তর করিল,

—সত্যিই বাধ্ছে ? শুনে সুখী হলুম। তাহলে দেখছি পাহাড়ের মাথাটা কঠিন শীতল বরফে আচ্ছন্ন থাকলেও সানুদেশে তার সবুজ পাতার অভাব ঘটে না। তবে তাই যদি হয়, থাকনা টাকাটা ?

—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য।

—ওঃ কর্ত্তব্য ! বলিয়াই শর্মিষ্ঠা কঠিন হইয়া উঠিল। নোটের তাড়াটা এক রকম কাড়িয়া লইয়াই সে কক্ষ ত্যাগ করিল।

সোমনাথ রহস্যময়ী শর্মিষ্ঠার গমনপথে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শর্মিষ্ঠা যদিও সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিত তথাপি তাহার আপন মনের দুর্ব্বলতা তাহার নিজের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। তাই সে সযত্নে সোমনাথের সান্নিধ্য এড়াইয়া চলিতে চেষ্টা করিত। সে ভাবিত, প্রলোভন জয় করিতেই হইবে। কারণ, মিথ্যার মধ্য দিয়া নিজেকে প্রকাশ করিলে কোন পক্ষেরই মঙ্গল হইবে না। মাঝে হইতে সোমনাথের নিকট মর্য্যাদা হারাইয়া সে অবজ্ঞার পাত্রী হইবে। সোমনাথকে লাভ করা হয়ত তাহার দুরাশা নহে। কিন্তু সুপ্রিয়াকে অতিক্রম করাও সহজ সাধ্য নহে। বিশেষতঃ, ইহার অন্তরালে প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্ভাবনায় সে সঙ্কুচিতা হইয়া পড়িল। অপর্ণাকে সে ভালই জানিয়াছে। জানিয়াছে, অপর্ণার প্রভাব সোমনাথের জীবনে অনতিক্রম্য। সুপ্রিয়া অপর্ণার সমর্থন লাভ করিয়াছে। সোমনাথের নিকট পরাজয়ের সম্ভাবনা না থাকিলে সে হয়ত একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিত। নারীর জীবনে প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় কিছুই অশোভন নহে, কিন্তু পরাজয়ের গভীর গ্লানি সহ্য করিবার মত তাহার স্নায়ু সবল নহে ; কাজেই সর্ব্বনাশা খেলায় মাতিবার চিন্তা

ত্যাগ করাই সৎযুক্তি! কিন্তু যুক্তির সব সময় শাসন মানিতে চাহে না। যুক্তিকে চাপা দিয়া হৃদয়াবেগ উদ্দাম হইয়া উঠে। শর্মিষ্ঠা মাঝে মাঝে সোমনাথের পদধ্বনিতে তাহার আপন হৃৎস্পন্দন শুনিতে পায়। শর্মিষ্ঠা তাই কৌশলে আরও দূরে সরিয়া যাইতে চাহে। সোমনাথকে সে পরিহার করিতেই চাহে। হৃদয়াবেগে পরিচালিতা হইয়া সে সোমনাথকে সর্বনাশের গুহায় টানিয়া আনিতে চাহে না। সোমনাথের কল্যাণ সে কামনা করে, কিন্তু নিজের অসহায়তা সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ সজাগ।

সেদিন সন্ধ্যায় সোমনাথের অনুপস্থিতিতে তাহার শয়ন কক্ষটা সে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছিল। এমন সে প্রায়ই করে, কারণ এই সময়ে সোমনাথ প্রায় বাড়ী থাকে না। অন্যমনস্ক সোমনাথের শয্যাগৃহ একটা বিশৃঙ্খলার প্রদর্শনী! পুস্তক কাগজপত্রাদি হইতে গায়ের জামা, পায়ের জুতা, পর্য্যন্ত সকলেই যেন প্রতিদ্বন্দ্বীতায় অসহযোগীতা আরম্ভ করিয়াছে। সোমনাথ কখনই এ সকল বিষয়ে লক্ষ্য করে না। প্রতিদিন ফিরিয়া আসিয়া সেগুলি যথাস্থানে সুবিন্যস্তভাবে সজ্জিত থাকিলেও সোমনাথের তাহাতে দৃষ্টি পড়ে না। শর্মিষ্ঠার প্রতিদিনের সযত্ন হস্তের নীরব সেবায় সম্পূর্ণ উদাসীন সোমনাথ! শর্মিষ্ঠার তাহাতে অভিযোগ নাই। এইটুকু অলক্ষ্য সেবার সুযোগ পাইয়াই সে ধন্যা হইয়া গিয়াছে। সে জানে, সোমনাথ কোন দিন তাহার পানে ফিরিয়া তাকাইবে না, সোমনাথ কোনও দিন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাহার সেবার উল্লেখ করিবে না। উল্লেখ না করুক, গ্রহণ ত সে করিতেছে! তাহার সেবা স্বীকৃতি দ্বারা পুরস্কৃত না হইলেও অস্বীকৃতি দ্বারা অবজ্ঞায় অবলুণ্ঠিত হইতেছে না ত! শর্মিষ্ঠা এই সকল ভাবিতেছে আর ব্যস্ত হস্ত সঞ্চালনে যথারীতি গৃহাভ্যন্তর সুবিন্যস্ত করিতেছে।

চায়ের কাপটা শয্যাপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। শর্মিষ্ঠার অধর প্রান্তে করুণামাখা ব্যঙ্গের হাসি ফুটিয়া উঠিল। বেচারী সম্মুখস্থ টেবিলটার পানেও তাকাইয়া দেখিবার অবসর পায় না। জলের কুঁজা হইতে জল

লইয়া কাপ ডিস ধুইয়া টেবিলে রাখিতে যাইবে এমন সময় সহসা মুকুরে সোমনাথের দীর্ঘ দেহ প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল।

—একি! আপনি আমার ঘর পরিষ্কার করছেন? কেন? ছি কি করে?

শর্ম্মিষ্ঠা এ সকল প্রশ্নের একটারও জবাব দিতে পারিল না। পশ্চাতে না ফিরিয়া মুকুরে-প্রতিবিম্বিত সোমনাথের অবয়বের পানে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইতে তাকাইতে সে কঠিন হইয়া উঠিল। তাহার কি হইল সেই জানে! সেই নির্জ্জন কক্ষে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাহার চোখ দুইটা ক্রমশঃ বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। সহসা তাহার উত্তেজিত দেহটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হস্তধৃত কাপটায় একটা অস্বাভাবিক চাপ দিতেই কাপটা ভাজিয়া সশব্দে মেঝের পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠার অচেতন দেহটাও মেঝের লুটাইয়া পড়িল!

এই অভাবিত পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া সোমনাথ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে ভাবিল, শর্ম্মিষ্ঠার কি মূর্চ্ছা রোগ আছে? পর-মুহূর্ত্তেই সে সজাগ হইয়া নিজ কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। এ সময় সকল দুর্ব্বলতা পরিহার করিতেই হইবে। সোমনাথ তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল লইয়া শর্ম্মিষ্ঠার মুখে চোখে সিঞ্চন করিতে লাগিল।

শর্ম্মিষ্ঠার জ্ঞান হইলে দেখিল, সোমনাথের অঙ্কে উপাধান রচনা করিয়া সে শুইয়া আছে। একটা স্বর্গীয় অনুভূতি! সে চক্ষু মুদ্রিত করিল। কয়েক মুহূর্ত্তে সে নিজেকে সম্বরণ করিয়া লইল। সে উঠিয়া বসিয়া সহজ ভাবেই ধীরে ধীরে বলিল,—আপনি যান। ছেলেবেলায় আমার হিষ্টিরিয়া ছিল। অনেক দিন হয় নি। রোগের কথা ভুলেই গিয়েছিলুম। এতদিন পরে দেখছি আবার আক্রমণ করেছে। যাক্, এখন ভালই আছি। আপনি একটু বাইরে অপেক্ষা করুন।

সোমনাথ বিনা বাক্যব্যয়ে গৃহান্তরে গমন করিল।

অন্যমনস্কতার অপবাদ দিলেও সোমনাথ কিন্তু শর্মিষ্ঠার সেই মুকুরে বিম্বিত মুখ দেখিতে ভুল করে নাই। তাহার সেই দৃষ্টি, সেই আত্ম-সম্বরণের কঠিন প্রয়াসও তাহার লক্ষ্য অতিক্রম করে নাই! সোমনাথ ভাবিল, শর্মিষ্ঠা কবে, কোথায়, কেমন করিয়া তাহাকে ভুল বুঝিল। সে ত জ্ঞানতঃ কখনই তাহার অবসর দেয় নাই! শর্মিষ্ঠা সহসা আত্মবিস্মৃতা হইলেও ইহা যে তাহার দীর্ঘদিন সঞ্চিত মানসিক অনুরাগের বহিঃপ্রকাশ তাহা গোপন থাকে নাই। দেহকে জয় করিবার অস্বাভাবিক পীড়নেই সে মূর্চ্ছাতুর হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। সে মিথ্যা বলিয়াছে। হিষ্টিরিয়া তাহার কোন কালেই ছিল না। আজও নাই।

হায়, সোমনাথ জানে না, একের উৎসাহের অভাবেও অতনুর কার্মুক নিক্ষিপ্ত শর অপরকে পীড়িত করিতে কার্পণ্য করে না। শর্মিষ্ঠার শিক্ষা সংস্কৃতি, সুদৃঢ় মানসিক শক্তি সকলই আজ একমুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল এক দুর্ব্বলতম মুহূর্ত্তে।

শর্মিষ্ঠা লজ্জা পাইল। আপন দুর্ব্বলতার নগ্ন প্রকাশে গভীরতম লজ্জায় সে ডুবিয়া গেল। কিন্তু সেই সঙ্গেই একটা অপূর্ব্ব আনন্দের বন্যায় সে যেন ভাসিয়া গেল। সারারাত্রি একটা অনাস্বাদিত সুখস্বপ্নে বিভোর হইয়া সে আধ ঘুমে আধ জাগরণে কাটাইয়া দিল। এক সময় তাহার মনে হইল, এই অসহ আনন্দ তাহাকে যেন মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। মৃত্যু! আঃ, যদি এসময় তাহার মৃত্যু হইত!

শর্মিষ্ঠা প্রাতে স্নান সারিয়া শুচি-শুভ্র দেবী-প্রতিমার মত অপর্ণার কক্ষে প্রবেশ করিল। তাহার সদ্যস্নাত শুভ্র মুখখানিতে কোথাও এতটুকু গ্লানি, এতটুকু অবসাদ ছিল না।

সেই মুহূর্ত্তে সোমনাথও কি একটা প্রয়োজনে কক্ষে প্রবেশ করিয়া শর্মিষ্ঠার পানে তাকাইয়া কিছুটা বিস্ময় অনুভব করিল! সোমনাথ দেখিল, শর্মিষ্ঠার সারা অঙ্গ ঘেরিয়া যেন একটা শুচিতা, একটা পবিত্রতা

স্নিগ্ধ স্নেহ পরিবেশণ করিতেছে। সোমনাথ ভাবিল, সে শর্ম্মিষ্ঠাকে ভুল বুঝিয়াছে। পরক্ষণেই আবার ভাবিল, সন্ধ্যার শর্ম্মিষ্ঠা আর সকালের শর্ম্মিষ্ঠা বুঝি এক নহে, এক দেহে যেন দুইটি স্বতন্ত্র শর্ম্মিষ্ঠা বাস করিতেছে। সোমনাথের প্রশংসমান দৃষ্টির সহিত শর্ম্মিষ্ঠার লজ্জিত দৃষ্টির বিনিময় হইল। উভয়েই চক্ষু ফিরাইয়া লইল। অপর্ণার তীক্ষ্ণ সজাগ চক্ষু এই বিনিময়টুকু ধরিয়া ফেলিল, অপর্ণা কহিল,

—সমী! আয়, কাছে বোস্। শর্ম্মিষ্ঠা তুমিও আমার কাছে বোসো মা।

উভয়ে মায়ের শয্যার দুই প্রান্তে বসিল। অপর্ণা অনেকক্ষণ চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। পরে শর্ম্মিষ্ঠাকে আদেশ করিল,—পূবের জানালাটা আরও একটু ভালো করে খুলে দাও ত মা।

শর্ম্মিষ্ঠা জানালাটা ভাল করিয়া খুলিয়া দিলে এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আসিয়া ঘরটা ভরিয়া দিল। পরক্ষণেই অপর্ণা শর্ম্মিষ্ঠার হাতখানা তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে বুলাইতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে নিশ্চুপ হইয়া বসিয়া রহিল। সহসা অপর্ণা সোমনাথকে প্রশ্ন করিল,

—সমী! শর্ম্মিষ্ঠাকে তুই আগে থেকেই চিনতিস্, কিন্তু আমাকে গোপন করেছিস।

উভয়েই চমকিত হইল। শর্ম্মিষ্ঠা সন্তর্পণে হাতটা সরাইয়া লইল।

—মাত্র একদিনের পরিচয়। ও সুপ্রিয়ার কলেজ-বন্ধু। কিন্তু গোপন আমি করিনি মা। তুমি আমায় এর আগে এ বিষয়ে প্রশ্ন করোনি, আমিও বলিনি। অপর দিকে শর্ম্মিষ্ঠারও নিষেধ ছিল।

—আমিও তাই অনুমান করেছিলুম। পরে শর্ম্মিষ্ঠার পানে তাকাইয়া কহিল,—শর্ম্মিষ্ঠা! তুমি মিথ্যা বলেছ। তুমি বলেছ কোন দিন তুমি কলেজে পড় নি।

শর্ম্মিষ্ঠা এভাবে ধরা পড়িয়া গিয়া মাথা নত করিল।

—সখী! এবার একবার ও ঘরে যা। সোমনাথ উঠিয়া গেল।

শর্মিষ্ঠাও তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িয়া কহিল,—আপনার স্যুপটা তৈরী করতে একটু দেরী হয়ে গেল, আমিও উঠি মা।

—না, তুমি বোসো। হোক দেরী।

বাধা পাইয়া শর্মিষ্ঠা বসিয়া রহিল। কিন্তু সেই শীতল বায়ু-প্রবাহিত স্নিগ্ধ কক্ষে বসিয়াও তাহার কপালে স্বেদবিন্দু দেখা দিল। সে যেন বিচারকের সম্মুখীন এক অপরাধিনী!

অপর্ণা আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া একই ভাবে চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল। পরে ধীরে ধীরে কহিল,—শর্মিষ্ঠা শিক্ষায়-দীক্ষায় হয়ত তুমি আমার চেয়ে ছোট নও, কিন্তু বয়সে তুমি অনেক ছোট! তাই, সংসারটা চেনবার সুযোগ তুলনায় তোমার অনেক কম হয়েছে।

শর্মিষ্ঠা তেমনই নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিল, কোন উত্তর করিল না।

অপর্ণা বলিতে লাগিল,—ভালবাসাটা অপরাধও নয়, অন্যায়ও নয়। তাই ওতে লজ্জা পাবারও যেমন কিছু নেই, অনুতাপ করবারও তেমনই কিছু নেই। তুমি যে ভালবাসায় পড়েছ, তা তুমি গোপন রাখতে পারনি। তোমার পাহাড়ের সঙ্গে সাগরের উপমাটা নিছক কাব্যিক সমালোচনা নয়, তা আমি অন্তর দিয়ে অনুভব করতে পেরেছিলুম। কিন্তু বুঝতে পারি নি তোমার সেই ভালবাসার পাত্রটি কে! আজ যখন বুঝতে পারলুম, তখন একদিকে আনন্দ অপরদিকে বেদনায় মনটা বিষাদ হয়ে গেল। কিন্তু আমি অসহায়! আমি মত দিতে পারি না। তুমি সুপ্রিয়ার ঘটনা সবই জানো। বল শর্মিষ্ঠা! আমি কি করতে পারি?

শর্মিষ্ঠা শান্তকণ্ঠে কহিল,—সব জানি মা! আপনি নিশ্চিন্ত হোন। আপনি নির্ভয় হোন। যেটুকু করবার আমিই কোরব। আমায় বিশ্বাস করুন মা।

অপর্ণা ততোধিক কোমল ও হ্রস্ব স্বরে কহিল,—বিশ্বাস তোমায় করি মা! তবুও···বলিয়া তাহার স্বভাব-সুলভ রহস্যময়ী হাসি হাসিয়া

কহিল,—'বাট্, ইট ইজ এ কেয়ার কম্পিটিশান'। তুমি যদি সোমনাথকে জয় করতে পারো তবে আমি প্রত্যক্ষভাবে তাতে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াব না।

শর্মিষ্ঠা ততোধিক রহস্যময়ী হাসি হাসিয়া কহিল,—'বাট্ দি টাস্ক ইজ টু হার্ড!' প্রলোভনটাও সামান্য নয়, তবে আমার কর্তব্য আমি করব। সুপ্রিয়া আমরা শুধু এক ক্লাসের বন্ধু নয়, সে আমার সত্যিকার বন্ধু।

বলিয়াই সে অপর্ণাকে রাখিয়া ফুড তৈয়ারী করিতে উঠিয়া গেল।

কয়েকদিন হইতে অপর্ণা বেশ ভালই আছে। আজ সে বাহিরে যাইবার জন্য অত্যন্ত জেদ ধরিল। সোমনাথ কহিল, ডাক্তার মেটার সহিত পরামর্শ করিয়া কাল তাহাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইবে। অপর্ণা অশান্ত হইয়া উঠিল, কহিল,

—দেখ্ দেখ্ সখী, সমুদ্র কী গাঢ় নীল! ওই নীলাম্বুধি আমায় আকুল আগ্রহে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কাল, অর্থাৎ চব্বিশঘণ্টাকাল ওর আহ্বান উপেক্ষা করে এই জানালার ধারে আমি বসে থাকব? অসম্ভব, অসম্ভব সখী! এখনই আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে। শর্মিষ্ঠা তুমিও তৈরী হয়ে নাও না। কিছু ভয় নেই। আমার কিছু হবে না।

এই অস্বাভাবিক ব্যস্ততায় সোমনাথ ও শর্মিষ্ঠা সাড়া না দিয়া পারিল না। উভয়ে অতি সন্তর্পণে অপর্ণাকে সমুদ্রতীরে লইয়া চলিল। সমুদ্রতীরে সেই বেলাভূমিতে আসিয়া অপর্ণা চঞ্চলা বালিকার ন্যায় নগ্ন-পায়ে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অপর্ণা আজ যেন পরিপূর্ণ আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তাহার উভয় পার্শ্বে সোমনাথ শর্মিষ্ঠা চলিয়াছে নীরবে। একসময় অপর্ণা বালুর উপর বসিয়া পড়িয়া কহিল,

—সাগর জলে নেমে পড়ি।

শর্মিষ্ঠা মিনতির সুরে কহিল,

—ডাঃ মেটার বিনা অনুমতিতে অনেকটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে মা। এর পর যদি আপনি জলে নামেন তা হলে আর আমার চাকরী থাকবে না।

অপর্ণা ছেলেমানুষের ভঙ্গিতে কহিল,—নাই বা থাকল।

শর্মিষ্ঠা বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া কহিল,

—চাকরী গেলে এই বিদেশে খাব কি ?

—বিদেশেই কি তুমি চিরকাল থাকবে ?

—চিরকালের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এই মুহূর্তে চাকরী হারালে আমি অসহায়া হয়ে পড়ব।

অপর্ণা অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল। সুযোগ পাইয়া শর্মিষ্ঠা কহিল,

—এইবার ফেরবার অনুমতি করুন মা।

সহসা বিরক্ত হইয়া অপর্ণা শুষ্ক কণ্ঠে কহিল,

—সমী! একটা দিনের জন্যেও কি তুমি আমায় এই নার্সের অনুশাসন থেকে অব্যাহতি দিতে পার না ?

সোমনাথ মায়ের এই রুক্ষতার কারণ অনুমান করিতে পারিল না; কিন্তু তাহার উত্তেজনায় শঙ্কিত দৃষ্টি মেলিয়া শর্মিষ্ঠার পানে তাকাইল।

শর্মিষ্ঠা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,

—আপনি অনুমতি করলে কালই ডাঃ মেটাকে বলে আমি বিদায় নিতে পারি মা। সোমনাথবাবুকে ওভাবে অনুযোগ করবার কোন প্রয়োজনই নেই।

অপর্ণা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। অস্তগামী ম্লান সূর্য্যের পানে প্রণাম করিয়া মনে মনে কহিল,

—আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর বিশ্বদেব! অন্ধকারের কোলে বিশ্রাম নেবার পূর্ব্বে তুমি পৃথিবীকে বিদায় জানাচ্ছ পুনর্মিলনের বাণী বহন করে। আমারও যদি বিদায় মুহূর্ত্ত সন্নিকট হয়ে এসে থাকে তবে হে বিশ্বদেব!

সম্পূর্ণতর জীবনলাভের প্রার্থনা জানিয়ে আমিও যেন নীরবে ওই পরিপূর্ণ অন্ধকারের রাজ্যে আত্মগোপন করতে পারি।—অস্তায়মান সূর্য্যের পাণ্ডুর রশ্মি অপর্ণার পাণ্ডুর আননে পড়িয়া তাহাকে আরও বিষণ্ণ করুণ করিয়া তুলিল।

এবার অপর্ণা প্রকাশ্যে কহিল,

—শর্ম্মিষ্ঠা! আজকের সন্ধ্যাটা কি শান্তির নিবিড়তায় না ছেয়ে ছিল। তোমাকে আঘাত করতে গিয়ে সেই প্রশান্তির প্রসন্নতা হারিয়ে গেল। কিন্তু তোমার কাছে তাই বলে ক্ষমা চাইতে পারবো না মা। এ আমার দুর্ব্বল মনের প্রতিক্রিয়া!

শর্ম্মিষ্ঠা বিস্ময়ে কহিল,—প্রতিক্রিয়া!

—মনে করে দেখ শর্ম্মিষ্ঠা! একদিন তোমায় আমি সত্যিকার মায়ের দাবী জানিয়েছিলাম। তুমি কঠিন আঘাত দিয়ে তা প্রত্যাখান করেছিলে। বলেছিলে—তুমি মাইনে পাও। জানিনা তার পিছনে কী গোপন অভিমান লুকিয়ে ছিল। আজ এই আঘাতের পেছনেও যদি কোন গোপন অভিমান থাকে তা স্মরণ করে তুমি আজকের আঘাত ভুলতে চেষ্টা কোরো।

শর্ম্মিষ্ঠা অপর্ণার হাত দুইখানি ধরিয়া অত্যন্ত কোমল কণ্ঠে কহিল,

—আমায় ক্ষমা করুন মা! বলিয়াই একেবারে মাথা নত করিয়া পায়ধূলি গ্রহণ করিল।

অপর্ণার চক্ষে জল দেখা দিল, ধরা গলায় কহিল,

—তোমাকে আজ আশীর্ব্বাদ করতে গিয়ে আমার গলায় ভাষা বেরুচ্ছে না। তুমি আমায় যেন ভুল বুঝো না মা।

পরে শ্রান্ত কণ্ঠে কহিল,—সমী! এবার ফিরে চল বাবা।

সোমনাথ সেই উদাস সন্ধ্যায় নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়াইয়া ছিল। মায়ের আদেশে সে নীরবেই সম্মতিদান করিল। তিনটি প্রাণী নিঃশব্দে ধীরে ধীরে সমুদ্র-সৈকত পরিত্যাগ করিল।

ভোর রাত্রে শর্ম্মিষ্ঠার শঙ্কিত আহ্বানে সোমনাথ অতিব্যস্তে উঠিয়া কহিল,—কি হয়েছে?

—হঠাৎ মা'র অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে। ডাঃ মেটাকে ফোন করেছি তিনি এখনি এসে পড়ছেন। আপনি আসুন।

সোমনাথ তাড়াতাড়ি শর্ম্মিষ্ঠার সঙ্গে মা'র কক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, মা'র চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা অতি কষ্টে বুকটা চাপিয়া ধরিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতেছে। সোমনাথ কাতর কণ্ঠে ডাকিল,—মা!

অপর্ণার নয়নের দুই প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। এ অশ্রু কিসের! ধরণীর শেষ বন্ধন ছিন্ন হইবার ব্যাথায়, না স্বামীকে ত্যাগ করিবার আশঙ্কায়, না রোগের দুঃসহ যন্ত্রণায় কে জানে!

ডাঃ মেটা প্রবেশ করিয়া অপর্ণাকে তদবস্থায় দেখিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

শর্ম্মিষ্ঠা আকুল কণ্ঠে কহিল,

—দাঁড়িয়ে কি দেখছেন ডক্টর! শীগ্‌গীর একটা কিছু ব্যবস্থা করুন। কোন ইন্‌জেকশন বা......

ডাঃ মেটা একইভাবে পকেটে হাত রাখিয়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়িলেন। পরে রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মুখের পানে স্থির দৃষ্টি মেলিয়া হাতটা তুলিয়া লইলেন। অপর্ণার চক্ষু মুদিয়া আসিল। ডাক্তার হাতটা ছাড়িয়া দিয়া শান্তকণ্ঠে উচ্চারণ করিলেন,

—আপনার মা শান্তির লোকে চলে গেলেন মিঃ সোমনাথ!

—মা!

সোমনাথের মূর্চ্ছিত দেহ সশব্দে পড়িয়া গেল। সেই আর্ত্তনাদ যেন বিদেহী আত্মার গতিকে ক্ষণেকের জন্য স্তব্ধ করিয়া ফেলিল। শর্ম্মিষ্ঠা স্পষ্ট দেখিল অপর্ণা যেন আর একবার দৃষ্টি মেলিয়া নয়ন নিমীলিত করিল।

ডাঃ মেটা ও শর্ম্মিষ্ঠার যত্নে সোমনাথ কিছু পরে জ্ঞান লাভ করিয়া উঠিয়া বসিল। সম্মুখে মায়ের মৃতদেহটার পানে তাকাইয়া অকবেগে স্থির ভাবেই বসিয়া রহিল।

ডাঃ মেটা কহিলেন,—কর্ত্তব্যে কঠোর হ'ন মিঃ সোমনাথ! আমি আমার বাঙ্গালী বন্ধুদের সংবাদ পাঠাচ্ছি।

প্রত্যুত্তরে সোমনাথ হাঁ না একটা বর্ণও উচ্চারণ করিল না।

সর্ব্বহারা সোমনাথকে সান্ত্বনা দেওয়া বৃথা! শর্ম্মিষ্ঠা তাই সোমনাথের পানে কাতরদৃষ্টি মেলিয়া একই ভাবে বসিয়া রহিল। দুঃসহতম বেদনার অংশভাগিনী শর্ম্মিষ্ঠা তাহার সত্যকার কেহ নহে, তবু অদৃষ্টের পরিহাসে এই অভাবনীয় পরিবেশের মাঝে সেই আজ তাহার একমাত্র বন্ধু!

দুই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই কয়েকজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া যথারীতি সোমনাথকে সান্ত্বনা ও সমবেদনা দিয়া শব লইয়া প্রস্থান করিলেন। সোমনাথ শবের অনুগমন করিবার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে শর্ম্মিষ্ঠার হাতে টেলিগ্রাম আসিল,

—পিতা মৃত্যুশয্যায়! মাকে লইয়া চলিয়া আসুন! 'নরেন'।

শর্ম্মিষ্ঠা ভাবিল, বিপদ কখনও একা আসে না। হয়ত তাহার পিতাও এ যাত্রা রক্ষা পাইবেন না।

পরদিন সকালে ভিক্টোরিয়া টারমিনাসে ট্রেণে চাপিয়া সোমনাথ চঞ্চল প্ল্যাটফরমটার পানে উদাস দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়াছিল। ট্রেণ ছাড়িতে আর বিলম্ব নাই। সহসা সোমনাথ লক্ষ্য করিল শর্ম্মিষ্ঠা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাহারই কামরা লক্ষ্য করিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সোমনাথকে দেখিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

—যাক্ শেষে শেষ দেখাটাও হয়ে গেল।

আসিবার সময় সোমনাথ ট্যাক্সিতে উঠিলে শর্মিষ্ঠা তাহাকে বিদায় দিতে তাহার পার্শ্বে উপস্থিত ছিল। আবার এখন কেন যে সে প্লাটফরমে দেখা করিতে আসিল তাহা সোমনাথ ভাবিয়া পাইল না। এই মুহূর্তে সে ভাবিতেছিল, এতবড় বিশাল সংসারে সে কী একা. কী নিঃসঙ্গ! বোম্বেতে নামিবার দিন কত আশা কত আনন্দ লইয়াই না সে তাহার মাকে লইয়া নামিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, তাহার মাকে সুস্থ করিয়া সে ফিরিবে! হায় মানুষের আশা! জনমুখর প্লাটফরমের নিঃসঙ্গতার মাঝে শর্মিষ্ঠাকে পাইয়া সোমনাথ যেন একটা স্বস্তি অনুভব করিল! শর্মিষ্ঠার কথার উত্তরে সে মুখে কিছুই বলিল না। তেমনই সকরুণ দৃষ্টি মেলিয়া বাহিরের জনতার পানে তাকাইয়া রহিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। ট্রেণ ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই। উভয়েই স্তব্ধ হইয়া আছে। সোমনাথ সহসা এক অদ্ভুত বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিয়া উঠিল,

—শর্মিষ্ঠাদেবী! আমার মত অকৃতজ্ঞ মানুষ বোধ হয় সংসারে আর দুটি নেই। সংসারে এসে অপরের দান দুহাতে অঞ্জলিভরে নিয়েই গেলুম, দিতে কিছু পারলুম না। হয়ত দেবার সত্যিই কিছু আমার নেই। লোকে জানল আমার অহঙ্কার, আমার ঔদ্ধত্যটাই বড়, হৃদয়টা সেই অনুপাতেই ছোট!

—সোমনাথবাবু! আপনার দানে একদিন পৃথিবী সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। সাময়িক তুচ্ছতার বহু উপরে আপনি। আজ আপনার এই সাময়িক অবসাদ থেকে আপনি মুক্ত হোন, ভগবানের কাছে আমি নিত্য এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

কল্যাণময়ী শর্মিষ্ঠা! কয়টি কথার প্রলেপে সোমনাথ কী তৃপ্তিই না পাইল! শর্মিষ্ঠা কহিল,

—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি আপনি যেন গিয়ে আপনার বাবাকে সুস্থ দেখেন। সোমনাথ কোন উত্তর করিল না। ক্ষণেক ইতস্ততঃ করিয়া শর্ম্মিষ্ঠা পুনরায় কহিল,

—যদি কোন দিন সুপ্রিয়ার সামনে আমার প্রসঙ্গ ওঠে তা'কে বলবেন, শর্ম্মিষ্ঠা তার বন্ধুত্বের সম্মান রাখতে চেষ্টার ত্রুটি করে নি। কিন্তু তা সত্বেও যদি কোন ত্রুটি থেকে থাকে তা যেন সে ক্ষমা করে।

সোমনাথ মস্তক আন্দোলিত করিয়া জানাইল সে জানাইবে, কিন্তু এবারেও কোন কথা কহিল না। ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

শর্ম্মিষ্ঠার নয়নে সহসা রাজ্যের অন্ধকার নামিয়া আসিল। অপসৃয়মান ট্রেণটার পানে তাকাইতে তাকাইতে অন্তর হইতে একটা অদম্য ক্রন্দনবেগ রহিয়া রহিয়া তাহার সমগ্র দেহটাকে কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। উদ্দেশ্যে যুক্ত করে প্রণাম করিয়া সে মনে মনে কহিল,

সোমনাথ! তোমাকে পাইবার সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিতা হইলেও তোমার কয়দিনের সাহচর্য্য আমার জীবনে অক্ষয় হইয়া গাঁথিয়া থাকিবে। সুপ্রিয়া হয়ত দেবীর আসনে বসিয়া একদিন তোমাকে আলিঙ্গন করিবে। করুক, তাহাতে আমার ঈর্ষা নাই। ভাগ্যবিড়ম্বনায় আমি হয়ত তখন সামান্যা মানবীর ভূমিকায় ধরণীর সামান্য কুটিরে সংসারের অভিনয় করিব। প্রতিদিনের কঠোর কর্ত্তব্যে নিজেকে ব্যাপৃত রাখিতে চাহিলেও হয়ত ক্ষণে ক্ষণে এই কয়টা দিনের স্মৃতি অলক্ষ্যে উঁকি মারিয়া আমায় আনমনা করিয়া তুলিবে। জানি, হয়ত আর কোন দিনই তোমার সাক্ষাত পাইব না, তথাপি হে কঠোর দেবতা! তুমি দেবতার ভূমিকায় অভিনয় করিলেও এই সামান্যা মানবীর স্পর্দ্ধা ক্ষমা করিও, ক্ষমা করিও।

শর্ম্মিষ্ঠার আশঙ্কাই সত্য হইল। সোমনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া দেখিল, কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ম্যানেনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহার পিতার মৃত্যু

হইয়াছে। তাহার আসিবার অপেক্ষায় সকলে শব আগলাইয়া বসিয়া আছেন। মাতার মৃত্যুর পর এই আঘাত তাহাকে নূতন করিয়া শোকার্ত্ত করিলেও মূহ্যমান করিয়া ফেলিল না। সে যথারীতি আপন কর্ত্তব্য সমাধা করিল।

সংবাদ পাইয়া রাজলক্ষ্মী আসিলেন, প্রোঃ ঘোষাল আসিলেন, সুপ্রিয়া আসিল। রাজলক্ষ্মী অনেক সান্ত্বনা দিলেন, সাহস দিলেন, উপদেশ দিলেন। প্রোঃ ঘোষাল শুধু বলিলেন,

—অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার সোমনাথ! অত্যন্ত শোচনীয় ব্যাপার! এ ভাবে একই সঙ্গে বাপ মা দুইজনকেই হারাবে, এ আমি ভাবতেও পারি নি। দেখেছ, কি রকম বাধার পর বাধা এসে এক্সপেরিমেণ্টটা পেছিয়ে দিচ্ছে? এবার কিন্তু... ...

রাজলক্ষ্মী বাধা দিয়া বলিলেন,—তুমি এখন থামো ত! তোমার এক্সপেরিমেণ্টের কথা পরে হবে। প্রফেসর ঘোষাল বুঝিলেন, এখন ও প্রসঙ্গটা উত্থাপন করা সঙ্গত হয় নাই, তাই নিজেকে সংশোধন করিয়া বলিয়া উঠিলেন,

—ঠিক কথা! ঠিক কথা! এ সময় ও সব কথা তোলবার কোন অর্থই হয় না। সোমনাথ! তুমি একটু সামলে নাও বাবা! ও সব পরে ভাবা যাবে। তুমি কিছু ভেবনা।

সোমনাথই যেন তাঁহাকে তাহার ভাবনার কথা জানাইয়াছে এই ভাবে সান্ত্বনা দিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া প্রোঃ ঘোষাল প্রস্থান করিলেন।

সুপ্রিয়া একটি কথাও কহিল না। কেবল যতক্ষণ সে রহিল, ততক্ষণ একক্ষণের জন্যও তাহার দৃষ্টি সোমনাথকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র নিবদ্ধ করিল না।

শ্রাদ্ধের তখনও বিলম্ব আছে। সোমনাথ তাহার প্রধান কর্মচারীর সহিত তাহার সমগ্র দেনা পাওনার একটা হিসাব নিকাশ স্থির করিতেছিল। পরিদর্শন শেষে সোমনাথ গম্ভীর আবেগের স্বরে কহিল,

—কিছু লুকোবার চেষ্টা করবেন না সুরেন বাবু। আমি জানতে চাই মোট দেনার পরিমাণ কত এবং বাড়ী ঘর সব বেচে দিয়েও শ্রাদ্ধের খরচের জন্য কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি না।

সুরেন বাবু বিরলকেশ মস্তকে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে করিতে ভয়ে ভয়ে কহিলেন,

—শেষ পাঁচ বৎসর ক্রমান্বয়েই লোকসান যাচ্ছিল কিনা তাই…

সোমনাথ অধীরভাবে ধমক দিয়া কহিল,

—কায়দা মাফিক্ ভূমিকা ছাড়ুন সুরেন বাবু! দেনার পরিমাণ কত এবং সম্পত্তির মূল্যের পরিমাণই বা কত, পরিষ্কার করে তাই খুলে বলুন।

—সুদ সমেত দেনার পরিমাণ প্রায় পঁচিশ লক্ষ। সমগ্র সম্পত্তির মূল্য ফেলে-ছড়িয়েও প্রায় ত্রিশ লক্ষের কিছু উপর। কিন্তু হঠাৎ কিছু করতে গেলে ওই পঁচিশ লক্ষ পাওয়াই দুর্ঘট হয়ে উঠবে।

সোমনাথ আদেশ করিল,

—কালই সমস্ত পাওনাদারদের ডাকুন। শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে আমি আমার স্বর্গীয় পিতাকে ঋণমুক্ত দেখতে চাই।

সুরেন বাবু অনুনয়ের ভঙ্গিতে কহিলেন,

—এমন কায করবেন না খোকাবাবু! তাহলে সব যাবে। ভিটে-মাটি ছেড়ে একেবারে পথে বসতে হবে। আপনি ওদের চেনেন না। দাঁও পেলে ওরা কিছুতেই ন্যায্য দাম দেবে না। শ্রাদ্ধটা আগে ভালয় ভালয় মিটে যাক্ তারপর ওসব দেখা যাবে।

—না—না। আমি কোন কথা শুনতে চাই না। কাল সকালেই সকল পাওনাদারদের সঙ্গে আমি মুখোমুখি কথা কইতে চাই।

সুরেন বাবু হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতে সকলে উপস্থিত হইলে সোমনাথ তাহাদের উদ্দেশ করিয়া কহিল, তাহারা তাহাদের ঋণের হিসাব প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছে কিনা।

সকলেই প্রায় প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল। তন্মধ্যে রতনলালের প্রাপ্যই বেশী। প্রায় এগার লক্ষ টাকা।

সোমনাথ তাহার ঋণমুক্তির আবেদন জানাইয়া কহিল,

—এবার আপনারা বলুন কে কত টাকায় এই সমগ্র সম্পত্তি নিতে পারেন।

অনেক দর কষাকষির পর স্থির হইল পঁচিশ লক্ষ টাকায় রতনলাল ব্যবসা সমেত সমগ্র সম্পত্তি সোমনাথের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লইবে। সুরেন বাবু কি একটা বলিতে চাহিলে সোমনাথ বাধা দিয়া কহিল,

—আমি রাজী রতনলাল বাবু! তবে শ্রাদ্ধের ব্যয়ের জন্য এতে কিছুই অবশিষ্ট থাকে না তাই আরও দশ হাজার টাকা আমার প্রয়োজন। আপনি ঐ টাকাটা যত শীঘ্র পারেন দিয়ে এটর্ণী মারফৎ দলিল সম্পাদন করিয়ে নিন।

ক্রূর রতনলাল অত্যন্ত ভালমানুষীর হাসি হাসিয়া কহিল,

—বোড্ডো লোকসান হইয়ে গেলো বাবুজী! তবে হাপনে যখন বোলসেন তখোন তা-ই হোবে। এখোন এই দশ হাজার টাকা লিয়ে একটা বয়নামা পত্র করিয়ে দেন।

বলিয়া একখানা দশ হাজার টাকা চেক লিখিয়া আগাইয়া দিল। সুরেন বাবু বয়নামা পত্রখানা লিখিয়া সহি করিবার জন্য সোমনাথের হস্তে সমর্পণ করিলেন। এমন সময় ধীর পদক্ষেপে সেখানে সুপ্রিয়া প্রবেশ করিল। সহসা যেন তাহার আবির্ভাব ঘটিল। সোমনাথ সহি করিবার পূর্ব্বে একবার তাকাইয়া দেখিল।

—থামো!

আলুলায়িতকেশা সুপ্রিয়া যেন সম্রাজ্ঞীর ভূমিকায় অভিনয় করিতেছে। রতনলালের মুখ অপ্রসন্ন হইল। অপর সকলে সবিস্ময়ে তাহার প্রতি তাকাইয়া রহিল। সুপ্রিয়া বলিতে লাগিল,

—রতনলাল বাবু! বিষয়ের কূটনীতি আমি কিছুই বুঝি না। কিন্তু আড়ালে থেকে আপনাদের কথাবার্তায় এইটুকু বুঝেছি যে সোমনাথ বাবুর সরলতা আর বিষয়-বুদ্ধির অভাবটুকু আপনারা নিজের নিয়ে কাজে লাগাচ্ছেন। যে বিষয়ের দাম কেলে ছড়িয়ে ত্রিশলক্ষ টাকা হওয়া উচিত, তা পঁচিশ লক্ষের ওপর আরও দশ হাজার দিয়ে উদারতা দেখাচ্ছেন। এ আমি হতে দেবো না।

রতনলাল তেমনই শান্তকণ্ঠে কহিল,

—সে আপনি বোলতে পারেন। আমরা অসময়ে সোমনাথ বাবুকে বিরক্ত করতে আসি নি, সোমনাথ বাবুই আমাদের ডাকিয়েছেন।

সোমনাথ মাথা উঁচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,

—সত্যি! রতনলাল বাবুকে এক্ষেত্রে অনুযোগ করা অন্যায় হবে সুপ্রিয়া!

অভিমান আহত কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—ন্যায় অন্যায়ের বিচার পরে শুনব, কিন্তু বর্তমানে এই অপদার্থ মানুষগুলোর সামনে অমন করে আমায় ছোট কোরোনা সমাদা! জানি, তুমি কারো কথাই শুনবে না। তবু মনে মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও আজকে তুমি আমায় অমান্য করবে না। কিন্তু তা হোলো না। রতনলাল বাবু! আপনি জিতে গেলেন, আমি হেরে গেলুম। তবু সকল লজ্জা খুইয়ে করজোড়ে আপনার কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, অন্ততঃ এই বাড়ীখানা আপনি সোমনাথ বাবুকে অব্যাহতি দিন। আমার মাসীমা এই বাড়ীতে দিনের পর দিন আপনাদের বাবুজীকে এতটুকু থেকে মানুষ করেছেন। এর দেওয়ালে দেওয়ালে মাসীমার ডাক আর আপনাদের বাবুজীর হাসি কান্না মিশিয়ে রয়েছে। দোহাই রতনলাল বাবু! বাড়ীখানা ছেড়ে দিন। আপনার ভালো হবে! আপনার ছেলেপুলের ভালো হবে।

সভায় সকলেরই চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। সোমনাথও বিচলিত হইয়া পড়িল। তাহার হস্তধৃত বয়নামা পত্রখানা কঠিন চাপে পিষ্ট হইবার উপক্রম করিল। সোমনাথ কি সঙ্কল্পচ্যুত হইবে? না, সে সোমনাথ! সঙ্কল্পে সে অটল, অচল!

সুচতুর রতনলাল সকলই লক্ষ্য করিতেছিল। সে অত্যন্ত মিষ্ট করিয়া উত্তর করিল,

—হামি সবকুছ বুঝতে পারছে মা। হামাকে দোষী করবেন না। বেশ ত, অপর কাউকে বিক্রী কোরলে যদি হাপনার নাফা হয়, হাপনি তা করতে পারেন। তবে এটুকু হামি করতে পারি যে, ছে মাসের মধ্যে সোমনাথ বাবুকে এবাড়ী ছাড়তে হোবে না।

গম্ভীর কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—ধন্যবাদ! রতনলাল বাবু! তার আগেই আমি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যাবো। বলিয়াই বয়নামাপত্রে সহি করিয়া আগাইয়া দিল।

কখন যে পাওনাদাররা চলিয়া গিয়াছে, কখন যে সোমনাথও সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহা সুপ্রিয়া টের পায় নাই। সম্বিৎ ফিরিলে দেখিল, সে স্থাণুর ন্যায় একইভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহার হৃতমান অন্তরটাকে অন্বেষণ করিবার ব্যর্থ প্রয়াস পাইতেছে!

সুপ্রিয়া লক্ষ্য করিল, অপর্ণার অভাবে সোমনাথকে যেভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িবে বলিয়া সে আশঙ্কা করিয়াছিল বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু সোমনাথ তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া কঠিন দৃপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে তাহার উল্লসিত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু কেন জানিনা সোমনাথের সবল সাবলীলতায় সুপ্রিয়া কোথায় যেন ক্ষুণ্ণ হইল, আহত হইল! সে ভাবিল, সোমনাথ আজ সান্ত্বনা চাহে না, সহানুভূতিও চাহে না। সে আপন গতিপথ স্থির করিয়া স্থির লক্ষ্যে অগ্রসর হইতে চলিয়াছে। অসহায় অনভ্যস্ত সোমনাথ

যেন একদিনে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছে। সোমনাথের নিকট সুপ্রিয়া আজিও অপরিহার্য নহে! তাহার আবেদনে সোমনাথ সাড়া দেয় নাই, কোন সম্মানই দেখায় নাই! এই কথাটাই বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহার বুকের নিভৃত অংশে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। অথচ এমনই একটা বড় দুর্দিনে সোমনাথকে সে সর্বাপেক্ষা নিকটে কামনা করিয়াছিল। ভাবিয়াছিল, তাহার সেবা, তাহার সহানুভূতি উভয়কে নূতন করিয়া আস্বাদন করিবার সুযোগ দিবে।

শঙ্কর সুপ্রিয়ার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল, তাই সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া ফিরিতেই অত্যন্ত সমবেদনার কণ্ঠে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,

—সোমনাথের এ দুর্দিনে আমার এই অক্ষম দেহ কোনও কাজেই এলো না। সুপ্রিয়া! একবারও যদি আজ সোমনাথের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারতুম! আহা! বেচারী! সংসারে মা ছাড়া আর কাউকে জানতো না! মায়ের মৃত্যুর সঙ্গে ওর সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল।

সুপ্রিয়া কোনও উত্তর দিল না। শঙ্কর পুনরায় বলিয়া উঠিল,

—এ সময়ে সোমনাথকে সর্বদা একলা ফেলে রাখা উচিত নয়।

সুপ্রিয়া শান্ত কণ্ঠে কহিল,—সমীদাকে তোমরা যতটা অসহায় ভাবছো, সে হয়ত ততটা অসহায় নয়!

শঙ্কর তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল,—না, না সুপ্রিয়া! এ সময় তুমি সোমনাথের প্রতি অবিচার কোরো না। ভাবো, সোমনাথের মত লোক এসময় কী রকম ভেঙে পড়েছে।

অপেক্ষাকৃত একটু কঠিন কণ্ঠেই সুপ্রিয়া উত্তর করিল,—তুমি নিশ্চিন্ত হও শঙ্কর দা! সমীদা একটুও ভেঙে পড়েনি। সে এখন দেনা পাওনা আর শ্রাদ্ধাদির কর্ম নিয়ে ব্যস্ত আছে। অবিচার আমি কারো ওপরই করতে চাই না, তবে নিজের প্রতি সুবিচার প্রত্যাশা করাও একটা অপরাধ নয়। বলিয়াই কক্ষ ত্যাগ করিল।

শঙ্কর তাকিল, কোথায় যেন একটা বেসুর বঙ্কার দিতেছে। তার ছিঁড়ে নাই, তবে সেই বেসুরটা যেন রীতিমত কর্ণ পীড়ার কারণ হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্কর রসে মনে উল্লসিত হইয়া উঠিল, কিন্তু সোমনাথের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া কিছুটা দমিয়াও গেল।

রাজলক্ষ্মী যথেষ্ট পরিশ্রম করিতেছেন। তাঁহার ব্যবস্থাপনায় সোমনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু শ্রাদ্ধের দিনেও যখন সুপ্রিয়া ও বাড়ী যাইবার কোনও উদ্যোগই করিল না, তখন রাজলক্ষ্মী আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কন্যাকে একান্তে ডাকিয়া তিরস্কারের সুরে কহিলেন,

—এটা কি হচ্ছে সুপ্রিয়া!

—কোনটা মা!

ইচ্ছা করিয়া না জানিবার ভান করাতে রাজলক্ষ্মী অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলেন, তথাপি বাহিরে শান্ত স্বরেই কহিলেন,—আজকের দিনেও তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছ। আজও কি তুমি ও বাড়ী যাবে না।

—না।

—সে আমি আগেই বুঝেছি। কিন্তু কেন?

—রাজা হরিশ্চন্দ্রের সর্বস্ব দানে বিশ্বামিত্রের মন উল্লসিত হলেও সারা বিশ্বের লোক তা'তে সেদিন কেঁদেছিল মা!

রাজলক্ষ্মী সবই জানিতেন, তাই চুপ করিয়া গেলেন। তথাপি ইহা অশোভন হইবে ভাবিয়া বলিলেন,—তোমার নিষেধ অমান্য করে ও তোমার অপমান করেছে, এ ধারণা ভুল। মনে রেখো, ও সত্যাশ্রয়ী! তুচ্ছ মান অভিমানে ওকে ভুল বুঝলে তোমার কল্যাণ নেই।

কন্যাকে দ্বিতীয়বার অনুরোধ না করিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

আহারে সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের পর স্নান সারিয়া সোমনাথ তাহার মায়ের কক্ষে প্রবেশ করিল। আজ তাহাকে সমী বলিয়া স্নেহের ডাক ডাকিতে সেখানে তাহার মা নাই। আছে ওই জীর্ণ আলনাটার

মাথায় তাহারই প্রাণহীন একটা তৈল চিত্র। সেই তৈল চিত্রটার পানে তাকাইতে তাকাইতে তাহার দুই চক্ষু দিয়া বাঁধ ভাঙা বন্যা স্রোতের অবিরাম ধারার ন্যায় অশ্রু তাহার কপোল চিবুক ভাসাইয়া দিল। তৈল চিত্রটা যেন ক্রমশঃ সজীব হইয়া উঠিতেছে। সোমনাথ মনে মনে বলিল, মাগো! একদিন তুমি বলিয়াছিলে সম্পদের মাঝে যদি না চিনিতে পারি তবে দুর্দিনের মাঝে আমার বন্ধুকে চিনিতে পারিবই। জীবনে ইহা অপেক্ষা বড় দুর্দিন আর কবে হইবে? কে সে বন্ধু! আর কবে তাহার দেখা পাইব? তোমার ইঙ্গিতে ভাবিয়াছিলাম সুপ্রিয়াই হয়ত আমার সেই বন্ধু! সেই ইঙ্গিত বহন করিয়া অনাগত দুর্দিনের অপেক্ষায় এতদিন প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। কিন্তু হায়, কঠিন পরীক্ষার দিনে সুপ্রিয়া বুঝি ভাসিয়া যায়। আজ আমি নিঃস্ব রিক্ত, অবাঞ্ছিত পথের পথিক। সুপ্রিয়া এই অবাঞ্ছিত পথিকের সহিত পথে দাঁড়াইতে হয়ত প্রস্তুত নহে। পথকেই বরণ করিতে পারে সংসারে এমন মেয়ে কয়জন আছে! হাঁ, দুর্লভ হইলেও আছে। সে মেয়ে শর্মিষ্ঠা! অনাদরের আঘাতকে বুকে সহিয়া সে পথে দাঁড়াইয়াছে, তথাপি মাথা নত করে নাই, শর্মিষ্ঠা মহীয়সী! এমন কঠিন মেয়েই পারে পাষাণের বুকে ফুল ফুটাইতে, পারে মরুভূমিতে স্বর্গোদ্যান রচনা করিতে। শর্মিষ্ঠার সহিত সুপ্রিয়ার তুলনাই হইতে পারে না। শর্মিষ্ঠা কিন্তু তাহার ভালবাসা গোপন রাখিতে না পারিলেও অত্যন্ত সুকৌশলে তাহাকে দূরে সরাইয়া দিয়াছে। সোমনাথ সেই আসন্ন সন্ধ্যায় সেই দূরত্বের মাধুর্য অনুভব করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মা সুপ্রিয়াকে চাহিয়াছেন। চাহিয়াছেন তাহাকে তাহার বধূরূপে। মাতার মনোনীত বধূ সুপ্রিয়া। সুপ্রিয়া হয়ত একদিন বধূ হইবে, কিন্তু বন্ধু ·· চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হইল! মুকুরে সুপ্রিয়ার পরিপূর্ণ অবয়ব ভাসিয়া উঠিল। সুপ্রিয়া একহাতে রেকাবীতে কিছু ফল ও মিষ্টান্ন ও অপর হাতে জলের গ্লাস লইয়া প্রবেশ করিতেছে। সোমনাথ মুকুরে দৃষ্টি রাখিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সুপ্রিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার পাশে আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল,—এসো, কিছু খেয়ে যাও। বলিয়া টেবিলে পাত্র সাজাইয়া আহ্বান করিল।

সোমনাথ নির্লিপ্ত কণ্ঠে কহিল,

—প্রয়োজন নেই, ইচ্ছাও নেই।

—প্রয়োজন হয়ত তোমার নেই, কিন্তু আমার আছে। সারাদিন না খেয়ে আমি আর দাঁড়াতে পারছিনা। নাও অনেক হয়েছে। এবার আমায় ক্ষমা কর! একটু কিছু মুখে দাও।

সোমনাথ এবার ভাল করিয়া সুপ্রিয়ার শুষ্ক মুখের পানে তাকাইয়া কহিল,—দেখ্‌ছি সত্যিই তুমি সারাদিন কিছু খাও নি! কিন্তু কেন?

সুপ্রিয়া একটা উদ্গত অশ্রু রোধ করিয়া বলিল,—আমি বড্ড ক্লান্ত সমীদা! এখন আমি তোমার সঙ্গে সব কথার জবাবদিহি করতে পারছি না। দয়া করে খেয়ে এখন আমায় অব্যাহতি দাও।

সোমনাথ আর প্রশ্ন না করিয়া আহারে মনোযোগ দিল। আহার শেষ হইলে সুপ্রিয়া নিঃশব্দে রেকাবী ও গ্লাসটা লইয়া প্রস্থান করিল।

পিতামাতার পারলৌকিক ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করিয়া একদিন সোমনাথ আবার প্রফেসরের ল্যাবোরেটরীতে প্রবেশ করিল। প্রফেসর অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহার প্রিয় শিষ্য সোমনাথকে গ্রহণ করিলেন। কয়েকদিন অতিবাহিত হইলে সোমনাথ জানাইল যে, অর্থের অভাবে আর বেশী দূর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব। প্রফেসর চিন্তিতভাবে বলিলেন, তিনি তাহা উপলব্ধি করিয়াছেন কিন্তু কোন উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এক উপায় সরকারের হাতে তাঁহাদের সমগ্র পরিশ্রমের ফল তুলিয়া দেওয়া। কিন্তু সে ক্ষেত্রে হয়ত সরকারী সাহায্যের বিনিময়ে অন্যের সাহায্যেই তাহাদের নামিতে হইবে। ইহা তাহাদের মূলনীতির বিপরীত।

অর্থের জন্য দুর্নীতি পরিহার করিবার চিন্তাও হাত দেওয়া যায় না। অন্ত-শিত দিনের পর দিন ভাবিয়াও সমস্যার সমাধান করিতে পারিলেন না।

সব কাজেই কেমন একটা শিথিলতা দেখা দিল। একদিন রাজলক্ষ্মী সোমনাথকে একান্তে ডাকিয়া কহিলেন,—কাজ-কর্ম ত ভগবানের ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় একরকম কাটলো। এটা মহাগুরু নিপাতের বৎসর। কালাশৌচ যাচ্ছে। এ বৎসরটা এখন ভালোয় ভালোয় কাটলে বাঁচি। যাই হোক, তোমার খাবার ব্যবস্থা কি হচ্ছে? শুনলুম, তুমি নাকি ঠাকুর চাকর সব বিদেয় করে দিয়েছ?

নত মুখে বিষন্ন কণ্ঠে সোমনাথ উত্তর করিল,—আমার বর্তমান অবস্থায় এ ছাড়া আর কি উপায় আছে বলুন! এক উপায় ঋণ। তাও রিক্তহস্তকে কে ঋণ দেবে বলুন?

উদ্বিগ্নকণ্ঠে রাজলক্ষ্মী কহিলেন,—বুঝলুম! দিতে কেউ চাইলেও নিতে তুমি অনিচ্ছুক! কিন্তু আমার প্রশ্নের জবাব এখনও পাইনি। তোমার খাওয়া দাওয়া কি ভাবে চলছে?

সোমনাথ কহিল,—অসুবিধা কিছুই নেই। মাইনে পাবার প্রত্যাশা না থাকলেও পুরোনো ঝিটা এখনও এ বাড়ীর মায়া ত্যাগ করতে পারে নি। সেই মায়ার মাশুল দিতে গিয়ে এখনও সে নিঃশুল্ক পরিচর্য্যা করে চলেছে। তারই সাহায্যে এবং একটা ইক্‌মিক্-কুকারের সহযোগিতায় বর্তমানে শাক সেবায় ভালই আছি।

রাজলক্ষ্মী একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—ভাল যে নেই তা তোমার শরীরই জানিয়ে দিচ্ছে। তোমার সঙ্গে রান্নাঘরের কেউ যে সহযোগিতা করতে পারে তা শপথ করে বললেও বিশ্বাস করতে পারব না; তা সে ইক্‌মিক্-কুকার বা ইকনমিক কুকার যেই হোক। কিন্তু আমি ভাবছি কি জানো, তোমার মায়ের অবর্তমানে আমরাই দূরে সরে যাচ্ছি, না তুমিই ইচ্ছা করে আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছ?

সোমনাথ অপ্রতিভভাবে কহিল,—না—না, সে সব কিছু ভাববেন না। বেলা হ'ল, আমি এখানেই খেয়ে যাচ্ছি।

রাজলক্ষ্মী আর কিছু বলিলেন না, তবে বুঝিলেন, সোমনাথ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়েই স্বেচ্ছায় আজিকার আহারের প্রশ্ন তুলিল, কিন্তু সেই সূত্রে সে প্রতিদিনের প্রশ্নটা কৌশলে অতিক্রম করিয়া গেল।

রাজলক্ষ্মীর অস্বস্তি বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। বাধার পর বাধায় বিবাহটা ক্রমাগত পিছাইয়া যাইতেছে। শেষ পর্য্যন্ত একটা বিভ্রাট না বাধিয়া যায়। সোমনাথ অবশ্য মায়ের শেষ ইচ্ছায় অসম্মতি জানাইবে না, তথাপি প্রশ্নটা একবার তুলিয়া রাখিলে ভাল হয়। কিন্তু তাড়াতাড়ি করিলে সোমনাথ সন্দেহ করিবে, ভাবিবে, তাহার আর্থিক বিপর্য্যয়ে সন্দেহ দেখা দিয়াছে। আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিয়া কৌশলে কথাটা পাড়াই কর্ত্তব্য। একদিন কথায় কথায় প্রফেসরকে উদ্দেশ করিয়া রাজলক্ষ্মী কথাটা পাড়িলেন, কহিলেন,—দেখতে দেখতে তিন মাস ত হয়ে গেল। তুমি কিছু ভাবছ?

—বিলক্ষণ! আমি ভাবছি না? ভাবতে গিয়ে আমার ঘুম পর্য্যন্ত নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু টাকা আমার নেই, সোমনাথেরও এখন নেই। কোনও উপায় নেই। প্রফেসর হতাশ ভাবে মাথা নাড়িলেন।

রাজলক্ষ্মী প্রফেসরের দুর্ভাবনায় মৃদু হাসিয়া কহিলেন,

—টাকা আমারও নেই। কিন্তু তাই বলে মেয়েটার বিয়ে হবে না?

—মেয়ের বিয়ে? ওঃ, সুপ্রিয়ার কথা বলছ? কেন? সে ত একরকম ঠিক হয়েই আছে। কেন, সোমনাথ কি এখন অমত করছে? না না, টাকার জন্যে বিয়েয় অমত করা অমানুষের কাম। সোমনাথ কখনই এ কাম করতে পারে না। কেন, কালই আমি সোমনাথের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে ফেলেছি। তুমিই একদিন বলেছিলে যে সব ঠিক হয়ে আছে,

আর এখন যত সব ঝঞ্ঝাট! জান, মেয়ে মানুষ মধ্যে থাকলে একটা না একটা বিভ্রাট বাধবেই!

রাজলক্ষ্মী লজ্জিত হইলেন, কিন্তু স্থির কণ্ঠে কহিলেন,—তোমার কিছু করতে হবে না। কাটার ভার আমার ওপর ছেড়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত থেকো। পরে ঈষৎ হাসিয়া পরিহাস তরলকণ্ঠে কহিলেন,—আচ্ছা, মেয়ে মানুষ মধ্যে না থাকলে বিয়েটা হয় কি করে বলত? বরযাত্রীদের পুরুষ মানুষ মেয়েদের বাদ দিয়ে বিয়ে করছে ভাবতে পারো?

প্রফেসর অপ্রস্তুত ভাবে বলিলেন,—তবে আমায় কি করতে বল?

—তোমায় কিছুই করতে হবে না। তাল মানুষের মতই পরামর্শ করতে এসেছিলুম।

বলিয়া রাজলক্ষ্মী প্রস্থান করিলেন।

আহত অভিমানে সুপ্রিয়া সহজে সহজ হইতে পারিল না। যেখানে, সোমনাথের অন্তরে তাহার, আসন সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সোমনাথ যেন সহসা তাহার সেই আসনকে স্বেচ্ছায় দূরে সরাইয়া দিবার জন্য কঠিন পণ করিয়াছে। কিন্তু কেন? সে কী অপরাধ করিয়াছে? সোমনাথ কেন তাহার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে যেন প্রতিপন্ন করিল? সোমনাথ-সুপ্রিয়ার সম্পর্ক কি কৃত্রিম? ইহার মূলে কি সত্যের স্পর্শ নাই? তাহাদের এতদিনের পরিচয় কি মিথ্যা? যদি মিথ্যা হয়, তবে সোমনাথ সরলভাবে তাহা স্বীকার করিয়া প্রকাশ করে না কেন? সোমনাথ বর্তমানে তাহার নিকট কি প্রত্যাশা করে? এই সকল প্রশ্নের মীমাংসা কে করিবে? সোমনাথের কঠিন মৌনতা ভেদ করিয়া তাহার সমাধান লাভ করা, পাহাড়ের বুক বিদীর্ণ করিয়া বারি-পানের প্রত্যাশার মত! বারংবার মানসিক অশান্তিতে সুপ্রিয়া কিছুটা রুক্ষ হইয়া উঠিল।

সে দিন শঙ্করের কক্ষে প্রবেশ করিতেই শঙ্কর সোমনাথকে অনুযোগ করিয়া কহিল,—সোমনাথ! আমি বোধ হয় ক্রমশই সুস্থ হয়ে উঠছি, কিন্তু ঠিক সেই অনুপাতেই তোমাদের সহানুভূতি হারাচ্ছি!

সোমনাথ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—শঙ্কর! আমি এখনও মনের সুস্থতা লাভ করতে পারি নি, তাই তোমার অনুযোগটার প্রতিবাদ করার জোর পাচ্ছি না।

—সোমনাথ! হিমাচলের চূড়া খসলে পৃথিবী আতঙ্কে বিস্মিত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে, তাকে সহানুভূতি দেখায় না! তাই বলে, পৃথিবীর আর্তনাদে কঠিন হিমাচলের সহানুভূতির অভাব হয় কি? তার সহানুভূতিতে শৈলচূড়ার কঠিন বরফ গলে জল হয়ে ধরণীর বুকে নেমে আসে।

সোমনাথ বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—ভুল বলছ শঙ্কর! হিমাচল পৃথিবী হতে স্বতন্ত্র নয়, সে সর্বদা তার বুকেই সংলগ্ন রয়েছে।

শঙ্কর প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া গেল। স্বল্পভাষিণী সুপ্রিয়া আলোচনায় যোগদান করিল না। সোমনাথ উঠিয়া গেল। ফিরিবার পথে রাজলক্ষ্মী তাহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

একদিন কি ভাবিয়া সুপ্রিয়া সোমনাথকে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল,—আচ্ছা! শর্মিষ্ঠার কোন সংবাদ জানো? আজ ক'দিন থেকে কেন জানি না, বার বার তার কথাই মনে পড়ছে।

—জানি! সে এখন বম্বেতে নার্সের কাজ করছে।

বিস্মিতকণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,—শর্মিষ্ঠা নার্স? তুমি কি করে জানলে?

—বাবার শেষ সেবার ভার সেই নিয়েছিল।

সহসা সুপ্রিয়ার মুখখানা কঠিন বিবর্ণ হইয়া উঠিল। অসাভোক্তি হইলেও সে একটু জোরের সহিতই বলিয়া ফেলিল,—ওঃ, তাই! কথাটা সোমনাথের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাহাকেও চমকিত করিয়া তুলিল।

সে কহিল,—কি ভাই ! সুপ্রিয়া তখন প্রায় কক্ষের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। সোমনাথ উচ্চকণ্ঠে ডাকিল, সুপ্রিয়া ! যেয়ো না, শুনে যাও !

—সুপ্রিয়া শুনিয়াও শুনিল না। সে ততক্ষণে প্রায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

সোমনাথ মনে মনে হাসিল, কহিল, হায় নারী ! তোমাদের জীবনে ঈর্ষা কি সত্যই অনতিক্রম্য ? শিক্ষা আর সংস্কৃতি কি তাহার কঠিন পাত্রে আঘাত খাইয়া চূর্ণ হইয়া যায় ?

সোমনাথ সুপ্রিয়া পরস্পর নিকট সান্নিধ্যে থাকিলেও কোথায় যেন পরস্পর হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছে। এই দূরত্ব তাহারা অন্তর দিয়া অনুভব করিতেছে। উভয়েই ইহাকে জয় করিয়া আবার পূর্ব্বেকার সহজ জীবনে ফিরিয়া আসিতে চাহে, কিন্তু হায়, ব্যবধান যেন ক্রমশই বিস্তৃত হইয়া উঠিতেছে। সুপ্রিয়া বার বার নিজেকে ধিক্কার দিয়া বলিয়াছে শর্মিষ্ঠা সম্পর্কে তাহার ধারণা ভুল। সোমনাথকে সন্দেহ করার মত অন্যায় আর কিছুই হইতে পারেনা, তথাপি ক্ষমা চাহিতে গিয়াও আজ পর্যন্ত সে ক্ষমা চাহিতে পারে নাই, এমনকি শর্মিষ্ঠার প্রসঙ্গও আর উত্থাপন করিতে পারে নাই। সোমনাথ ভাবিল, সুপ্রিয়া যদি আহতই হইয়া থাকে, তবে তাহারই অগ্রসর হইয়া তাহাকে সান্ত্বনা দেওয়া কর্তব্য। সুপ্রিয়া তাহাকে ভুল বুঝিয়াছে, কিন্তু এই ভুল বুঝিবার অবসর কি সে দেয় নাই ? তাহার পক্ষে শর্মিষ্ঠার প্রসঙ্গ ত পূর্ব্বেই উত্থাপন করিয়া সকল ঘটনা সরল ভাবে বিবৃত করা উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া, সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন না করিয়া অপরাধীর ন্যায় যেন সে অর্দ্ধসত্য প্রকাশ করিয়া সুপ্রিয়াকে গোপন করিতে চাহিয়াছে। অবশ্য চাহিয়াছে বলিলেও সত্যের সম্মান দেওয়া হয় না, কিন্তু ঘটনাচক্রে ব্যাপারটা বর্তমানে এইরূপই দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থি ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। এখন তাহাকেই অগ্রসর হইয়া ইহার মোচন পর্ব্ব সমাধা করিতে হইবে। কিন্তু আজকাল করিয়া প্রসঙ্গটা আজও উত্থাপন করা ঘটিয়া উঠে নাই।

সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সহসা একটা ঝড়ের বেগে সমগ্র বাড়ীখানাই কাঁপিয়া উঠিল। কালবৈশাখী সুরু হইয়াছে। এখনই হয়ত প্রবল বর্ষণ দেখা দিবে, কিম্বা হয়ত শুধু ঝড়েই ইহার সমাপ্তি ঘটিবে। নিবিড় অন্ধকার করিয়া ঝড়টা যেন একটা প্রকাণ্ড দৈত্যের মত ঝাপটা মারিল। জানালা দরজা গুলা সেই ঝাপটায় যেন স্থানচ্যুত হইতে হইতে দৈবক্রমেই বাঁচিয়া গেল। সুপ্রিয়া ঝড়ের বেগেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া দরজা জানালা গুলা বন্ধ করিয়া আলোটা জ্বালিয়া দিয়া বাহির হইয়া গেল।

শঙ্কর শুইয়া শুইয়া সুপ্রিয়ার এই আগমন নির্গমন লক্ষ্য করিল। বাহিরের উদ্দাম প্রকৃতির সঙ্গে উহার অন্তরের প্রকৃতির যেন কোথায় একটা গভীর ঐক্য রহিয়া গিয়াছে।

সে ভাবিল, তাহার আপন অমাচ্ছন্ন অন্তরাকাশের এক কোণে ঝলকিয়া উঠিয়াছে ক্ষণিকের ক্ষণপ্রভা! সে ক্ষণপ্রভা সুপ্রিয়া! উহার এক একটি সুতীব্র ঝলকে সে দিশাহারা হইয়া যাইতেছে!

সে আশ্চর্য্য হয় তাহার আপন মনের সংযম স্মরণ করিয়া। কেমন করিয়া সে এত দিন এভাবে আত্মসংবরণ করিয়া আছে? কামনার শেষ কিনারায় দাঁড়াইয়া সর্ব্বনাশের অতলস্পর্শ প্রপাতের পানে তাকাইয়াই বুঝি ভয়ে সে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

চিন্তায় বাধা পড়িল। সুপ্রিয়া পুনরায় প্রবেশ করিল। উত্তেজনায় পরিশ্রমে তাহার দীর্ঘ ঘন-শ্বাস বাতাসকে ভারী করিয়া তুলিতেছে!

শঙ্কর দেখিতেছে! সমগ্র ইন্দ্রিয় দ্বারা দেখিতেছে! দেখিতেছে সুপ্রিয়া ক্ষীণ কটিদেহা। স্বাস্থ্যশ্রীতে অনবদ্যাঙ্গী। শ্রান্ত সুপ্রিয়ার ঘন-শ্বাসের সঙ্গে তাহার পীবরোন্নত উরস তালে তালে নৃত্য করিতেছে। চিত্তের দৃঢ়তা কম্পনকারী হৃদয়ের হিন্দোল দোলায় হিল্লোলিত এ নৃত্য মুনিজনেরও মতিভ্রম ঘটায়। শঙ্কর ত সামান্য মানুষ! তাহার কামনার শিরা শিরা উত্তেজনায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এ উত্তাপে বুঝি সেই শিরাগুচ্ছ এখনই

খান খান হইয়া ভাঙিয়া পড়িবে, আর সেই পাত্রস্থিত রঙীন দ্রাক্ষাসুধা উভয়কে ডুবাইয়া দিয়া বর্তমান ভবিষ্যৎ সব একাকার করিয়া দিবে।

বাহিরে বিকট শব্দে কোথায় একটা বজ্রপাত হইল। শঙ্কর চক্ষু মেলিল। সুপ্রিয়া সত্বরে দরজাটা বন্ধ করিয়া দিয়া কহিল,—ওঃ, কী ভয়ানক দুর্যোগ নেমেছে! সব ঘরের জানালা ক'টা দিতে পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহার উত্তেজনায় আন্দোলিত দেহ এখনও স্বাভাবিক হইয়া আসে নাই।

তেমনই মুদিত চক্ষে শঙ্কর উত্তর করিল,—বাইরের দুর্যোগটা যাতে ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে তার সুষ্ঠু ব্যবস্থাটা ত শেষ করে এলে সুপ্রিয়া! তবুও এত ভয়?

—দুর্যোগ যখন সত্যিই প্রবল হয়, তখন সে ভেতরের বাধা মানে না শঙ্করদা! তার প্রকোপে পড়ে সব বাধা বন্ধ চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায়। মহাকালের সেই রুদ্ররূপ আমরা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু সহ্য করতে পারি না।

প্রবল বর্ষণ সুরু হইল। শঙ্কর ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল,—দাও দাও, খুলে দাও সুপ্রিয়া, সব জানালাগুলো খুলে দাও। ওর দাপাদাপিটা একেবারে ঘরের মধ্যে এসে পড়ুক; কতকাল, যেন কতকাল ওদের রুদ্ররূপ দেখিনি। নিভিয়ে দাও আলো। নিঃশেষে ওর উদ্দাম উন্মত্ততাকে অবাধ করে দাও।

গম্ভীর কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,—কাব্য-গুঞ্জনটা গৃহ-কোণেই ভালো। মহাকাব্য রচনা করতে গিয়ে শেষে মহাকালের কবলে আত্মসমর্পণ করাটা সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচয় নয়।

অধীর কণ্ঠে শঙ্কর কহিল,—আঃ, থামো সুপ্রিয়া! লোকদের বাঁধা বুলিগুলো আর যেখানেই আবৃত্তি করো আমাকে অন্ততঃ তা'থেকে রক্ষা কর।

—সহসা সমীদার ওপর এত 'জেলাস' হয়ে পড়লে কেন ?

—সমীদা, সমীদা আর সমীদা ! কিন্তু লক্ষ্য করেছ কি যে তোমার সমীরদার লক্ষ্য আর তোমার ওপর নেই ! বর্ত্তমান মুহূর্তে সমীদার চক্ষে তুমি আর তেমনটি নেই !

—দেখ ছি, আমার চেয়ে সমীদাকে লক্ষ্য করছ তুমিই বেশী। কিন্তু মনে রেখো এ অনধিকার চর্চ্চা !

—জানি, যত অহঙ্কারই করো, তবু একথা জোরের সঙ্গে বলব তোমার অধিকারটাও বেশ সুপ্রতিষ্ঠিত নয়।

—শঙ্করদা ! আজ তোমার কি হয়েছে বলত ? তুমি কি বলতে চাইছ ?

—বলতে অনেক কিছুই চাইছি, কিন্তু ঠিকমত গুছিয়ে বলতে পারছি কই ? যাক সে কথা। সুপ্রিয়া এখন একটা গল্প শুনবে ? গল্পের নামে সুপ্রিয়া সোজা হইয়া বসিল। গল্প শুনিতে সে ভালবাসে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গত্যাগে কিম্বা গৃহত্যাগে সে মনে মনে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। তাই গল্পের সম্ভাবনায় সে যেন অব্যাহতি পাইল। কারণ, সহসা গৃহত্যাগে শঙ্কর ক্ষুণ্ণ হইবে। অকারণ অসুস্থ মানুষকে ক্ষুণ্ণ করা অনুচিত। শঙ্কর সুরু করিল,—'অনেক দিন আগে একটা বিলেতী ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। ঘটনাটা মনে থাকলেও ছবিটার নাম বা পাত্র-পাত্রীর নাম কিছুই মনে নেই। নামগুলো না হয় বাদ দিয়েই বললুম।

একদা এক অসাধারণ দস্যুর অত্যাচারে সারা দেশ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্ল। শেষে সে সন্ত্রাস এমন হয়ে উঠ্ল যে তার নাম শুনলেই অতি বড় সাহসী বীরের বুকটাও ভয়ে কেঁপে উঠত। গভর্ণমেণ্ট শত চেষ্টাতেও সেই দস্যুকে ধরতে পারলেন না, বা তার কার্য্যকলাপও বন্ধ করতে পারলেন না। ফলে, সমগ্র রাজ্যে বিভীষিকার মত তার অবাধ বিচরণ দেশের লোককে দিশাহারা করে তুলল।

একদিন এক ধনীর গৃহে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে সেই দস্যুর আবির্ভাব ঘটল। দস্যু একা এবং দেখে তাকে নিরস্ত্র বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু দেহের গোপন অংশে সে অস্ত্র গোপন রেখেই এসেছিল। খুব উঁচু প্রাচীরের উপর উঠে যখন সে লাফিয়ে পড়বে ভাবছিল তখন দেখল, একটি অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে ফুলবাগানে দাঁড়িয়ে ফুলের শোভা দেখছে। অস্তায়মান সূর্যের শেষরশ্মি পড়ে মেয়েটির মুখখানিকে অপূর্ব করে তুলেছে। ফুলের পরিবেশের মাঝে রশ্মিস্নাত মেয়েটিকে তার দেবী বলে ভ্রম হল। মেয়েটিকে তার আবির্ভাবে আতঙ্কিত করতে কোথায় যেন সে একটা দুর্বলতা অনুভব করল। ভাবল, সে যেমন নিঃশব্দে এসেছে তেমনই নিঃশব্দেই ফিরে যায়! কিন্তু তা সে পারলো না। সে মার্জারের লঘুগতি দিয়ে একটা গাছের ডাল ধরে অতি সন্তর্পণে তার পিছনে নেমে পড়ল। মেয়েটি কিছুই জানতে পারল না। দস্যু তার প্রকাণ্ড 'জোব্বা' দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে যতদূর সম্ভব মিহি মিষ্টি গলায় বলে উঠল,

—অক্ষম নাচারকে কিছু ভিক্ষে দেবে ?

মেয়েটি চমকে উঠে পিছন ফিরে তার পানে তাকিয়ে বলল,

—কি হয়েছে তোমার ? কি করে তুমি এখানে এলে ?

তার স্বরে যেন কিঙ্কিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। দস্যু তেমনই মিষ্টি কাতর কণ্ঠে বলল,—দুটি হাত নেই ! আমি অক্ষম নাচার।

দুটি হাত নেই ! মেয়েটি করুণায় গলে গেল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাকে শত প্রশ্নে পাগল করে তুলল। সত্যিই মেয়েটির মিষ্টি স্বরের আহ্বানে দস্যু একদিনে যেন স্বর্গরাজ্যে পৌঁছে আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠল। নিজেকে সংযত রেখে সে জানালো সংসারে তার কেউ নেই, দুনিয়ার বুকে স্বজনহীন বন্ধুহীন সে এক নিঃস্ব পথিক। মেয়েটি শুধু বলল,—আহা !

দস্যুকে সে চা রুটি দিল। দস্যু প্রতিদানে একটা ছোট্ট গল্প বলে তাকে খুশী করল। মেয়েটি যাবার সময় বলল,—আবার এসো।

দস্যু প্রতিদিন আসে। সে মেয়েটিকে গল্প শোনায়, আর বিনিময়ে চা-রুটি খেয়ে চলে যায়। গল্পের নেশায় মেয়েটি দিন দিন যেন তার খুবই বশ হয়ে পড়ল। এখন সে তার পাশে এসে বসে। এত কাছে বসে যে দস্যু তার প্রতিটি নিঃশ্বাস, বুকের প্রতিটি স্পন্দন শুনতে পায়।

এমনই দিনের পর দিন মাসের পর মাস চলে যায়। দস্যুও নেশার ঘোরে আসে আর যায়। এমনই ভাবে অনেকদিন যাবার পর, একদিন সাহস করে দস্যু মেয়েটিকে বলল—তুমি আমায় ভালবাস ?

মেয়েটি তার ডাগর চোখ মেলে বলল,—তোমায় ভাল না বেসে থাকা যায় ? আহা, তোমার যে দুটো হাতই নেই !

দস্যু ফিরে এসে সে রাতে আর ঘুমোতে পারল না। তার কানের কাছে কেবল একটি কথাই বার বার ঘুরে ফিরে পেয়ালায় ভাসা রঙীন মদের মত মনোরম হয়ে নাচতে লাগল,—তোমায় ভাল না বেসে থাকা যায় ! আহা, তোমার যে দুটো হাতই নেই।

শেষে দস্যু শেষরাত্রে সঙ্কল্প স্থির করে ফেলল। পরদিন প্রাতে শহরের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রচিকিৎসা বিশারদের নিকট গিয়ে তার নির্জন প্রকোষ্ঠে দেখা করতে চাইল এবং প্রথমেই পঞ্চাশ পাউণ্ড টেবিলে রেখে জানালো তার বিশেষ গোপন পরামর্শ আছে। সম্ভ্রান্ত খদ্দের দেখে ডাক্তার তা'কে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে গেলেন। দস্যু প্রথমে আত্ম-পরিচয় দিতেই ডাক্তার বিস্ফারিত নেত্রে চেয়ারে বসে পড়লেন। গলা দিয়ে একটা অব্যক্ত স্বর বেরুতে গিয়ে মাঝ পথে আটকে গেল। এর পর অনেক কষ্টে শেষ পর্যন্ত সে ডাক্তারকে বোঝাল যে তার হাত দুটি 'এ্যামপুট' করে দিতে হবে। ডাক্তার প্রথমে ভেবেই স্থির করে উঠতে পারলেন না যে এটা সত্যি না পরিহাস। তার বলিষ্ঠ সুন্দর দেহটার পানে বার বার দৃষ্টি বুলিয়ে ডাক্তার হতবুদ্ধি হয়ে বসেই রইলেন।

শেষ পর্যন্ত অনেক ভেবে দস্যু স্থির করলো যে ডাক্তার তার একেবারে পরিচয় গোপন রেখে তার হাত দুটি কেটে দেবেন এবং বিনিময়ে দস্যু তাঁকে হাজার পাউণ্ড দক্ষিণা দেবে। যদি ডাক্তার চুক্তি ভঙ্গ করেন, তবে সপরিবারে তাঁকে সংসারের কাছে বিদায় নিতে হবে। নিরুপায় ডাক্তার মত দিলেন।

এর পর নানা কারণে হাসপাতালে দস্যুর ছ'মাস কেটে গেল। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন আরও ছ'মাস সমুদ্রতীরে বাস করবার পর সে সাধারণ ভাবে মেলামেশা করতে পারে, কারণ তখন এটা যে কাটার ফল তা সহজে কেউ বুঝতে পারবে না, ভাববে জন্মাবধিই সে হস্তহীন!

এক বৎসর পরে দস্যু ফিরে আসছে তার আনন্দের স্বর্গে! সে আসছে আজ আর ছলনার আশ্রয় নিয়ে নয়, আজ সে সত্যই অক্ষম নাচার! দেহের প্রকাশে আজ আর সে সঙ্কুচিত নয়, ভীত নয়!

হস্তহীন দস্যু অনায়াসেই প্রাচীরে উঠল, ভাবল, সহসা মেয়েটির সামনে লাফিয়ে পড়ে তাকে চমকে দেবে। কিন্তু ও কি? ওর পাশে ও কে?

ওই সুন্দর তরুণ আবেগে বিহ্বল হয়ে রয়েছে! ওরা পরস্পরের প্রতি প্রেম নিবেদন করছে! একটা অসহ তীব্র ব্যথায় দস্যু আর্তনাদ করে উঠল। এবার দু'জনেই চমকে সেই দিকে তাকিয়ে দেখল। মেয়েটি দেখল, সেই লোকটা! সে ছুটে এসে তাকে অভ্যর্থনা করল, বলল,

—তুমি এসেছ! কতদিন, কতদিন তুমি আস নি, গান গাও নি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? স্বরে সেই মধুমাখা করুণাস্রোত!

দস্যু নামল না। একইভাবে স্থির দৃষ্টিতে সে দুজনার পানে তাকিয়ে দেখতে লাগল। মেয়েটি ছেলেটিকে ডেকে বলল,—জানো, জোকারের দুটি হাতই নেই! আহা বেচারী! ও কিন্তু খুব ভালো গান করতে পারে। ওকে লজ্জা করতে হবে না এসো। ও ভারী ভালো লোক।

তারপর দস্যুকে উদ্দেশ করে ব্রীড়ানম্র কণ্ঠে বলল,—আসছে মাসে আমাদের বিয়ে হবে। তুমি নিশ্চয়ই খুশী হবে। তুমি এলো।

এতক্ষণে দস্যু কথা বলল,

—খুশী! এর চেয়ে বেশী খুশী হবার আর কি আছে? আমি খুশী! সত্যিই খুশী! এত খুশী জীবনে আর কখনও হইনি। বলতে বলতে দস্যু হা হা করে হেসে উঠল। হা-হা-হা। দস্যু হেসেই চলেছে। হাসতে হাসতে হাসতে হাসতে তার চোখ ফেটে ধারার পর অশ্রুর ধারা বয়ে চলল! তখনও দস্যু হেসেই চলেছে হা-হা-হা-হা-হা-হা! দুজনেই ভীত হয়ে একসঙ্গে চীৎকার করে উঠলো,

—থামাও, থামাও তোমার হাসি।

তবুও দস্যু হেসেই চলেছে—হা-হা-হা—হা-হা-হা! হাসতে হাসতে এক সময় সে অকস্মাৎ পাঁচিল থেকে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল।'

শঙ্কর থামিল। বাহিরে ঝড়ের বেগ কমিয়া আসিয়াছে, কিন্তু বর্ষণের বেগ তেমনই প্রবল রহিয়াছে। সুপ্রিয়া তন্ময় হইয়া শুনিতেছিল, সে আগ্রহভরা কণ্ঠে কহিল,—তারপর?

শঙ্কর উত্তর না দিয়া ইঙ্গিতে জানাইল তাহার পর আর কিছু নাই।

সজল বর্ষায় সুপ্রিয়া সমবেদনায় ভারাতুর হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ কেহই কথা কহিল না।

পরে সুপ্রিয়াই প্রথম স্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া কহিল,

—তোমার গল্পের মর্ম হয়ত উপলব্ধি করতে পেরেছি, কিন্তু উপলব্ধি করতে পারছি না তোমার সত্যিকার মর্মকথা! দস্যুর ভূমিকায় অভিনয় সুরু হয়েছে কতদিন থেকে?

গভীর আবেগে শঙ্কর বলিতে লাগিল,

—সুপ্রিয়া! আমি সাধারণ মানুষ! কামনা বাসনায় ঘেরা মাটির বুকে একেবারে ধুলায় লুন্ঠিত মানুষ! আমি দস্যুর অভিনয়ও করতে

চাই না, দেবতার অভিনয়ও করতে চাই না। আমি চাই সহজ মানুষের মতই হাসি-কান্নার খেলা এই পৃথিবীর বুকে বিচরণ করতে।

সুপ্রিয়া অপেক্ষাকৃত কঠিন কণ্ঠে কহিল,—তার বাধাটা কোথায়?

—বাধা যে কোথায়, তা যে আজও মুখ ফুটে বলতে পারছি না। আমার দিকে একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখ সুপ্রিয়া! কী যন্ত্রণায় না আমি দিনের পর দিন কাটাচ্ছি। আজ বলছি, আমি অনেক দিন পূর্বেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছি। শুধু এই স্বর্গরাজ্য হতে বিদায়ের ভয়ে আমি এই দীর্ঘকাল নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক রোগীর ভূমিকা অভিনয় করে এসেছি।

বলিয়াই সে সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। সুপ্রিয়া তাহার সেই সহজ বসিবার ভঙ্গি দেখিয়া উৎফুল্ল বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল,—কী আশ্চর্য্য! তুমি সম্পূর্ণ সেরে গেছ, তবুও এভাবে শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণা ভোগ করছো? তুমি আচ্ছা পাগল ত?

—সত্যিই আমি পাগল সুপ্রিয়া! কিন্তু একবার ভেবে দেখ, তুমিই আমায় পাগল করেছ। আমি অনেক ভেবেছি, সেই ভাবনার আদি নেই, অন্ত নেই! আজ সেই ভাবনা উজাড় করে দিয়ে আমি মুক্ত হলুম। সোমনাথ দেবতা। সেই দেবতা থাক তার আপন স্বর্গে। আমি তাকে ঈর্ষা করি না। কিন্তু তুমি কেন তার সঙ্গে দেবীর ভূমিকা অভিনয় করতে গিয়ে অকালে ঝরে পড়বে? সুপ্রিয়া, ভুল কোরো না, তুমিও মাটির মানবী—আর আমিও মাটির মানব! আমরা উভয়ে উভয়কে বুঝব। আমরা সুখী হব, শান্তি পাব। না-না, সুপ্রিয়া! তুমি অমন করে প্রাণহীন দৃষ্টি দিয়ে আমায় মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিও না।

বলিতে বলিতে উত্তেজনায় শঙ্কর সহসা সুপ্রিয়ার একটা হাত ধরিয়া ঈষৎ আকর্ষণ করিল। সেই অল্প আকর্ষণেই সুপ্রিয়ার শিথিল অপ্রস্তুত দেহ একেবারে শঙ্করের বুকের উপর গিয়া পড়িল। এদিকে সেই মুহূর্তে

সশব্দে দ্বার খুলিয়া সোমনাথ সুপ্রিয়াকে তদবস্থায় শঙ্করের বক্ষলগ্ন দেখিল। সোমনাথ এক মুহূর্ত কঠিন স্থির দৃষ্টি মেলিয়া উভয়ের পানে তাকাইল। শঙ্কর পাশ ফিরিয়া বাহু দ্বারা চক্ষু আবৃত করিল। ভীত, আর্ত, বিস্ফারিত-নেত্রে সুপ্রিয়া মুখব্যাদন করিয়া কী যেন একটা বলিতে চেষ্টা করিল। হয়ত উহা তাহার অন্তরের আর্তনাদ! কিন্তু সে আর্তনাদ বায়ু তরঙ্গে আঘাত করিতে সমর্থ হইল না। একটা শব্দও উচ্চারিত হইল না। তদবস্থাতেই সে শুধু দেখিল সোমনাথের চক্ষে একই সঙ্গে কী নিদারুণ বিস্ময় ও ঘৃণা! সেই ঘৃণা যেন জলন্ত অঙ্গারের ন্যায় সুপ্রিয়ার সর্বদেহ পুড়াইয়া দিতে লাগিল। সোমনাথ নিঃশব্দে পশ্চাত ফিরিল।

বাহিরে তখনও অবিশ্রাম বর্ষণ চলিয়াছে।

সোমনাথ চলিয়া যাইতেই সুপ্রিয়া যেন চৈতন্য ফিরিয়া পাইল। সবলে নিজেকে মুক্ত করিয়া সে-ও কক্ষ ত্যাগ করিল। আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া এইবার সে তাহার অশ্রুকে মুক্ত করিয়া দিয়া আর্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—সর্বনাশের শেষ সীমান্তে ঠেলিয়া দিয়া একি নিষ্ঠুর খেলা খেলিলে ঠাকুর!

রাজলক্ষ্মী এ সকল ঘটনার কিছুই জানিতে পারিলেন না। তিনি তখন নিবিষ্ট মনে ঠাকুর ঘরে বসিয়া জপ করিতেছেন।

পরদিন প্রাতে শুচিস্নাত সুপ্রিয়া শঙ্করের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, শঙ্কর শয্যায় বসিয়া আছে। গত সন্ধ্যার সকল ঘটনা মন হইতে সবলে সরাইয়া দিয়া সুপ্রিয়া সহজ কণ্ঠেই কহিল,—এই যে, একেবারে উঠে বসেছ। আশা করি ভালই আছ।

শঙ্কর কিন্তু কেমন এক অপ্রতিভ কণ্ঠে উত্তর করিল,—হাঁ, ভালই ত আছি। পরে বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল,—সুপ্রিয়া! আজই আমি চলে যাচ্ছি।

—আজই ? কিন্তু কেন ?

—কেন তুমি জান। যাবার আগে তোমার ক্ষমা চাইছি।

—কিসের ক্ষমা ?

—কাল সন্ধ্যার ঘটনাটাকে তুমি বিস্মৃতির গর্ভে ঢেকে রাখতে চাইছ। আমার পক্ষে কিন্তু তা সম্ভব নয়।

সহসা সুপ্রিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—শঙ্করদা! সর্বদা বিচারকের আসনে বসে যারা অহঙ্কারে অন্ধ হয়ে চলে, যারা ভেবে দেখে না তাদের সেই চলার চাপে কত নিরীহের অন্তিম শ্বাস ঘনিয়ে এল তারাই শুধু পূজো পাবে, আর যারা ভিক্ষার পাত্র হাতে করুণার আবেদন জানাল তারাই হবে উপেক্ষিত ?

শঙ্কর গাঢ় স্বরে ডাকিল,—সুপ্রিয়া !

সুপ্রিয়া সহজ কণ্ঠেই কহিল,—শঙ্করদা! আজ যদি তুমি সহসা চলে যাও তাতে বাড়ীর সন্দেহ বাড়বে বই কমবে না। তোমার অভিনয়টা সম্পূর্ণ করতে অন্ততঃ আরও এক সপ্তাহ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে সুস্থ প্রমাণ কর, তারপর চলে যেয়ো।

—কিন্তু আশা দিয়ে তুমি যেন আবার নিরাশায় অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছ।

—তার কারণ, মিথ্যের জাল বুনে বুনে তুমি সত্যকে হারিয়ে ফেলেছ।

সুপ্রিয়া চলিয়া গেল। শঙ্কর বসিয়া বসিয়া তাহার কথাগুলা বিশ্লেষণের চেষ্টা করিতে লাগিল। সুপ্রিয়ার হৃদয়ে আজ সে অবাঞ্ছিত অতিথি নহে তাহা পরোক্ষে সে স্বীকার করিয়াছে, কিন্তু সেই সঙ্গেই সে তাহাকে মিথ্যা ছলনা সম্পর্কে সজাগ করিতে চাহিয়াছে। রহস্যময়ী সুপ্রিয়া! ধরা দিয়াও ধরা দেয় না। নাঃ, আশা তাহার আছে। অধীর হইলে চলিবে না। সোমনাথ নিশ্চয়ই ফিরিবে না। তাহার অপরাধীর অভিনয়টা ভালই হইয়াছে। একাকী সুপ্রিয়া কতদিন আর তাহাকে দূরে

দূরে রা

রাখিয়া অবাস্তব সোমনাথের স্মৃতি লইয়া কাটাইবে? দেখা যাক, তাহার কৌশল কী পরিণতি লাভ করে।

সুপ্রিয়া এই মাত্র উত্তেজনার বশে শঙ্করের নিকট যাহা বলিয়া আসিল তাহার অর্থ সম্বন্ধে সে অনভিজ্ঞা নহে। সে একবার ভাবিল,—শঙ্করকে মিথ্যা আশায় আশ্বস্ত করা কি উচিত হইল? সুপ্রিয়া সোমনাথের কঠিন আঘাতে আহত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইলেও সেই ভূমিকেই আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইতে চেষ্টা করিল। সে ভাবিল, সত্যকার আঘাত হানিয়াছে শঙ্করই!

আসলে গত সন্ধ্যার শঙ্করের সেই আকুল আবেদন, সেই সুস্থ আকর্ষণ, সেই ক্ষণ-মুহূর্ত, তাহার কুমারী জীবনে এক অভাবিত প্রতিক্রিয়া সৃজন করিয়াছিল। প্রেম-বিহ্বল পুরুষের প্রথম আকর্ষণের মাদকতা সে এত শীঘ্র অতিক্রম করিতে পারে নাই। ফলে, কতকটা এই প্রতিক্রিয়ার উত্তেজনায় কতকটা সোমনাথের প্রতি অত্যধিক আক্রোশে শঙ্করকে সে আশ্বাস দিয়া ফেলিল।

শঙ্কর সুযোগ ত্যাগ করিল না। সপ্তাহান্তে সুস্থ মানুষের মতই সে এতদিনের সুখস্বর্গ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু দূরে গেল না, শহরের কোন বিশিষ্ট হোটেলে অবস্থান করিয়া এ বাড়ীর যাতায়াতের পথটা উন্মুক্ত রাখিল।

সোমনাথ শঙ্করের বক্ষলগ্ন সুপ্রিয়াকে দেখিয়া গৃহমধ্যেই বজ্রপাত অনুভব করিল। প্রথমটা বিস্ময়ের মাত্রাধিক্যে এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটা সে ঠিকমত উপলব্ধি করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার জাগ্রত চেতনার বাস্তব সাক্ষ্যে সে মুহূর্তে সচেতন হইয়া উঠিল। তাহার পদনখ হইতে মস্তকোপরি কেশের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যেন একটা বৈদ্যুতিক শিহরণ খেলিয়া গেল! সোমনাথ যেন বজ্রাহত বনস্পতি!

সোমনাথ ফিরিল। কিন্তু তাহার চৈতন্য-সত্ত্বা সহসা ফিরিয়া আসিল না, তাহা যেন সহসা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেমন একটা আচ্ছন্নের মত সারাটা পথ সেই প্রবল বর্ষণের মধ্য দিয়া সে চলিয়া আসিল। সমগ্র চিন্তাটা জমাট বাঁধিয়া তাহার মস্তিষ্কে যেন একটা অগ্নি-গোলকের সৃষ্টি করিল। সেই অগ্নি-গোলকের প্রচণ্ড দাপাদাপিতে তাহার বাহ্য অনুভূতিটা লোপ পাইয়া গেল। সে যে বর্ষাঘাত হইয়া অস্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হইতেছে তাহা তাহার খেয়ালই ছিল না। একটি মাত্র চিন্তা যাহা তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া চলিতেছে তাহা হইতেছে, দূরে, দূরে, বহুদূরে চল পথিক! যেখানে ডুবিয়া শঙ্করের স্মৃতিটাও অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বাড়ী আসিয়া অর্থ বলিতে যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল তাহাই লইয়া সে সোজা হাওড়া ষ্টেশনে পৌছিল। টিকেট ঘরে একজন আগ্রার টিকেট কিনিতেছে। সোমনাথও আগ্রার টিকেট কিনিয়া তাহাকেই অনুসরণ করিয়া ট্রেণে চাপিয়া বসিল।

কিছুক্ষণ পরে তাহার খেয়াল হইল বস্ত্রাদি পরিবর্তন না করিয়া সিক্ত বসনেই সে চলিয়া আসিয়াছে। এবার সে সামান্য শৈত্য অনুভব করিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পুনরায় বাড়িতেছে! অনন্যোপায় অবস্থায় জানালাটা ভেজাইয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এতক্ষণে সে সমস্ত ঘটনাটা পর্য্যালোচনা করিবার মত মানসিক সমতা লাভ করিল। ভাবিল, ভালই হইয়াছে। যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহাই ঘটিয়াছে। ছলনায় ভুলিয়া সে একটা প্রকাণ্ড মোহের মাঝে নিজেকে হারাইতে বসিয়াছিল। মানুষের জীবনে নারীর প্রেম অপরিহার্য্য নহে, কিন্তু মোহ বশতঃ সে তাহাই মনে করিয়াছিল। বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনের সাথী জগতে দুর্লভ। সেই দুর্লভকে সুলভ ভাবিতে গিয়া সে সমুচিত শিক্ষা পাইয়াছে। ভগবান যদি তাহাকে সময়ে সতর্ক করিয়া দিলেন, তবে আর যেন এই চোরাবালিতে চলিবার দুর্মতি তাহার না হয়।

এই নারী চরিত্র! একজনকে সে আশা দেয়, আশ্বাস দেয়, অপরজনকে সে আশ্রয় করে। সেক্সপীয়র হ্যামলেটকে দিয়া সত্যই বলাইয়াছেন, 'ফ্রেলটি দাই নেম ইজ ওম্যান'! কিন্তু মহাকবি সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে হ্যামলেটকে ভুলের বালুচরে নামাইয়াছেন, আর তাহার জীবনে সেই চোরাবালি সত্য হইয়া তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতেছে। কিন্তু কেন? কী ইহার প্রয়োজন ছিল? কিম্বা বিশ্বাস অবিশ্বাস, প্রয়োজন অপ্রয়োজনের প্রশ্নই হয় ত এখানে অবান্তর। হয়ত ইহা লাস্যময়ী নারী মনের স্বাভাবিক ক্রীড়াচাতুর্য! স্বভাবকে কে কবে অতিক্রম করিতে সক্ষম হইয়াছে!

কবে যেন সে পড়িয়াছিল যে, দুইটা সিংহ যখন পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করে তখন সিংহীটা অত্যন্ত নিশ্চিন্তভাবে দূরে বসিয়া তাহাদের যুদ্ধফল অপেক্ষা করে; পরে সে বিজয়ী সিংহকে অনুসরণ করিয়া চলিয়া যায়, হতমান বিজিত সিংহটাকে ফিরিয়াও তাকাইয়া দেখে না।

মানুষের মনেও এই পশু-প্রবৃত্তি অল্প-বিস্তর রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু সে ইহাকে পোষাক পরিচ্ছদ পরাইয়া, সাজাইয়া-গুছাইয়া সংসারের শোভা বর্ধন করিতেছে। পশু-জগতে সিংহীটা থাকে একান্তই নিরপেক্ষ, কিন্তু মানব জগতে নারী একের অগোচরে অপরকে পক্ষপাতিত্ব দেখায়। তাহার সোহাগের আতিশয্যে দুইটা পুরুষই বিগলিত হৃদয়ে তাহাদের প্রেমাস্পদাকে বেষ্টন করতে থাকে। একদিন যখন তাহার ক্রীড়া-চাতুর্য সহসা প্রকাশ হইয়া পড়ে, তখন নারী একের বক্ষ-লগ্ন হইয়া অন্যের পানে নির্লজ্জ অনুকম্পার হাসি হাসে।

নাঃ, সে শঙ্কর-সুপ্রিয়ার কথা ভাবিবে না। আর ভাবা উচিত হইবে না। কিন্তু ভাবিবে না বলিলেও ভাবনা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে চাহিল না। শঙ্করের নিকট গভীর পরাজয়ে সে কেমন একটা দারুণ গ্লানি অনুভব করিতে লাগিল। ইহা তাহার পৌরুষের অপমান, তাহার মনুষ্যত্বের অপমান!

কিন্তু সুপ্রিয়া ডাকিল কি? তাহার চক্ষে সে কি সত্যই অপদার্থ প্রতিপন্ন হইল? শঙ্করই তাহার জীবনে বড় হইল? যাক্, আর সে ভাবিবে না।

কিন্তু তাহার মা-ও ত নারীই ছিলেন। মায়ের দানে তাহার জীবন কানায় কানায় পূর্ণ হইয়া আছে। সে দান, সে কোনও মুহূর্ত্তেই অস্বীকার করিতে পারিবে না। নারীত্বের পরিপূর্ণ মহিমা তাহার মা'তে প্রকাশ পাইয়াছিল। অথচ সন্তানস্নেহে সে স্বর্গীয় মুখখানি সর্ব্বদাই জ্যোতির্ম্ময় হইয়া থাকিত। তাহার মা! মা! মা! মায়ের সহিত কি আর কাহারও তুলনা হইতে পারে?

আজ তাহার মা নাই। আপন বলিতে কেহই নাই। আজ এই মুহূর্ত্তে কোটি কোটি জীব অধ্যুষিত জগতে সে কি ভীষণ একা, নিঃসঙ্গ! এতবড় নিঃসঙ্গতা বুঝি আর কখনও সে এমন করিয়া অনুভব করে নাই। সেই সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গতা জমাট অন্ধকারের মত দশদিক হইতে যেন তাহাকে গ্রাস করিতে বসিয়াছে। কোথাও এতটুকু আলো নাই। পৃথিবীর স্পন্দনও বুঝি সহসা স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই অবর্ণনীয় স্তব্ধতায় তাহার নিঃশ্বাস রোধ হইয়া আসিতেছে। তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা অব্যক্ত বেদনা মুক্তির আশায় ছটফট করিতে করিতে তাহার কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে।

—বাবুজী!

সোমনাথ জাগিয়া দেখিল, একজন যাত্রী তাহাকে ধাক্কা দিতেছে।

—কি হয়েছে?

যাত্রী হাসিয়া কহিল,—আমার কিছু হয় নি, আপনিই ঘুমের ঘোরে কাতরাচ্ছিলেন। পাশ ফিরে শোন।

—ওঃ, ধন্যবাদ। সোমনাথ পাশ ফিরিয়া শুইল। আবার ভাবিতে লাগিল,—সুপ্রিয়া এত তরল? যৌবনের ধর্ম কি তরলতা? পাত্রের আকারে আকারিত হওয়াই কি তারুণ্যের স্বভাব-ধর্ম? যদি তাহাই হয়

তবে তারুণ্যহীনের ললাটে জ্যোতির্ময়ের আগমনী ঘোষণা করে কেন? সঙ্কল্পে দৃঢ়, অনমনীয়, লক্ষ্যে স্থির তরুণ-তরুণীর জীবন-কাহিনীও ত মিথ্যা নহে! জোয়ান অব আর্ক, লক্ষ্মী বাই, কুরী—! কোথায় সেখানে তারুণ্যের তরলতা? সুপ্রিয়ার আচরণেও ত তরলতা প্রকাশ পাইত না, চক্ষে ভাসিত না কামনার কুৎসিত ইঙ্গিত! তবে সে কি দেখিল? সুপ্রিয়ার ভীত চকিত দৃষ্টি, অপরাধী দৃষ্টি গোপনে শঙ্করের বাহুর সেই ব্যর্থ প্রয়াস, সে ত সচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছে! তবে…

না, উহাদের চিন্তা শেষ করাই ভাল। কিন্তু মনকে সহস্র ভাবে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করিতে চেষ্টা করিলেও ঘুরিয়া ফিরিয়া শঙ্কর-সুপ্রিয়াই তাহার পরাজিত ম্লান চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া তাহাকে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল! সৌভাগ্যের বিষয় কিছু পরে সর্বসন্তাপহারিণী নিদ্রা তাহাকে সাময়িক ভাবে এই চিন্তা হইতে অব্যাহতি দিল।

ভোর রাত্রে টুণ্ডুলায় অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে সে ট্রেণ পরিত্যাগ করিল। মাথাটা ভার ভার বোধ হইতেছে। বোধ হয় দুশ্চিন্তা ও উত্তেজনার ফল। সোমনাথ এক কাপ চা খাইয়া সুস্থ হইবার চেষ্টা করিল। যথাসময়ে অপর ট্রেণে আগ্রায় পৌঁছিয়া একটা বাঙ্গালী হোটেলে আশ্রয় লইল।

সোমনাথ মধ্যাহ্নে আহারাদি সারিয়া শয্যা গ্রহণ করিল। প্রায় দুইটা নাগাদ জাগিয়া দেখিল জ্বর আসিয়াছে। একা একা শুইয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। টোঙ্গা ভাড়া করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সোজা সেকেন্দ্রাবাদের আদেশ দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দূর হইতে সেকেন্দ্রাবাদকে স্বপ্নের ছবির মত মনে হইল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া লক্ষ্য করিল তাহার শ্রীহীন অঙ্গনে সে সুষমা আর নাই। মোগলসূর্য অস্তমিত। সম্রাট আকবরের স্মৃতি মাত্র বহন করিয়া এই সমাধি অতীতের একটি উজ্জ্বল পৃষ্ঠাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে।

সেকেন্দ্রাবাদ দেখিয়া সোমনাথ টোঙাওয়ালাকে আদেশ করিল, আগ্রা-দুর্গ! আগ্রা-দুর্গে প্রবেশ করিয়া সে একজন গাইডের আশ্রয় লইল। গাইড তাহাকে লইয়া সযত্নে দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, রঙমহল, শীসমহল, বেগমদের স্নানের বিলাস ব্যবস্থা প্রভৃতি বর্ণনা করিতে করিতে চলিল।

যদিও এসকল কাহিনী তাহার অজানা নাই, তথাপি গাইডের বলিবার ভঙ্গিতে তাহার ভালই লাগিল; জ্বরের প্রকোপে সব কথা সব সময় সে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। দেখিতে দেখিতে সে কেবল মস্তক আন্দোলিত করিয়া মাঝে মাঝে সায় দিয়া যাইতেছিল।

দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া এবার সোমনাথ সোজা তাজ দেখিতে চলিল।

তাজ! জ্যোৎস্না-বন্যা-বিধৌত তাজ! এই তাজের রূপে বিশ্বের কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, জ্ঞানী, গুণী আজিও পাগল! তাজের উপমা তাজ! তাজকে বর্ণনা করিতে যাইলে তাজের মহিমা বুঝি ক্ষুণ্ণ হয়। তবু সোমনাথ আবৃত্তি না করিয়া থাকিতে পারিল না—

যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্ একবিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।

কালের স্বভাব, সুন্দরকে, তা সে যত সুন্দরই হউক তাহাকে জীর্ণ হতশ্রী করিয়া কাল-কবলিত করা। কিন্তু সত্যই বুঝি কাল এখানে পরাভব মানিয়াছে! এই নবনীশুভ্র নিষ্কলঙ্ক প্রেমের প্রতীককে ভাবার-ঝঙ্কারে অভিনন্দিত করিয়া কবি সত্যই বলিয়াছেন—

হে সম্রাট কবি,
এই তব হৃদয়ের ছবি,
এই তব নব মেঘদূত,
অপূর্ব অদ্ভুত!

সোমনাথ জরের প্রাবল্যে আর বসিয়ে থাকিতে পারিল না। নগ্ন চত্বরটায় শুইয়া শুইয়া বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে তাজের সৌন্দর্য্য পান করিতে লাগিল।

—সোমনাথ।

সোমনাথ বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া দেখিল, এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ! সঙ্গে অনুপম লাবণ্যবতী এক নারী! সোমনাথ সসম্ভ্রমে কহিল,

—কে আপনি? আপনারা?

—ভাল করে চেয়ে দেখ দেখি। চিনতে পার কি যুবক?

আভূমি প্রণত কুর্ণিশ দিয়া সোমনাথ সসম্ভ্রমে উত্তর করিল,

—সম্রাট্! সম্রাজ্ঞী!

—হাঁ সোমনাথ! তিন শতাব্দী পূর্ব্বেকার ইতিহাস স্মরণ কর। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সেই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নায়ক সম্রাট সাজাহান, আর নায়িকা এই সম্রাজ্ঞী মমতাজ! আজ অবশ্য ইহপারে বা পরপারে কোন পারেই আমাদের সাম্রাজ্য নেই!

—এই নিঃস্ব রিক্ত পথিক আপনার কোন আদেশ পালন করতে সক্ষম সম্রাট্!

—শোন যুবক! তুমি নির্ম্মল আত্মার অধিকারী, তাই তোমার কাছে আমরা আসতে পেরেছি। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, কত রাজ্যের উত্থান পতন ঘটেছে, পৃথিবীর তথা পৃথিবীর মানুষের মনেও বহু বিবর্ত্তন ঘটে গেছে। কিন্তু আমাদের কোনও পরিবর্ত্তনই হয় নি। আমরা দু'জনে দীর্ঘকাল ধরে এতদিন এই মহলেই বাস করছি। আমরা তৃপ্ত, পূর্ণ। কারো 'পরে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই, কিন্তু আজকাল আমরা বড় বিরক্ত বোধ করছি।

—কেন সম্রাট্!

—অসম্ভব জনসমাগমে আমাদের বিশ্রামালাপের ব্যাঘাত ঘটছে। বেশীর ভাগ লোকই এখানে আসে তাজের সৌন্দর্য্য পান করতে নয়,

তাজের অন্তর্নিহিত মর্ম উপলব্ধি করতে নয়, পরন্তু আপন মর্যাদা বৃদ্ধি করতে! তাজ দেখেছে, তাদের প্রিয়জনের কাছে এইটেই তারা গর্ব করে বলবে। কি দেখেছে তারা তা জানে না, অথচ দেখার মিথ্যা আড়ম্বরে অহঙ্কার দেখাবে। অবশ্য দু'চার জন সত্যিকার দর্শকও যে আসেন না তা নয়। এই ত আমার কাছেই রয়েছেন তোমাদের একালের রবীন্দ্রনাথ আর সত্যেন্দ্রনাথ! ওঁদের পরে আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। কিন্তু দু'বেলা এই অরসিকদের আর্তনাদ আর সহ্য করতে পারছি না। আমরা স্থির করেছি এবার আমরা তাজমহল ত্যাগ করব। সম্রাটের স্বর ভারী হইয়া আসিল।

—তাজমহল ত্যাগ করবেন?

—উপায় কি! এভাবে অশান্তির মাঝে বাস করা আর সম্ভব নয়।

—আপনারা যে গেছেন, তা কেমন করে জানা যাবে?

—আমরা যে দিন চলে যাব সেদিন তাজের মিনারগুলো অকস্মাৎ খসে পড়বে।

সোমনাথ ব্যাকুলভাবে কহিল,—না না—আপনারা যাবেন না। বলুন আমি কি করতে পারি, কি হলে আপনারা থাকতে পারেন।

—একটা সর্তে আমরা থাকতে পারি। যদি তোমাদের সরকার এমন আদেশ জারী করেন, যার ফলে, সাধারণ লোক বৎসরের বারটা পূর্ণিমার মধ্যে অন্ততঃ দশটা পূর্ণিমায় তাজের শান্তি ভঙ্গ করবে না, সপ্তাহে সাতটা দিনের মধ্যে অন্ততঃ দুটো দিন তাদের কল-কোলাহলে আমাদের বিরক্ত করবে না, তবেই আমরা থাকতে পারি।

পুনরায় আভূমি প্রণত কুর্ণিশ করিয়া সোমনাথ কহিল,—তাই হবে সম্রাট! তাই হবে। আমি এ কথা সরকারকে জানাব। এমনভাবে জানাব, যাতে তাঁরা সত্বর এ আদেশ জারী করেন।

সম্রাট হস্তোত্তলন করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন,—বিদায় বন্ধু!

—বিদায় সম্রাট্‌!

—কি মশায়! জ্বরের ঘোরে সম্রাট্‌ সম্রাট্‌ করে চেঁচাচ্ছেন, আর এদিকে আপনার নিজের অবস্থাটা যে অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠেছে!

সোমনাথ চাহিয়া দেখিল তাহার সম্মুখে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সঙ্গে এক স্বাস্থ্যোজ্জ্বলা মহিলা! বোধ হয় ভদ্রলোকের স্ত্রী।

সোমনাথ যদি একটা দিনও অপেক্ষা করিত তবে সুপ্রিয়ার সম্পর্কটা হয়ত এতটা জটিল হইয়া উঠিত না। সুপ্রিয়া ভাবিয়াছিল, সোমনাথের নিকট হইতে তিরস্কার পাইলে তাহার পক্ষে পুরস্কারই হইবে, কারণ কৈফিয়ৎ দিবার অবসরে সেই আকস্মিকতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করিবার সুযোগ পাইবে। কিন্তু এ আশঙ্কাও ছিল যে, সোমনাথ হয়ত ও প্রসঙ্গের উত্থাপন না করিয়া কঠিন নির্লিপ্ততায় নিজেকে অন্তরালে রাখিতে চাহিবে এবং সেক্ষেত্রে ভূমিকাটা কিরূপ দাঁড়াইবে তাহাও সে বিনিদ্র রজনীতে চিন্তা করিয়া করিয়া একপ্রকার স্থির করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু সোমনাথ যে কাহাকেও কিছুমাত্র না জানাইয়া এ ভাবে সহসা অন্তর্ধান করিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। তাই ভোর না হইতেই সোমনাথের আবাসে সন্ধান লইয়া যখন সে জানিল যে সোমনাথ গতরাত্রেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে আর ফিরে নাই, তখন ক্ষোভে, দুঃখে, ক্রোধে সে একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল। বার বার সে অস্বীকার করিয়া কহিল, না না, এতবড় শাস্তির যোগ্য অপরাধ সে করে নাই, সে করে নাই।

প্রাতে শঙ্করের সহিত আলোচনা তাহার পরবর্তী ঘটনা। তাই শঙ্কর যখন তাহার কথাকে তাহার প্রতি অনুরাগের আবির্ভাব বলিয়া ভুল করিল, তখনও প্রকৃতপক্ষে সুপ্রিয়া সোমনাথের প্রতি প্রেমের জোয়ার সংবরণ করিতে পারে নাই এবং শঙ্করকে বলিলেও তাহার লক্ষ্য ছিল সোমনাথই।

দ্বিপ্রহরে সমস্ত ঘটনাটা স্থির মস্তিষ্কে আলোচনা করিতে গিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। সে প্রত্যক্ষভাবেই শঙ্করকে আশা দিয়া ফেলিয়াছে। এখন কথাটাকে কেমন ভাবে প্রত্যাহার করিবে তাহাই সে ভাবিতে লাগিল। ভাবিয়া ভাবিয়া কিন্তু কোনও কূল-কিনারা পাইল না। এদিকে শঙ্করও সপ্তাহান্তে নিপুণ অভিনেতার মত সকলের নিকট যথোচিত গাম্ভীর্যের সহিত সহানুভূতি কুড়াইয়া তাহার সাধের স্বর্গকে সাময়িকভাবে ত্যাগ করিল। ভাবিল, এ স্বর্গের চাবি-কাঠিটি সে কৌশলে করায়ত্ত করিতে পারিয়াছে।

এইবার সে সপ্তাহে দুই-একদিন আসিয়া ঘনিষ্ঠতাটুকু বজায় রাখিয়া যাইতে লাগিল। ব্যবহার বেশ সম্ভ্রমপূর্ণ ও ভদ্র, কাহারও অভিযোগের অবসর নাই।

রাজলক্ষ্মী একদিন একান্তে স্বামীকে ডাকিয়া কহিলেন,

—সোমনাথ কেন হঠাৎ আসা বন্ধ করল জানো?

গম্ভীরভাবে প্রফেসর মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—ঠিক জানি না! তবে অনুমান করতে পারি। অত বড়লোকের ছেলে একদিনে ফকির হয়ে কি করে কলকাতায় থাকে বল? তাছাড়া ইদানীং টাকার টানা-টানিতে আমাদের কাযকর্ম একরকম অচল হয়ে এসেছিল।

চিন্তিতভাবে রাজলক্ষ্মী বলিলেন,—তোমার অনুমানে যুক্তি আছে, কিন্তু আমার মনে হয় এর পিছনে অন্য কারণ আছে। ফকিরীকে ও গ্রাহ্য করে না, এ আমি লক্ষ্য করেছি।

প্রফেসর উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিলেন,—তবে আর কি কারণ হতে পারে?

—সে কারণ সুপ্রিয়া। কিন্তু হতভাগী তা কিছুতেই বলবে না।

—না না লক্ষ্মী! সুপ্রিয়াকে তুমি সন্দেহ কোরো না। সুপ্রিয়া অন্যায় কিছু করবে না।

—না করলেই ভালো। বলিয়া রাজলক্ষ্মী অপ্রসন্ন মুখে চলিয়া গেলেন।

এই সকল দুর্বলতা সহসা কাহাকে প্রকাশ করাও যেমন কঠিন, আবার তৎসম্পর্কে প্রশ্ন করাও তেমনই কঠিন। কয়েকদিন গত হইলে রাজলক্ষ্মী আর থাকিতে না পারিয়া সুপ্রিয়াকে কৌশলে কহিলেন,—সুপ্রিয়া! সোমনাথ কাউকে কিছু না বলে চলে গেল। যাবার আগে তোকেও কি কিছু বলে যায় নি?

সুপ্রিয়া সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল,—না।

—দেখতে দেখতে আজ পনর দিন হয়ে গেল। কোন চিঠি-পত্তরও কি তোকে দেয় নি?

—কাউকে চিঠি-পত্তর দেওয়া ওর স্বভাব নয় মা।

রাজলক্ষ্মী আর কি বলিবেন ভাবিয়া পাইলেন না। পরে সহসা যেন একটু জোরের সঙ্গেই উচ্চারণ করিলেন,

—কিন্তু কী হয়েছে? তোকে ও অগ্রাহ্য করতে চায় কেন?

—সে কৈফিয়ৎটা তার দেবার কথা মা, আমার নয়!

—সুপ্রিয়া!

—মা! সুপ্রিয়া মাথা উঁচু করিয়া পরিপূর্ণ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিল।

রাজলক্ষ্মী তাহার পানে তাকাইয়া কোমল হইয়া আসিলেন, কোমল কণ্ঠেই কহিলেন,—বুঝলুম, অন্যায় তুমি করোনি। কিন্তু ভুল বোঝাটা যদি তার দিক দিয়েই হয়ে থাকে তবুও তার সংশোধনের দায়িত্বটা তুমি অস্বীকার করতে পারো না মা।

এবার সুপ্রিয়া ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,—সেটুকু অবসরও সে আমায় দিতে চায় নি মা। সে যদি আমাকে না চায়, তবে এই অবাঞ্ছিত দেহটাকে নিয়ে তার পিছনে পিছনে দৌড়বার অসম্মান থেকে আমায় মুক্তি দাও মা। বলিয়াই দুই জানুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া নিজেকে গোপন করিবার চেষ্টা করিল।

রাজলক্ষ্মী পরমস্নেহে তাহার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে তেমনই কোমল কণ্ঠে কহিলেন,—আমায় সব খুলে বল মা। হয়ত তুই যতটা ভাবছিস, সর্বনাশটা এখনও ততটা এগিয়ে আসে নি।

—আর তুমি আমায় কিছু প্রশ্ন কোরো না মা।

সুপ্রিয়া চলিয়া গেল। রাজলক্ষ্মী বসিয়া বসিয়া আসন্ন সর্বনাশের কথা চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, নিশ্চয় শঙ্করকে লইয়াই এই সকল অত্যন্ত জটিল জালের সৃষ্টি হইয়াছে। হতভাগা আসা অবধি যেন এ বাড়ীতে শান্তি নাই, শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে। সুস্থ হইয়াও এলাহাবাদে ফিরিবার নাম নাই। কলিকাতায় বসিয়া বসিয়া কি করিতেছে ও! বলে কোথায় নাকি কি একটা ব্যবসা সংক্রান্ত কাযে ব্যস্ত আছে। এ সবই তাহার ছলনা। ইহা সুপ্রিয়াকে গ্রাস করিবার কৌশলমাত্র। আসল কথা সে কলিকাতা ত্যাগ করিতে চাহে না। এদিকে সোমনাথ চলিয়া গিয়াছে। নিশ্চয়ই শঙ্করের চক্রান্তেই সে চলিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে। সোমনাথ জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হইলেও সাংসারিক কূট-নৈতিক চালে অনভিজ্ঞ! কিন্তু শঙ্কর কি এতদিনেও সুপ্রিয়াকে বুঝিতে পারে নাই? বুঝিয়াও যদি অবুঝ হইতে চাহে, তবে উভয় পক্ষেই বিপদের আশঙ্কা বর্তমান। ভগবান ভিন্ন বুঝি আর কেহ এ বিপদে রক্ষা করিবার নাই। রাজলক্ষ্মী প্রতিকারহীন অক্ষমের ন্যায় শেষ সম্বল ভগবানকে আশ্রয় করিয়া যুক্ত করে উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সোমনাথ যাঁহাদের আশ্রয়ে নিজেকে সমর্পণ করিল বা করিতে বাধ্য হইল, তাঁহারা হইতেছেন আগ্রার বিখ্যাত চিকিৎসক দম্পতি। ডাঃ লাহিড়ীর নাম আগ্রার বাঙ্গালী অবাঙ্গালী উভয় মহলেই বিশেষ পরিচিত। ডাঃ লাহিড়ী হস্পিটালের ডাক্তার। মোটা মাহিনার চাকুরী। বাড়ীতে রোগী-পত্র বড় একটা দেখেন না। কাযেই যেটুকু বাড়ীতে থাকেন বেশ

নির্ঝঞ্ঝাটেই থাকেন। বাড়ীখানি তাঁহার নিজস্ব। তিনি যে একজন বেশ সৌখীন লোক তাহা বাড়ীখানিই আলাপের পূর্ব্বাহ্নে জানাইয়া দেয়। আলাপ জমাইতে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান। তাঁহাদের গৃহ-পাঠাগারটিও বেশ সুরুচিসম্পন্ন। একাধারে শান্তি ও আরামদায়ক।

ডাঃ লাহিড়ী ও তাঁহার স্ত্রী ধীরা, সোমনাথকে হস্পিটালে না পাঠাইয়া তাঁহাদের গৃহে আনিয়াই চিকিৎসার ব্যবস্থা করিলেন। রোগটা আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই তীব্রতা ধারণ করিয়াছিল। অনভ্যস্ত শরীরে আহার বিহারের অত্যাচার সুযোগ পাইয়া প্রতিশোধ লইতে কার্পণ্য করে নাই।

বাড়ী পৌঁছিয়া ধীরা চিন্তিত মুখে স্বামীকে কহিল,—বিদেশে ভদ্রলোক যে ভাবে পাড়িয়ে পড়লেন, তাতে ওঁর আত্মীয়-স্বজনকে সংবাদ পাঠান উচিত।

ডাক্তার উত্তর করিলেন,—নিশ্চয়ই উচিত। কিন্তু ওঁর কোন আত্মীয়ের সংবাদ আমরা জানি না। তবে সত্যিই ভয়ের কোন কারণ নেই। আশা করি দু'এক দিনের মধ্যেই উনি আশানুরূপ সুস্থ হয়ে উঠবেন।

জ্বরের ঘোরে সোমনাথ মাঝে মাঝে ভুল বকিতেছিল। ধীরা সমানে 'আইসব্যাগ' মাথায় দিয়া বসিয়া আছে। শব্দ গুলা অস্পষ্ট। ধীরা উৎকর্ণ হইয়া সেই শব্দগুলা ধরিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। এবার যেন উভয়ে স্পষ্ট শুনিতে পাইল,—ষ্ট্রাটস্‌ফিয়ার!

ধীরা স্বামীকে প্রশ্ন করিল,—ষ্ট্রাটস্‌ফিয়ার কি?

—বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের জবাব এক কথায় দেওয়া সম্ভব নয়।

—সুপ্রিয়া!

ধীরা হাসিয়া বলিল,—এটাও কি তোমার বৈজ্ঞানিক প্রশ্ন?

—না এটা খুব সম্ভব আর্ট বা লিটারেচারের অন্তর্ভুক্ত।

—ট্রাজেডি না কমেডি?

—কৌতূহল সংযত কর নারী, যেহেতু আমরা উভয়েই অন্ধকারে অন্বেষণ করতে যাচ্ছি।

—কীসের অন্বেষণ?

—অতিথির মনোজগত। মৃদু হাসিয়া ধীরা চুপ করিল।

ডাক্তারের ধারণাই সত্য হইল। পরদিন জ্বর ছাড়িয়া গেল।

ডাক্তার লাহিড়ী ও ধীরা একসঙ্গে প্রবেশ করিয়া দেখিল, সোমনাথ সহজভাবে পালঙ্কের উপর বসিয়া আছে।

ডাক্তার উৎফুল্ল কণ্ঠে কহিলেন,—বাঃ! এইত বেশ সেরে উঠেছেন।

ধীরা গম্ভীর ভাবে বলিল,—ট্রাটস্-ফিয়ার।

ডাক্তার ততোধিক গম্ভীরভাবে কহিলেন,—না—সুপ্রিয়া।

ধীরা হাল্কা হাসিতে ঘরখানা ভরিয়া তুলিল।

সোমনাথ অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া কহিল,—এখনও পর্য্যন্ত আপনাদের পরিচয় জানিনা। কিম্বা জানিনা বললে হয়ত সত্যের অপলাপ করা হয়। আপনারা মহৎ।

ধীরা সম্মুখে আসিয়া কহিল,—আপনি বেশ ভাল বাঙলা জানেন ত? আপনি কি সাহিত্যিক?

ডাক্তার গম্ভীরভাবে কহিলেন,—ভুল হল ধীরা, উনি বৈজ্ঞানিক। ট্রাট্স্-ফিয়ার।

ধীরা পুনরায় হাসিতে ভাঙিয়া পড়িয়া বলিল,—কিন্তু সুপ্রিয়া।

সোমনাথ কহিল,—অসময়ে আপনারা আমায় বাঁচিয়েছেন। কিছুই আমি গোপন করব না। সত্যিই আমি কিছু কিছু বিজ্ঞানের সেবা করেছি। সুস্থ হয়ে সব কথাই বলব। সুপ্রিয়ার কথাও আপনারা জানতে পারবেন। কিন্তু আলাদীনের প্রদীপের মত এ স্বর্গরাজ্যে আমি এলুম কি করে?

ধীরা বেশ শান্তকণ্ঠেই বলিল,—আমাদের কাছে সেই দৈত্যটা এসে বলল, অচিন দেশের রাজকুমার তাজমহলের চত্বরে পড়ে স্বপ্ন দেখছেন।

ঘুম ভাঙলে তিনি দেখবেন তিনি ভিখিরীর মত অসহায়! তাঁকে বাঁচাতে হলে এখনই আপনাদের সেখানে যাওয়া প্রয়োজন।

—বুঝলুম! কিন্তু কাযটা আপনারা ভাল করলেন না।

বিস্মিতকণ্ঠে উভয়ে একই সঙ্গে প্রশ্ন করিল,—কেন?

—মণি-মুক্তার লোভে ভিখিরীটা যদি সব চুরি করে পালায়?

উভয়েই হাসিয়া ফেলিল। ধীরা কহিল,—পালাবে জানি। কিন্তু ও যে অচিন দেশের রাজকুমার! তাই নিয়ে কিছু পালাতে পারবে না, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত ওর শেষ সম্বল ছেঁড়া কাঁথাটুকুও ফেলে না যায়, কারণ নেবার চেয়ে দেবার অহঙ্কারই যে ওদের বেশী।

কয়েক দিনের মধ্যেই সোমনাথ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিল। সে লক্ষ্য করিল, নিরবচ্ছিন্ন অবসরের মাঝে ধীরা জীবনটাকে যতদূর সম্ভব সুন্দরের পরিবেশের মাঝে বিলাইয়া দিয়াছে। সময় সময় এই পরিবেশকে বিলাসের ব্যঞ্জনা বলিয়া ভ্রম হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাহার চারিপাশ ঘেরিয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের সমারোহ! নিজেও খুব সম্ভব সে উচ্চশিক্ষিতা। অন্ততঃ তাহার আলোচনার ভঙ্গিতে তাহাই মনে হয়।

ধীরা প্রায় তাহারই সমবয়সী! তবে মেয়েদের বয়স সব সময় অনুমান করা শক্ত! তাই হয়ত দুই এক বৎসরের বড় হইলেও হইতে পারে। দূরকে নিকট করিবার ক্ষমতা এক একজনের এত বেশী থাকে যে, তাহাদের সংস্পর্শে দুই দিন আসিলেই বাহিরের ব্যবধানটা যেন স্বভাবতই সরিয়া যায়। ধীরাও এই ধরণের মেয়ে। ফলে, সমবয়সী সোমনাথ ও ধীরা কয়েক-দিনের মধ্যেই সহজ হইয়া আসিল এবং পরস্পর তুমি সম্বোধনটাও সুরু হইয়া গেল। সোমনাথ প্রথমটা তাহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে চাহে নাই। 'আসতে পার' 'দিলে ভাল হয়'—'এদিকে একবার শুনে যেয়ো' ইত্যাদি সম্বোধনহীন শব্দগুলাই ব্যবহার করিতেছিল। ধীরাই একদিন হাসিয়া বলিল,—তুমি দেখ্‌ছি একদিন ওঁর সামনে আমায় অপ্রস্তুতে ফেলবে!

সোমনাথ বিস্মিতভাবে বলিল,—কেন ?

—তোমার দিবারাত্রের সম্বোধনহীন ডাক শুনতে শুনতে আমার ভয় হয়, কোন দিন না তুমি ওঁর সামনে আমায় ওগো হাঁগো বলে ডেকে বসো।

সোমনাথ লজ্জিত হইল, কহিল,—কি বলে ডাকলে তুমি খুব খুসী হও বল।

ধীরা খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল,—আমার খুসী মত ডাক তুমি দিতে পারবে না। ওতে কায নেই। তার চেয়ে বরং তুমি ধীরা বলেই ডেকো। বয়সে তোমার চেয়ে কিছু বড় হলেও বেশী বড় নয়।

সোমনাথ সায় না দিয়া চুপ করিয়া রহিল। ডাক্তার প্রবেশ করিয়া কহিলেন,—কি ব্যাপার সোমনাথ বাবু! দু'জনেই চুপচাপ যে। আমার ঘরে বসে আমারই বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র হচ্ছে না ত ? বলিয়া ডাক্তার উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

ধীরা কহিল,—তুমি সোমনাথবাবু বলায় সোমনাথ ভারী মুস্কিলে পড়েছে। ওর ইচ্ছে তোমায় দাদা বলে ডাকে, তুমিও শুধু সোমনাথ বলে ডাক। কিন্তু সেখানেও এক ভারী মুস্কিল বেধে গেছে। তা হলে আমাকে বৌদি বলে ডাকতে হয়। ওইখানেই ওর আপত্তি।

—সোমনাথ! তুমি একেবারেই বৈদিক-যুগের মানুষ! বৌদির মত এমন রসাল জমাল এবং দয়াল নামটাতেও তোমার আপত্তি ? আমরা কিন্তু কলেজ লাইফে আমাদের চেয়ে বয়সে ছোট কোন বন্ধুর বিয়ে হলে বেমালুম বয়স চেপে বৌদি সম্পর্ক পাতিয়ে ফেলতুম। যাক্ এখন তা হলে সচীবের কি অভিমত ! বলিয়া ডাক্তার ধীরার পানে তাকাইলেন।

—আমি বলি ও ধীরা বলেই ডাকুক। অবশ্য তাতে আমারও একটু ঝুঁকি না আছে যে তা নয়, কারণ ছোট ছেলে হয়ত সময় অসময়ে ও হুকুম জারী করতে যাবে। পাল্টা জবাবে অবশ্য আমারও অধিকারটা সমানই রইল, কারণ আগে থেকেই আমি ওকে সোমনাথ বলে ডাকছি।

—ব্যস্, মীমাংসা হয়ে গেল। অতএব হে সোমনাথ! আজ সন্ধির এই শুভক্ষণে তোমার কল্যাণে কিছু চা পানের আয়োজন হয়ে থাক্। যাও দেবী, আয়োজন সম্পূর্ণ কর।

—যথা আজ্ঞা। বলিয়া ধীরা প্রস্থান করিল।

চায়ের আসরে তিনজনেই এক সঙ্গে বসিয়া পড়িল। ধীরা কহিল,

—সোমনাথ! তোমার ষ্ট্রাটস্ফিয়ারটি কি?

ডাক্তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করিলেন,—সোমনাথ! তোমার সুপ্রিয়াটি কে?

ধীরা কহিল,—তোমার ওই বড় দোষ। প্রশ্ন দিয়ে প্রশ্ন চাপা দাও। সোমনাথ! প্রশ্ন আমি আগে করেছি, অতএব আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

—সোমনাথ। প্রশ্নটা আমার মুখ দিয়ে বার হলেও প্রশ্নটা ওঁরই এবং উনি আশা করছেন, এ প্রশ্নের জবাবটা হবে অত্যন্ত রোম্যান্টিক! আর সে রোম্যান্স আমার সম্মুখে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করতে হয়ত তুমি ইতস্ততঃ করতে পারো, তাই উনি এ প্রশ্নটা অত্যন্ত কৌশলে মুলতুবী রাখতে চান। দিবালোকের মত আমার প্রস্তাবটা কিন্তু স্পষ্ট!

সোমনাথ হাসিয়া কহিল—দাদা! রোম্যান্সটা তখনই রোমান্টিক হয়ে ওঠে যখন তাকে প্রকাশ করবার কলাটাকে আয়ত্ত করা যায়। নইলে অতিবড় রোমান্সও বর্ণনা শক্তির অভাবে একেবারে বটতলা হয়ে পড়ে।

ডাক্তার গম্ভীরভাবে কহিলেন,—তবে—

উর এবে, উর দেবি, মাতা সরস্বতী!
সোমনাথ রসনায়। তব কৃপা বলে
বর্ণিবে সে ভাষাহীন অবোধ অক্ষম,
অপূর্ব্ব রোমান্স গাথা আম্রাকুঞ্জে বসি।

ধীরা উচ্চহাস্যে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল,—ভাগ্যিস্ আজ মহাকবি মধুসূদন বেঁচে নেই! নইলে তোমার এই রচনা শুনে তিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করতেন।

ডাক্তার বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিলেন,—কি সোমনাথ, তাবার কি ভুল হল?

সোমনাথ সান্ত্বনা দিয়া কহিল,—নিশ্চিন্ত হোন দাদা! কাব্য আপনার অপূর্ব হয়েছে। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে সর্ব্ব বিষয়ে লেডিজ ফার্ষ্ট!

ধীরা প্রতিবাদের ভঙ্গিতে কহিল,—আমি কোনও 'স্পেশাল প্রিভিলেজ' বা স্বতন্ত্র সুবিধার দাবী করি না। এটা সমান অধিকারের যুগ।

ডাক্তার শান্তস্বরে কহিলেন,—বিধাতা কিন্তু তোমাদের সে অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন।

—প্রমাণ দাও।

—প্রমাণটা সোমনাথের সুমুখে দেওয়া সঙ্গত হবে কি?

—সুষ্ঠু, ভদ্র, এবং সঙ্গত প্রমাণে কারো উপস্থিতি আপত্তির কারণ হতে পারে না।

—প্রমাণের মুখে সব সময় সভ্যতার সঙ্গতি রাখা সহজ নয়। তবু একটা কথার জবাব দাও। অধিকার যদি সব সময় সমানই হবে, তবে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন আসে কেন?

—মানুষের দুর্ব্বলতার জন্মে।

—ভালো কথা। 'উইকার সেক্স' কাদের বিশেষণ?

—পুরুষের দেওয়া মেয়েদের।

—মেয়েদের দেওয়া পুরুষের কোন বিশেষণ আছে কি?

—অজস্র! তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'ভালগার', এবং আর একটা হচ্ছে 'হিপক্রিট' বা কপট!

—এই 'ভালগরিজম' এবং 'হিপক্রিসি' কি পুরুষেরই একচেটিয়া?

—প্রায়! মেয়েদের পক্ষে ওটা ব্যতিক্রম!

—কিন্তু কপটতার অপর নাম কি ছলনা নয়? আর মেয়েদের ছলনাময়ী আখ্যার ব্যাখ্যাটা অভিধানে কি স্বতন্ত্র?

—সে ক্ষেত্রেও সমানাধিকারের প্রশ্নটাই আসছে এবং আমার যুক্তিটাই প্রাধান্য লাভ করছে।

ডাক্তার যেন অসহায়ভাবে সোমনাথের দিকে তাকাইয়া বলিলেন,

—ওহে সোমনাথ! হারিয়ে দেয় যে। পুরুষ হয়ে তুমি নিশ্চিন্ত দৃষ্টিতে পুরুষের এই দুর্গতি দেখছ? সাহায্য কর? ওঃ, কী দারুণ ব্যারিষ্টারের জেরায় পড়েছি বাবা!

—আপনাদের তর্কযুদ্ধে আমি প্রায় দিশেহারা হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েছি দাদা! এর মধ্যে প্রবেশ করা আমার মত অরসিকের পক্ষে সুসাধ্য নয়। তার চেয়ে ষ্ট্র্যাটস্ফিয়ার বর্ণনা ঢের সহজ এবং আপাতক্ষেত্রে সেইটেই আরম্ভ করা যাক্। বলিয়া সে আরম্ভ করিল,

—আপনারা জানেন, আমি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বিজ্ঞানের গবেষক। সরকারী খাতায় আমি যে বিষয় গবেষণার জন্য নিযুক্ত ছিলাম তার হিসেব থাক্। আমি স্বতন্ত্র ভাবে এক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের অধীনে মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে গবেষণা করছিলাম। আমার গুরু জার্মানীতে থাকা কালীন এর প্রাথমিক পাঠ নিয়ে ছিলেন, কিন্তু ভাগ্য বিড়ম্বনায় তিনি বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেন নি। আমি যখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলুম তখন তিনি প্রায় বৃদ্ধ, কিন্তু আমার যোগদানে তিনি যেন যৌবনের উৎসাহ পেলেন।

আপনারা জানেন, মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে সারা জগতে বিষম আলোড়ন সুরু হয়ে গিয়েছে। বড় বড় শক্তিরা ভাবছেন, এর ধ্বংস শক্তিকে কেমন করে বিপক্ষের উপর প্রয়োগ করে জগতের প্রাধান্য লাভ করবেন। কিন্তু এর একটা মহা কল্যাণের দিকও আছে। এই রশ্মিকে

নিয়মিত করে মানবদেহে প্রয়োগ করতে পারলে মানুষ যে কোন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। মানুষের জীবদেহ বহু সহস্র কোষে বিভক্ত। এই সকল কোষ দূষিত-জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোন কারণে দুর্বল হয়ে পড়লে নিয়মমত ক্রিয়া করতে পারে না, ফলে, মানুষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। এই 'রে' বা রশ্মিতেই আছে জীবনদায়িনী অমৃত শক্তি। এই রশ্মি এত তেজস্কর যে সাধারণভাবে জীবদেহে প্রয়োগ করতে গেলে মানুষ তা সহ্য করতে পারবে না, মারা যাবে। অথচ এদিকে ষ্ট্রাটস্ফিয়ারের মধ্য দিয়ে যখন 'ওজন' মিশ্রিত হয়ে সেই রশ্মি পৃথিবীতে আসে তখন তার এই সর্ব্ব-রোগহর শক্তি হ্রাস পায়। আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল, সেই মহাজাগতিক রশ্মিকে তার শক্তির অপচয় না ঘটিয়ে কেমন করে জীব-দেহে প্রয়োগ করা যায়। অবশ্য রোগানুযায়ী প্রয়োগের ডিগ্রি বা মাপের তারতম্য হবে। কায করতে গিয়ে আমরা দেখলুম, ষ্ট্রাটস্ফিয়ারই এর প্রচণ্ড বাধা। এখন ষ্ট্রাটস্ফিয়ার কি তাই বলছি।

ষ্ট্র্যাটোস্ফীয়ার হচ্ছে আকাশের একটা ঊর্দ্ধস্তরের নাম। ধরা-পৃষ্ঠ থেকে ছ' সাত মাইল উপর পর্য্যন্ত হচ্ছে তাপমণ্ডল। এখানে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও জলীয় বাষ্প আছে। এর পর বার যোজন ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত যে আকাশ, সেখানে মেঘ বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য নৈসর্গিক ঘটনা ঘটছে। একে বলে ট্রপোস্ফীয়ার। এখানকার বায়ুমণ্ডলে '৭৫ ভাগ নাইট্রোজেন পরিপূর্ণ। এর পরবর্ত্তী ঊর্দ্ধ বায়ুস্তরকেই বৈজ্ঞানিকরা আখ্যা দিয়েছেন ষ্ট্রাটস্ফিয়ার। ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় পঁচিশ মাইল ঊর্দ্ধে এই স্তর রয়েছে। ষ্ট্রাটস্ফিয়ারের জন্যেই আমরা বেঁচে আছি। রেডিওর যে গান আমরা শুনি তাও ষ্ট্রাটস্ফিয়ারের জন্যেই। ইথারের ঢেউগুলো এই ষ্ট্র্যাটস্ফিয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে বলেই আমরা গান শুনি। সে কথা এখন থাক।

ট্রপোস্ফীয়ার যেমন নাইট্রোজেন পরিপূর্ণ, ষ্ট্র্যাটোস্ফিয়ারও তেমনই অক্সিজেন পরিপূর্ণ। অক্সিজেনেরই একটা রূপ হল 'ওজন'। এই ওজনের

কায হচ্ছে আল্ট্রাভায়োলেট রে বা অতি বেগুনী রশ্মি ছুঁকে নেওয়া। তা না হলে যদি ঐ 'কস্‌মিক রে' সোজাসুজি পৃথিবীর বুকে এসে পৌঁছত, তবে এই জীবজগৎ দগ্ধ হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

পূর্ব্বেই বলেছি, ট্রাটস্ফিয়ারের 'ওজন'ই আমাদের জীবজগতকে আদিত্য দেবের রুদ্ররোষ থেকে রক্ষা করছে। 'ওজন'ই সেই রশ্মিকে বিবৃত করে রেখেছে। একথা ভুললে চলবে না যে ওই 'কসমিক রে' বা মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যেই রয়েছে আমাদের সর্ব্বরোগহর জীবন-দায়িনী অমৃত। সেই অমৃতকে পান করে রোগ জরা জয় করা সম্ভব। আপাত দৃষ্টিতে এটা অসম্ভব মনে হলেও বৈজ্ঞানিক অঙ্কপাতে আমরা প্রমাণ পেলুম তা সম্ভব।

পরে একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সোমনাথ কহিল,

—কিন্তু কায আমাদের মাঝ পথেই অসমাপ্ত রয়ে গেল। একসঙ্গে মা ও বাবাকে হারালুম, হারালুম আমার যা কিছু পার্থিব সম্পদ। শেষে অজ্ঞাত যাত্রায় হারাতে বসেছিলুম আমার শেষ সম্বল স্বাস্থ্য! আপনাদেরই দয়ায় আপাততঃ হয়ত সেটা রক্ষে পেয়ে গেল।

ধীরা ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিল,—তোমার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ সবটা হয়ত বুঝলাম না সোমনাথ! কিন্তু এটা বুঝলুম যে তুমি মহৎ।

সোমনাথ বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিল,—মহৎ শব্দটার পরিধি অনেক বড় ধীরা। আজ পর্য্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক মানুষ সেই শব্দটার প্রান্ত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে।

ডাঃ লাহিড়ী বলিলেন,—সেদিন কিন্তু তুমি আমাদের প্রতি ওই শব্দটাই ব্যবহার করেছিলে সোমনাথ।

সোমনাথ হাসিয়া ফেলিল, কহিল,—বলেছিলুম। তার কারণও ছিল। সেদিন এক অসহায়ের সাহায্যে মনুষ্যত্ব রূপ ধরে নেমে এসেছিল। আমার অভিনন্দন সেই মনুষ্যত্বকে। ব্যক্তি বিশেষকে নয়।

—কিন্তু ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে অস্তিত্ব কেমন করে প্রকাশ পেতে পারে?

—পারে না বলেই মানুষ অস্বস্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু ধীরা! তুমি যে অতীব খিন্না হয়ে বসে আছ। একটু চা পান না করতে পারলে, এদিকে প্রাণ-পক্ষী যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মুক্ত আকাশে যাত্রা সুরু করতে চায়!

ধীরা নিঃশব্দে উঠিয়া গেল। কেটলীস্থিত তপ্ত জলে চা ফেলিয়া দিয়া সে ভাবিতে লাগিল।—অদ্ভুত এই ছেলেটা। ভারতবর্ষের এক দুর্লভ রত্ন আজ পথের প্রান্তে অবহেলিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। উহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কেহই সজাগ নহে, ও নিজেও নহে। এতবড় মনীষা, এতবড় ধী-শক্তির এতবড় অপব্যবহার ভাবিতে গিয়া ধীরার দুইচক্ষু বাষ্প সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। সে দুর্জ্জয় অভিমানে অলক্ষ্য বিধাতাকে অভিযোগ করিয়া প্রশ্ন করিল, কেন, কেন, কেন, সোমনাথ আশাহীন, আলোহীন এক নৈর্ব্যক্তিক অবচেতনায় আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হইল? সোমনাথ কি জাগিবে না? অন্ধতামসী রাত্রির শেষ যামের অবসান হইবে কবে? রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না আলোকের নব অভ্যুদয়? জাগো, সোমনাথ জাগো। ছিন্ন কর তুমি তোমার বাধার শৃঙ্খল। অমৃতের পুত্র তুমি। ধন্য কর তুমি জগতকে তোমার লব্ধ অমৃত পরিবেষণ করিয়া।

কল্যাণময়ী ধীরা কেমন যেন ভাবস্থ হইয়া বসিয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য ফিরিলে 'লিকার'টা নাড়িয়া দেখিল অত্যন্ত কড়া হইয়া গিয়াছে। বেশী করিয়া দুধ-চিনি দিয়া যখন সে চা পরিবেষণ করিতে আসিল তখনও তাহার মুখখানা থম-থম করিতেছে। সদাপ্রফুল্লময়ী ধীরাকে এভাবে দেখিয়া উভয়েই বিস্মিত হইল, কিন্তু কেহই কিছু বলিল না।

ডাঃ লাহিড়ীই মৌনতাভঙ্গ করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,

—সুপ্রিয়ার আলোচনাটা কি এখন অপ্রাসঙ্গিক হবে?

সোমনাথ যেন একটু ইতস্ততঃ করিল, পরে কণ্ঠটা পরিষ্কার করিয়া কহিল,—সুপ্রিয়া হচ্ছে আমাদের কলেজের এক সহপাঠীর বোন। দেখতে

শুনতে, বিত্তায় বুদ্ধিতে অসাধারণ না হলেও নিন্দনীয়া নয়। অন্ততঃ যে কোন সংসারে সম্মানের সঙ্গেই সে যে আসন দাবী করতে পারে তাতে সংশয় নেই। তাই সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ হয় এবং বলা বাহুল্য বন্ধুটির সাহায্যে পূর্বরাগের সংযোগও ঘটে। সূচনাটা বেশ ভালই হয়েছিল বলতে হবে। কিন্তু অলক্ষ্যে বিধি বাম হলেন। মা ও বাবা মারা যাবার পর জানা গেল পাত্র হিসেবে আমার মূল্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কমে গেছে, কারণ পৈতৃক সম্পত্তি সবই ঋণ-জালে জড়িত। তাছাড়া ইতিপূর্বেই আর একটি ধনীর সন্তান সেখানে 'ঘ্যুটর' হিসেবেই যাতায়াত শুরু করেছিলেন। আমার এ হেন ভাগ্য-বিপর্যয়ে তাঁরই ভাগ্য-গগন আলোকিত হয়ে উঠল, অর্থাৎ মনোনয়নের বিজয় পতাকাটা এবার তাঁর দিকেই হেলল।

ধীরা প্রশ্ন করিল,—সুপ্রিয়া কিছু বলল না?

—সুপ্রিয়া! সুপ্রিয়া আর কি বলবে বল। একালিনী মেয়ে হলেও বাপ মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে 'সিন ক্রিয়েট' করা সে সমীচীন বোধ করে নি। তা ছাড়া বিয়ের ব্যাপারে একজনকে যখন হজম করতেই হবে তখন বাপ-মায়ের প্রতি অভক্তি দেখিয়ে মিথ্যে অশান্তি বাড়িয়ে লাভ কি?

—তুমিও কিছু বললে না?

—আমার বলার মূল্য কতটুকু ধীরা! মেয়েদের মন নিয়ে টানাটানি ইতিপূর্বে কখনও করিনি, তাই শেষ পর্যন্ত সে দুঃসাহস আর হোলো না, নিঃশব্দেই সরে এলুম। ভাবলুম, পরাজয় যখন ঘটলই, তখন এগিয়ে গিয়ে নতুন করে অপমানটা আর গায়ে লাগাই কেন!

—তোমার সুপ্রিয়াকে আমি দেখিনি, কিন্তু তোমার কথাই যদি সত্যি হয়, তবে জোরের সঙ্গেই বলব একালিনী মেয়ে সে নয়। চুড়ির ওপর ঘড়ি বাঁধলে বা গাঢ়ীর রঙে শাড়ীর ম্যাচ লাগালেই একালিনী হওয়া যায় না।

—কিসে হয় সেটা জানালে আমারও অভিজ্ঞতাটা বাড়বে ধীরা!

—শিক্ষা আছে সংস্কৃতি নেই—বুদ্ধি আছে হৃদয় নেই, এটা কত বড় ট্র্যাজেডি বলত!

—হাঁ, হাঁ, তুমি যা বলতে চাইছ তার নির্গলিতার্থ হচ্ছে, গান আছে গলা নেই, প্রাণ আছে মান নেই। কিন্তু ধীরা! সুপ্রিয়া শিক্ষার সংস্কৃতিতে, কণ্ঠে ও কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয়া না হলেও খুব সাধারণ নয়।

—তবে?

—এ তবের কোন উত্তর নেই ধীরা!

ধীরা সহসা তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—সোমনাথ! সত্যকে এমনভাবে বিকৃত করে বলার চেয়ে খাঁটি মিথ্যা বলা ঢের ভালো ছিল। এই ভেজালের পরিবেষণ আমাদের কাছে না করলেই কি চলত না?

ধীরা দ্রুত কক্ষ ত্যাগ করিল।

ডাঃ লাহিড়ী বিস্মিতকণ্ঠে কহিলেন,—ব্যাপার কি সোমনাথ?

সোমনাথ উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিল।

সে দিন সুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ সেই যে বন্ধ হইয়া গেল আর উঠিলনা। ধীরা যেন কোনদিনই সুপ্রিয়ার কথা জানিতে চাহে নাই এইভাবে প্রসঙ্গটা সে ইচ্ছা করিয়াই চাপিয়া গেল।

ধীরা ও সোমনাথ যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল সে ঘনিষ্ঠতায় সোমনাথ কিছুটা শঙ্কিত হইয়া পড়িতেছে। ধীরার উচ্ছল উর্মিমুখর কলকাকলী মাঝে মাঝে যেন মাত্রা মানিতে চাহে না। ধীরা তাহাকে কি ভাবে, কে জানে! ধীরা যেন ডাঃ লাহিড়ীকেও গ্রাহ্য করে না! ডাঃ লাহিড়ীও যেন উহাকে উৎসাহই দেন।

ধীরাকে মাঝে মাঝে সরস প্রতিপক্ষ স্থাপন করিয়া ডাঃ লাহিড়ীও যেন বাক্যের ইন্দ্রজাল রচনা করিয়া কৌতুক করেন। এক এক সময় ধীরার

সুপ্রিয়ার বাক্যের অন্তরালে মনে হয় যেন কোন তীর্য্যক ইঙ্গিত আছে। আবার পরক্ষণেই মনে হয় ইহা নিছক কৌতুক মাত্রই। সোমনাথ ভাবিল, ইহা হইল মন্দ নয়। একটা জাল ছিন্ন করিতে গিয়া অন্য জালে জড়াইয়া পড়িতে হইল। পরক্ষণেই ভাবিল, না এখানে আর বেশী বিলম্ব করা উচিত হইবে না, কারণ সুপ্রিয়া যদি শঙ্করের বক্ষলগ্ন হইতে পারে, তবে ধীরাই বা সোমনাথকে আলিঙ্গন করিতে পারিবে না কেন? মেয়েদের মন সর্ব্বদাই দুলিতেছে। সেই দোলনে কখন কাহার অঙ্গে সে হেলিয়া পড়িবে কে জানে? সে ক্ষেত্রে সেও যে নিবাত নিষ্কম্প দীপ-শিখার ন্যায় জ্বলিতে থাকিবে তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? ইতিমধ্যেই সে লক্ষ্য করিয়াছে, ধীরা তাহার জীবনে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ধীরার সাময়িক মাত্রাধিক্যে অধুনা সে যে বাধা দেয় না তাহা নহে, বরং সে উপভোগ করে। সে ভাবিল, ইহার পশ্চাতে যে কামনার বহ্নি ভস্মাচ্ছাদিত হইয়া আছে, তাহা ইন্ধন পাইলে যে কোন দিন প্রজ্জ্বলিত হইয়া অঘটন ঘটাইতে পারে। রক্তমাংসে গড়া ইন্দ্রিয়-সচেতন মানুষ সে! অতি-মানুষের ভূমিকা অভিনয় করিতে গিয়া অতলে তলাইয়া না যায়!

সন্ধ্যার পর ডাক্তার লাহিড়ী বৈঠক বসান। ধীরা ইহার নাম দিয়াছে তিনের বৈঠক। তিনের বৈঠকে আলোচনা চলে নির্ব্বাধভাবেই। সে আলোচনায় এক রাজনীতি বাদে আর প্রায় সব নীতিই স্থান পায়। রাজনীতি যেটুকু আসে তাহা সরকারের মুণ্ডপাতেই শেষ হয়, অর্থাৎ এ গভর্ণমেণ্ট থাকিতে 'প্রগ্রেস' বলিতে কিছু হইবে না ইত্যাদি।

সেদিন তিনের বৈঠকে ধীরাই পূর্ব্ব দিনের আলোচনার জের টানিয়া প্রশ্ন করিল,—আচ্ছা, কবি যে বলেছেন সোসাইটি, ফ্রেণ্ডশিপ এ্যাণ্ড লভ অর্থাৎ, সমাজ, বন্ধুত্ব আর প্রেম; তা এ তিনের কোনটি সবচেয়ে বড়।

ডাক্তার লাহিড়ী উত্তর করিলেন,—স্থান কাল পাত্র হিসাবে এর ছোট বড়র তারতম্য ঘটে।

—[illegible] ?

—ইংরেজের কাছে সোসাইটি বড়, আফগানের কাছে ফেওশিপ বড়, আর বাঙালীর কাছে প্রেম বড় !

—প্রমাণ ?

—প্রমাণ, ক্লাব উঠে গেলে ইংরেজের অপমৃত্যু ঘটবে, বন্ধুত্ব না পেলে আফগান আর আফগান থাকবে না এবং ভালবাসতে না পেলে চণ্ডীদাস গৌরাঙ্গের দেশে আম কাঁঠালের রস জমে পাথর হয়ে যাবে।

সোমনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল,—দাদার মাথায় এগুও খেলে !

—না খেললে যে সব ভেসে যায় ! জানত, একদিন গঙ্গার প্রবাহে ঐরাবতও ভেসে যায় দেখে ভোলানাথকেই শেষ পর্য্যন্ত বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে গঙ্গার বেগ প্রশমিত করতে হয়েছিল।

ধীরা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করিল,—কিন্তু একালে গঙ্গাকে অত সহজে রোধ করা যায় না। বাধার মুখে বারে বারে তার গতিপথ পরিবর্ত্তন করে সে চলে, কিন্তু এ পরিবর্ত্তন ফেলে রেখে যায় সবুজ তৃণ-ভূমি।

—জানি সময় সময় আবার নব ভগীরথের আবির্ভাবে নতুন খাতে নতুন ঢঙে তাঁর চলা সুরু হয়।

—হয়ই ত ! তাই বলে ভগীরথও তাঁর শঙ্খধ্বনি থামান না, আর গঙ্গাও তাঁকে অনুসরণ করতে বিরত হন না।

—কিন্তু এদিকে শিবের দল হতাশনেত্রে দাঁড়িয়ে দেখেন যে, যে গঙ্গাকে তিনি মাথায় করে নেচেছিলেন, সেই গঙ্গাই ভগীরথের পিছনে পিছনে বিপথে চলেছেন। নব ভগীরথের শঙ্খ তখন আর শিবের বুকে পুলক জাগায় না, জাগায় রুদ্রের ডমরু ধ্বনির প্রচণ্ড নির্ঘোষ !

—জাগুক সেই নির্ঘোষ। গঙ্গা তা গ্রাহ্য করে না। কিন্তু কথাটা তুমি কথায় কথায় চাপা দিচ্ছ। আমি বলি সবার বড় ভালবাসা। সোমনাথ। তোমার কি মত ?

সোমনাথ প্রশ্নটার সোজা জবাব না দিয়া কহিল,—হতভাগার জীবনে আজও এলো না সত্যিকার সোসাইটি, ফ্রেণ্ডশিপ, আর লভ ! তাই আমার মন্তব্যটা মর্য্যাদা পাবে বলে ভরসা হচ্ছে না !

ধীরা অধীরকণ্ঠে কহিল,—না-না, এভাবে এড়িয়ে গেলে চলবে না। তোমার নিজস্ব মত দিতেই হবে।

সোমনাথ গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—ফ্রেণ্ডশিপ !

ডাঃ লাহিড়ী উচ্চ হাস্যে কহিলেন,—এ হোলো মন্দ নয়। এবার আমি যদি বলি সোসাইটি, তা হলে মতটা ত্রিধা বিভক্ত হয়ে মতানৈক্যে পরিসমাপ্তি নেয় ; কিন্তু সেক্ষেত্রে ট্রাইবুনালের রায় দেবে কে ?

—না, তোমাকে এক পক্ষে রায় দিতেই হবে।

ডাঃ লাহিড়ী বিস্ময়ে বিস্ফারিত নয়ন হইয়া উত্তর দিলেন,—এ যে রীতিমত জুলুম। না, ওতে আমি রাজী নই। চাপে পড়ে যদি তোমার পক্ষেই ভোট দিয়ে বলি, তবে সোমনাথ ভাববে আমি স্ত্রৈণ, আমার নিজস্ব কোন মত নেই।

সোমনাথ হাসিয়া বলিল,—আমি কিছু মনে করব না। আপনি নির্ভয়ে ধীরার পক্ষে ভোট দিতে পারেন দাদা !

—ব্যাপারটা অত সহজ নয় ভায়া। তা যদি হোত তা হলে তোমার পরামর্শের অপেক্ষায় এতক্ষণ বসে থাকতুম না। দেখছ না, শ্রীমতীর গুরু-গম্ভীর আলোচনার পেছনে চোখের তারায় খেলছে খুশীর ঝলমলে আলো। সে আলোয় কি ঠিকরে পড়বে এখন তাই ভাবছি—তুমিও ভাব। বেশ, এখন প্রত্যেকেই নিজের নিজের যুক্তি দাও। সোমনাথ তুমি আগে এস।

সোমনাথ বলিল,—যদি সত্যিকার বন্ধু জীবনে না জোটে, তবে তার পক্ষে সোসাইটি আর লভ, মধুহীন গন্ধহীন পুষ্পসম। বন্ধুত্বই মানুষকে আস্বাদনের রস জোগায়। রসহীন জীবন জীবনই নয়। আজকাল যাদের

আমরা জীবন্ত ভাবি অর্থাৎ আমাদের চোখের সুমুখে নিত্য যারা জীবন্তভাবে ঘুরছে, ফিরছে, হাসছে, কাঁদছে, গাইছে, নাচছে, তাহাদের মধ্যে জীবনের সন্ধান করলে দেখা যাবে লক্ষে একটা মানুষও জীবন্ত নয়। কে পেল জীবনে বন্ধু? কে সে ভাগ্যবান? খুঁজে দেখ, কেউ না—কেউ না।

বলিতে বলিতে সোমনাথ একটা অস্বাভাবিক জোর দিয়া সোজা হইয়া উঠিয়া বসিল। তাহার সেই বলিবার ভঙ্গিতে কি ছিল কে জানে, কিন্তু তাহার দৃপ্ত মাধুর্য্যে উভয়ে একই সঙ্গে চমকিত এবং চমৎকৃত হইয়া গেল। যেন ঋজু দৃপ্ত অম্লান বহ্নিশিখা!

ডাক্তার কৌশলে বিষয় বস্তুটা সাধারণ স্তরে নামাইয়া আনিলেন।

—সর্ব্বনাশ! তুমি যেভাবে তোমার যুক্তিটা উত্থাপন করলে তাতে ভাবলুম আমরাও বুঝি জীবন্ত নয়, অশরীরী!

ধীরা হাসিয়া বলিল,—সত্যি! একলা থাকলে চিম্‌টি কেটে নিজের অস্তিত্ব অনুভব করতে হোতো। কিন্তু তোমার সোসাইটি কি বলে?

ডাক্তার বলিলেন,—সোসাইটিটা আমার নয় সকলের! 'সমাজ সংসার মিছে সব' বলে নির্জ্জন গৃহকোণ চাইলেও সে চাওয়াটা স্বাভাবিক নয়। কারণ সেখানেও দুজনে মুখোমুখি হয়ে 'হৃদয় দিয়ে হৃদি' অনুভব করবার বাসনা রয়েছে। এই দুই থেকেই বহু। সৃষ্টির মূলেও নাকি এই ইচ্ছা ছিল যে 'একোহম্ বহুস্যাম্।' বহুর মধ্যে একের সন্ধানই হচ্ছে সোসাইটির উদ্দেশ্য! সোসাইটি বা সমাজ না থাকলে মানুষ মানুষ থাকত না, থাকত না শিক্ষা, থাকত না সংস্কৃতি, থাকত না ভাবের আদান প্রদান, থাকত না বন্ধুত্ব, থাকত না ভালবাসা, থাকত না জীবনের জয়-গান।

এবার ধীরা বলিল,—কিন্তু সোসাইটি এ্যাণ্ড ফ্রেণ্ডশিপ জীবনকে পূর্ণ করতে পারে না। জীবনকে পূর্ণতা দিতে পারে একমাত্র প্রেম। পূর্ণ জীবন লাভ করতে পারে একমাত্র প্রেমিক। প্রেমেই জীবনের পূর্ণতা। মানুষ পূর্ণ হবে এই কামনাই মানুষের শ্রেষ্ঠ কামনা। মাঝপথের ছোট ছোট

কামনাগুলো কখনও ক্লিন্ন কখনও স্বচ্ছ! কিন্তু পূর্ণতার জয়যাত্রার পথে এসব হিসেব নিকেশ তুচ্ছ।

—যতটা তুচ্ছ বলে উড়িয়ে দিতে যাচ্ছ, হয়ত ততটা তুচ্ছ নাও হতে পারে। সমাজের নিন্দা গ্লানি, বন্ধুর বিদ্বেষ, উপেক্ষা করে পঙ্ক শয্যায় শয়ন করাটা তুচ্ছ হিসেব নিকেশ নয়, অন্ততঃ সুস্থ হিসেব নিকেশ নয়।

—মায়ের অন্ধকারময় গর্ভ থেকে যে শিশু আলোর ধরণীতে ধরা দেয়, তার দেহও থাকে ক্লেদাক্ত! তাই বলে সে ধরণীর আনন্দ-অভিনন্দন থেকে বঞ্চিত হয় না। পূর্ণতার আলোকে স্নাত হ'বার সৌভাগ্য যে লাভ করে, জ্যোতির্ম্ময়ের উদার অভ্যুদয় যার ললাটে এঁকে দেয় বিজয় তিলক, সে ত গ্রাহ্য করে না তোমার সমাজের নিন্দা, বন্ধুর বিদ্বেষ। পঙ্কজিনী লাভ করতে আকণ্ঠ পঙ্কে ডুবতেও সে ভয় পায় না।

ডাক্তার পরিহাস করিয়া কহিলেন,—তবেই ত বড় ভাবিয়ে দিলে তুমি। প্রেমের পাথেয় সংগ্রহ করতে গিয়ে আজ যদি সোমনাথই তোমার কাছে বড় হয়ে ওঠে, তবে ত তুমি সব কলঙ্ক মাথায় করে শ্রীরাধার মত আমাকেও অকূলে ভাসিয়ে যেতে পারো।

ধীরা তেমনই হাসিয়া প্রত্যুত্তর করিল,—পারি। কিন্তু যাকে নিয়ে পালাব সেই যে প্রেম বোঝে না। নইলে দেখতে, তোমার ধীরা এতদিন হয়ত ইরাণ তুরাণ ঘুরে বসোরার গোলাপকুঞ্জে বা বাগদাদের দ্রাক্ষাকুঞ্জে বসে স্বর্গকে ব্যঙ্গ করত।

ডাক্তার গম্ভীর গলায় বলিলেন,—কিন্তু তোমার প্রেমের বন্যায় ও ভেসে যেতেও ত পারে।

—পারে, কিন্তু যাবে না। কারণ ভালবাসা ও জানে না, ভালবাসা ও চায় নি, ও চেয়েছে বন্ধুত্ব। তাই বন্ধুর সন্ধানে ব্যর্থ পাগলামি করেছে।

সোমনাথ ভাবিয়া পাইল না, এ সকল প্রসঙ্গ তাহাকে উপলক্ষ করিয়া এভাবে তাহারই সমক্ষে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আলোচিত হইতেছে কিরূপে! সে অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল কিন্তু বাধা দিতে পারিল না।

ডাক্তার বলিলেন,—আর তুমি?

—আমি যা চেয়েছি, তা পাইনি। কোনও জীবনে পাব কিনা তা জানি না।

—আর আমি?

—তুমি যা পেয়েছ, তা চাওয়ার অপেক্ষা করেনি। তোমার পাওয়ার বিশ্রাম কোনও জীবনে হবে কিনা তা জানি না।

সোমনাথ লক্ষ্য করিল, এই মন্তব্যে ডাক্তার যেন কিছুটা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভ্রূটাকে ঈষৎ সঙ্কুচিত করিয়া আবার প্রসারিত করিয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার মানসিক চাঞ্চল্য গোপন করিবার শক্তিও সাধারণ নহে। পাছে তাঁহার এই উদ্বেগ অপরের চক্ষে ধরা পড়িয়া যায়, এই ভয়ে তিনি একবার সোমনাথ আর একবার ধীরার পানে তাকাইয়া আসন ত্যাগ করিলেন। পিছনের জানালাটা খুলিয়া দিয়া বলিলেন,—চাওয়া পাওয়ার হিসাব নিকাশ কোন জন্মে শেষ হবে কি না জানিনা, কিন্তু হাওয়াটা এ জন্মে এখনই অত্যন্ত দরকার। দেখেছ, কি বিশ্রী গুমোট! যেন দম বন্ধ হয়ে আসছে।

এই মন্তব্যে কেহই কোন উত্তর দিল না। ধীরা নিঃশব্দে আসনটায় স্থিরভাবে বসিয়া রহিল। সোমনাথ একইভাবে ডাক্তারকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। ডাক্তার পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া স্বস্থানে বসিলেন।

সোমনাথ ধীরাকে মন্দ ভাবিতে পারে না। তাই ধীরার সঙ্গ সে পরিহার করিতে চাহে না। ধীরার সঙ্গে সে ইতিমধ্যে আত্মার প্রতিটি

স্থান ভাল করিয়া দেখিয়া আসিয়াছে। একাকী নির্জন দ্বিপ্রহরে ধীরার সঙ্গ তাহাকে স্ফূর্তি দানের অবসর দিলেও কোথাও সে আপন সীমা লঙ্ঘন করে নাই, ধীরাও না। কিন্তু ধীরার অলক্ষ্য প্রভাব অনুভব করিয়া সে সচেতন হইয়া উঠিতেছিল। ধীরা যেন তাহাকে ধীরে অথচ অত্যন্ত নিশ্চিতভাবে আকর্ষণ করিতেছে। এ আকর্ষণের দুর্নিবার বেগ প্রতিহত করা কঠিন। মাঝে মাঝে এখন সে আপন পৌরুষকে প্রাধান্য দিতে চায়। সৌভাগ্যের কথা ধীরা স্বচ্ছন্দ এবং অনায়াস হইলেও একটা দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। নারীর এই সাবলীল সতর্কতা সাধারণ পুরুষকে ভুল বুঝায় এবং একদিন সহসা উন্মাদ করিয়া তুলে। সোমনাথ যদি সাধারণ পর্যায়ে পড়িত তবে এতদিনে তাহার ভূমিকাটা আজ কিরূপ দাঁড়াইত কে জানে!

সোমনাথ দেখিতে দেখিতে আজ তিন মাস হইল ইহাদের আশ্রয়ে রহিয়াছে। এমন একটা অলস কর্মহীন জীবন এতদিন এভাবে যাপন করা তাহার পক্ষে কখনই সম্ভব হইত না, যদি না ধীরা প্রতিটি মুহূর্তে তাহাকে ভরিয়া রাখিত। মাঝে মাঝে তাহার মনে হইত, মায়াবিনী ধীরা বুঝি তাহার মায়ার খেলায় তাহাকে বন্দি রাখিয়া অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুক্তি দিবে না। গল্পে, গানে, হাস্যে, কৌতুকে, প্রাণ-চঞ্চলা ধীরা সময়টাকে নীরন্ধ্র করিয়া রাখিয়াছিল। সেই রন্ধ্রহীন কালের মাঝে এমন এতটুকু অবসর ছিল না যে, তাহারই ফাঁকে তাহার ভবিষ্যতটাকে সে একবার স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখে। অনেক রাত্রে যখন সে মুক্তি পাইত, তখন তাহার ক্লান্ত দেহ শয্যা আশ্রয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িত।

আজ কিন্তু সে সঙ্কল্প স্থির করিয়াছিল। তাই রাত্রে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্লান্ত অলস দেহটাকে শয্যায় ছাড়িয়া দিল না। ঘরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সে চিন্তিত মনে পদচারণ

করিতে লাগিল। সে ভাবিল, সে সোমনাথ! তাহার মায়ের স্বপ্ন-রচিত ভবিষ্যৎ-ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান সে! তাহার দানে একদিন ভারত, শুধু ভারত কেন সমগ্র ধরণী গৌরবান্বিতা হইবে, তাহার মা তাহার স্নায়ুতে, মজ্জায় এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিয়া বিদায় লইয়াছেন। বিজ্ঞানের ছাত্র সে। সুযোগ সুবিধা পাইলে হয়ত একদিন এ স্বপ্ন সার্থক হইতেও পারে। সেই সার্থক-ক্ষণে মায়ের স্বর্গত-আত্মা সেদিন উল্লাসে অধীর হইয়া অদৃশ্যলোক হইতে আনন্দ অশ্রু বর্ষণ করিবে। এই সম্ভাবনা! এই সম্ভাবনা আজ নষ্ট হইতে বসিয়াছে এক অভাবিত ঘটনার চক্রান্তে!

সুপ্রিয়া! একটিমাত্র নারী অমৃতকে গরল করিয়া তুলিয়াছে! তাহার জীবনকে মন্থন করিয়া এই যে হলাহল উত্থিত হইয়াছে, ইহাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইবার ক্ষমতা তাহার নাই। সে মনে মনে উচ্চারণ করিল,—সুপ্রিয়া এ তুমি কি করিলে? তুমি জান না, সমগ্র নারীজাতির বিচারে আমার অন্তর অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে। জানিনা, কোন দিন সেথায় আলোকের আবির্ভাব ঘটিবে কি না! সোমনাথ ভাবিল, বিশাল বিশ্বে একমাত্র সুপ্রিয়া ভিন্ন কি আর কেহ নাই? শর্মিষ্ঠা আছে, মীরা আছে। তাহার মূল্য তাহারা ত এমন করিয়া ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া দেয় নাই! আছে, আরও অনেকে আছে, কিন্তু কি হইবে তাহাদের ব্যর্থ অনুসরণে? সুপ্রিয়াকে সে গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিল, ভাবিয়াছিল, তাহার স্নিগ্ধ ছায়ায় সারা জীবনটা বিজ্ঞানের সাধনায় কাটাইয়া দিবে। তাহা হইল না, তথাপি সুপ্রিয়াকে সে ভুলিতে পারে না। আজ যখন ক্ষোভে, দুঃখে, অভিমানে, অপমানে সে তাহার আজন্মের সাধনা, বিজ্ঞানের সাধনাকেও দূরে রাখিয়া কক্ষচ্যুত গ্রহের মত শূন্যে পাক খাইতেছে, তখনও সুপ্রিয়াই অপর সকলকে ম্লান করিয়া তাহার হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া ব্যঙ্গের হাসি হাসিতেছে!

তাহার ভবিষ্যৎ! দূর হউক ভবিষ্যৎ! ভবিষ্যতের গর্ভেই ভবিষ্যৎ নিদ্রিত থাকুক। বর্ত্তমানে সে কি করিবে তাহাই স্থির করা কর্ত্তব্য। বর্ত্তমানে তাহাকে এই সুখনীড় ত্যাগ করিতেই হইবে। কারণ, ভগবান যাহাকে দুঃখের আবর্ত্তে নিক্ষেপ করিলেন, সে কেন মাঝপথে কাঙ্গালপনা করিবে? দুঃখের পানপাত্র পূর্ণ হউক। সে তাহা আকণ্ঠ পান করিয়া দেখিবে সেই দুঃখের শেষ কোথায়!

সোমনাথ সঙ্কল্প স্থির করিয়া প্যাডটা টানিয়া লিখিতে বসিল।

দাদা!

আপনাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া আবার পথে নামিলাম। আমি অকৃতজ্ঞ! তাই, বৃথা সৌজন্যের অভিনয়ে ক্ষমা চাহিলাম না!

ইহার পর কি লিখিবে তাহা ভাবিয়া পাইল না। কলমটা ওষ্ঠে স্থাপনা করিয়া স্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। পুনরায় লিখিল,

—কিন্তু এই বিদায় মুহূর্ত্তে মনটা বিষাদে পূর্ণ হইয়া যাইতেছে। ভাবিতেছি, সঙ্কল্প শেষ পর্য্যন্ত টিকিলে হয়।

দ্বারে করাঘাত হইল টক্ টক্ টক্।

—সোমনাথ!

ডাঃ লাহিড়ী! সোমনাথ সত্বর দ্বার খুলিয়া দিল। গম্ভীরভাবে চুরুট মুখে ডাক্তার গৃহে প্রবেশ করিয়া ইজি-চেয়ারে দেহটা ন্যস্ত করিয়া দিলেন, কহিলেন,—এত রাত্রে আলো জেলে এখনও জেগে রয়েছ! শরীর ভাল আছে ত সোমনাথ?

—হাঁ! ভালই আছি।

—তবে?

সোমনাথ একবার ইতস্ততঃ করিল, পরে সহজ ভাবেই বলিল,

—একখানা চিঠি লিখছিলুম।

—কা'কে?

সোমনাথ কোন উত্তর না করিয়া অসমাপ্ত পত্রখানা ডাক্তারের হস্তে অর্পণ করিল। ডাক্তার সেই পত্রখানায় একবার চোখ বুলাইয়া পরক্ষণেই মুদিত চক্ষে চুপ করিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেই মুদিত চক্ষের ভাষা পড়া সম্ভব না হইলেও তাঁহার কপালের শিরাগুলা মাঝে মাঝে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পরে ডাক্তার শান্ত স্বরে আহ্বান করিলেন—সোমনাথ!

—বলুন!

—আজ রাত্রির শেষে তুমি চলে যাবে। যাও, আমি বাধা দেব না। যে বাধা দেবে তার ঘুমের সুযোগে নিঃশব্দে তুমি আগ্রা পরিত্যাগ কর। কিন্তু যাবার আগে দু'একটা কথা শুনে যাও।

আমি জানি, হীরার ভয়ে তুমি পালাচ্ছ। স্বীকার করছি হীরা কতকটা অস্বাভাবিক। আরও জানি, আমার আচরণও অনেক সময় তোমার দুর্বোধ্য ঠেকেছে। কিন্তু তোমার ওপর আমার বিশ্বাস আর শ্রদ্ধা অসীম। তাই আশা করেছিলুম, হয়ত তোমার সংস্পর্শে ও স্বাভাবিক হয়ে আসবে। কিন্তু হীরাকে তুমি জানো না। হীরাকে তুমি চেনো না। যদি চিনতে, অন্ততঃ চেনবার চেষ্টা করতে তা হলে দেখতে, তোমার আশঙ্কা অমূলক। তবু তোমায় বাধা দেব না। তুমি রাত্রির শেষেই তোমার যাত্রা সুরু কর। কিন্তু ভুলোনা তুমি বৈজ্ঞানিক। তোমার একমাত্র পরিচয় তুমি বৈজ্ঞানিক! কক্ষচ্যুত গ্রহের মত তুমি একলোক থেকে অন্যলোকে ঘুরে পড়ে ভাবছ, এই বুঝি তোমার আশ্রয়। কিন্তু না সোমনাথ, এ তোমার ভুল। তুমি এখনও তোমার কক্ষে আশ্রয় লাভ করতে পারনি।

শোন সোমনাথ! সাধারণ পাঁচজনের মতই একদিন আমি হীরাকে এ সংসারে এনেছিলুম। সাধারণ পাঁচজনের মতই আমাদের স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক স্থাপনা করেছিলুম। সাধারণ পাঁচজনের মতই আমরা সুখী

ছিলুম। অবশ্য আজও আমাদের বাইরের পরিচয় এক সুখী দম্পতি ব্যতীত আর কিছুই নয়। আশা করি তুমিও একথা স্বীকার করবে।

এর পরের ঘটনা শোন। বিয়ের তিন বৎসর পরে ধীরা অন্তঃস্বত্বা হল, এবং অসময়ে এক মৃত সন্তান প্রসব করল। ধীরাও এমন অসুখে পড়ল যে তার জীবন সংশয় পীড়ায় একদিন আমরা সকলে তার আশা ছেড়ে দিলুম। তার সে সময়ের ফটো আমার কাছে আছে। বলিয়া ডাক্তার উঠিয়া গেলেন। ক্ষণপরে একখানি ফটো হাতে লইয়া পুনঃ প্রবেশ করিলেন, কহিলেন,— দেখ, এই সেই ধীরা।

সোমনাথ সবিস্ময়ে দেখিল এই সেই ধীরা! কতকগুলা কঙ্কালের সজ্জিত রূপ! লাবণ্যময়ী ধীরা যে একদিন বিগতশ্রী হইয়া এমন ভয়াবহ রূপ গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ভাবিতেও কেমন বিস্বাদ লাগে। ধরণীর শ্যামশোভা যেন একদিনে সকল শ্রী হারাইয়া রুক্ষ করুণ হইয়া উঠিয়াছে।

ডাক্তার বলিতে লাগিলেন,—হাঁ, এই সেই ধীরা! সে যাত্রায় ধীরা জীবন পেল। কিন্তু ডাক্তারেরা সকলে একমত হয়ে এই রায় দিলেন যে, এবার বাঁচলেও পুনরায় 'কনসিভ' করলে আর ওকে বাঁচান সম্ভব হবে না। বুঝতেই পারছ, আমি কি রকম চিন্তিত হয়ে পড়লুম। আমিও সাধারণ পাঁচজনের মতই ইন্দ্রিয় পরিচালিত মানুষ, কিন্তু আমিও ডাক্তার! গুরুত্বটা অনুভব করলুম, কিন্তু ধীরাকে তা জানানো সম্ভব হল না, কারণ মেয়েদের মা হবার সম্ভাবনা নষ্ট করতে সম্মতি আদায় করা সহজ নয়।

আমি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করলুম। একদিন চিন্তিত ভাবে একখানা কোষ্ঠির ফল নিয়ে ঘরে পায়চারী করতে লাগলুম। ধীরা ঘরে এসে আমায় ঐভাবে চিন্তিত দেখে কারণ জানিতে চাইল। আমি যেন ধরা পড়ে গেছি এইভাবে গোপন করতে চেষ্টা করলুম। ধীরা আমার অভিনয় ধরতে পারল না, জেদ ধরল কোষ্ঠির ফল জানতে। শেষে, যেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গে আমি তাকে বললুম, কোষ্ঠির ফল বুঝছ দ্বিতীয় সন্তান

ভূমিষ্ঠ হবার তিন মাসের মধ্যে আমি আততায়ীর হাতে নিহত হবো। ধীরা বহুক্ষণ স্থির থেকে বলল,—এর কি কোন প্রতিকার নেই? কোন যাগ, যজ্ঞ কিম্বা……আমি মাথা নেড়ে বললুম, না, শাস্ত্র মতে কোন উপায় নেই, কিন্তু বৈজ্ঞানিক মতে আছে।

ধীরা অধীরকণ্ঠে প্রশ্ন করল,—কি উপায়?

আমি বললুম,—অপারেশন!

ধীরা আবার স্তব্ধ হয়ে বসে রইল, কিন্তু শেষে মত দিল। তারপর হস্পিটাল থেকে ফিরে এসে ও একদিকে যেমন স্বাস্থ্যশ্রীতে অনবদ্য হয়ে উঠতে লাগল, অন্যদিকে তেমনি আমায় এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করতে লাগল। দেখলুম, দিনের ধীরা আর রাতের ধীরা যেন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে পড়ছে। ওর বাড়তে লাগল শুচিতা, ধ্যান ধারণা। কোথা থেকে আবার এই সময় এক গুরুও এসে জুটলেন। চলল হবিষ্যায়, চলল কত কি আচার বিচার। গুরু চলে গেলেন, কিন্তু রেখে গেলেন ধীরার উপর তাঁর অসামান্য প্রভাব। দিনের উচ্ছলতার পাশে ওর রাতের ধ্যান-গম্ভীর জ্যোতির্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনাও করতে পারা যায় না। বিশ্বাস কর, আজ সাত বৎসর আমি ধীরাকে রাতে স্পর্শ করিনি। জৈবীত্বের কঠিন আবরণে নিজেকে আড়াল রেখে ও বহুদূর সরে গেছে।

ওর 'ফিলসফি অফ লভ' আমি বুঝিনা, বুঝতে উৎসাহ পাই না; তবে আমার মনে হয়, লভ এর চেয়ে তার ফিলসফি ওর কাছে বড় হয়ে ওকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে।

সোমনাথের মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল একটা শব্দ,—কী ট্র্যাজেডী!

ডাক্তার বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—এটা এখন বর্ণনাতেই আছে, এবার সাক্ষাতে দেখবে এস। ঘড়িতে ঢঙ্ করিয়া একটা বাজিল। ডাক্তার বলিলেন,—এস, আর দেরী কোরো না। ওর আসের সময় হোলো।

সোমনাথ বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,—এত রাত্রে স্নান?

—হাঁ স্নান। কিন্তু আর দেরী কোরো না, এস। বলিয়া ডাক্তার সোমনাথের হাত ধরিয়া তাহাকে একপ্রকার টানিয়া লইয়া চলিলেন।

ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করিয়া সোমনাথ দেখিল পাশাপাশি দুইখানি ঘর। মাঝে মাত্র একটি দরজা। দরজার একস্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার কাচ বসান। ডাক্তার ইঙ্গিতে সোমনাথকে অপর কক্ষে দৃষ্টিপাত করিতে বলিলেন। সোমনাথ একবার ইতস্ততঃ করিয়া ডাক্তারের অনুরোধ পালন করিল।

মীরা শুচিস্নাতা হইয়া একখানি শুভ্র পট্টবস্ত্র পরিয়া আসনে বসিয়া আছে। স্বচ্ছ বিদ্যুৎ-আলোকে মুখখানি সত্যই যেন অপার্থিব হইয়া দীপ্তি পাইতেছে। শুভ্রতা এবং পবিত্রতা মাখা এমন একখানি মুখ সে বুঝি এই প্রথম দেখিল।

মীরার নেত্র মুদিত। সে আপন মনে কি বলিতেছে। অত্যন্ত অস্পষ্ট সে শব্দ। কেবল ওষ্ঠ দুটি দ্রুত সঞ্চালিত হইতেছে। বোধ হয়, কোন মন্ত্র পাঠ করিতেছে। অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ সে একই ভাবে একই আসনে স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। পরে মুদিতনেত্রেই এবার যেন সে প্রার্থনা জানাইতে লাগিল। এবার স্বর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। সোমনাথ সন্তর্পণে কান পাতিয়া শব্দগুলি ধরিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

—ঠাকুর! কতদিন, কতদিন আমায় এভাবে আর বঞ্চিত রাখবে? তুমি যে রইলে আজও অন্তরালে, স্বামী রইল তেমনই নিদ্রিত আত্মায় অচেতন, আর আমি রইলুম শবরীর বিনিদ্র প্রতীক্ষায়!

ভালবাসা আমার জীবনে এল না। ভালবাসতে আমি কাউকে পারলুম না। ভালবাসার অভিনয় করতে গিয়ে শুধু জ্বলে মলুম। যে দিন জানলুম, স্বামীকে আমি ভালবাসি না অথচ দীর্ঘদিন ধরে একই শয্যায় তার সঙ্গে ভালবাসার অভিনয় করে এসেছি, সে দিন কী যন্ত্রণাই না পেলুম।

যখন জানলুম সন্তান আর আসবে না, নিষ্ঠুর হাতে তার আবির্ভাব-সম্ভাবনা নষ্ট করে আমার স্নেহের স্রোত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, তখনও বুঝতে পারিনি ভালবাসা আমায় এমন করে প্রতারিত করছে।

ঠাকুর! আমি নিত্য প্রার্থনা করেছি সেই ভালবাসা, যে ভালবাসা নিত্য নতুন হয়ে অসীম শান্তি আর উৎসাহে হৃদয়কে তরঙ্গিত করে তোলে। চেয়েছিলুম সেই ভালবাসা যে ভালবাসা আমায় নব নব প্রেরণা, আর যে প্রেরণা সকল দুঃখকে জয় করবার দেয় ঐশী শক্তি! কিন্তু আত্মা যদি না জাগে, তবে ব্যর্থ আশায় দিন গোনাতেই যে তার পরিসমাপ্তি হয় ঠাকুর!

সে দিন সোমনাথের নির্মল আত্মায় দেখলুম সেই আলোক। আশা হোলো, সেই বিচ্ছুরিত আলোকে বুঝি আমার পথ দেখতে পাবো, সার্থক হয়ে উঠবে আমার জীবন। হায়! সূর্য্যের আলো সমগ্র পৃথিবীকে একই সঙ্গে আলোকিত করে না, তাই অর্দ্ধ পৃথিবী যখন কল-কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠে, অপর অর্দ্ধ তখন থাকে গভীর নিদ্রায় অচেতন।

সোমনাথের আলো বিচ্ছুরিত হোলো সুপ্রিয়ার বুকে। ধীরার অংশ রইল অন্ধকারে! তাই সোমনাথ শত আহ্বানেও জাগল না। উদয় গিরির শীর্ষ চূড়ায় তাই যখন দেখা দিল প্রভাত সূর্য্যের উদার অভ্যুদয়, অস্তগিরির আকাশ রইলো তখন তেমনই অমান্ধকারে আবৃত!

ঠাকুর! এ জীবন যদি আলোকের স্পর্শ না পেলো, তবে তাকে যত শীঘ্র পারো তোমার কোলে টেনে নাও। হে চির সুন্দর! আমাকে মিথ্যার বন্ধন থেকে মুক্তি দাও, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!

ধীরা লুটাইয়া পড়িয়া আকুলভাবে কাঁদিতে লাগিল। সে ক্রন্দনে কক্ষটাও যেন করুণ হইয়া উঠিল। সোমনাথের মনে হইল, কক্ষকে অতিক্রম করিয়া সেই কাতর ক্রন্দন যেন সকল গিরিদরি উপত্যকা অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে, ঊর্দ্ধে, অতি ঊর্দ্ধে উঠিয়া ধীরার চির সুন্দরের পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল।

গ্রামের গোপনন্দিনী বিজলী ত্রয়োদশবর্ষীয়া কিশোরী। নিও
লইয়া আসিত সে শান্তিপ্রিয়র কুটিরে। কেমন করিয়া কখন যেন
কিশোরী এই শিশুটিকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। যে ভালব
হিসাব জানে না, যে বয়সও হিসাব কষিতে অভ্যস্ত হয় নাই, সেই ব
এই কিশোরী সেই ভালবাসার বন্ধনে বাঁধা পড়িয়া মেয়েটিকে একেব
কোলে করিয়া বাড়ী ফিরিল, কহিল,—মা, অপি আজ থেকে আমা
বাড়ীতেই থাকবে। চেয়ে দেখ মা, কি সুন্দর মেয়েটা! যেমন র
তেমনই চোখ, তেমনই চুল!

গোপজায়া কাদম্বিনী কন্যার প্রতি স্নেহ-দৃষ্টি মেলিয়া কহিল,

—তা থাক্!

সন্ধ্যার পর রামু ঘোষ সব শুনিয়া দু-চার কথার পর বলিল,

—তা থাক্, তবে বামুনের মেয়ে!

কাদম্বিনী কহিল,

—শিশুর আবার জাত কি?

—কিন্তু চিরকালই ত ও শিশু থাকবে না!

—চিরকালের ভাবনা তোমায় ভাবতে হবে না। সে ঠাকুর যা করে
তাই হবে।

—সেই ভালো।

মীমাংসা হইয়া গেল। ওদিকে চণ্ডীমণ্ডপে তখন পাড়ার প্রবীণেরা এ
গভীর সমস্যা লইয়া তুমুল তর্ক চালাইতেছেন। কিন্তু সভায় সমস্
সমস্যাই রহিয়া গেল, কোন সমাধানআর হইল না। গভীর রাত্রে কি
সমাধানেই সেদিন সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন!

নন্দিনী নামটা কি অর্থে গ্রাম ব্যবহৃত হয় তাহার সঠিক মীমাংসা
আজিও হয়ত হয় নাই! নয়নানন্দদায়িনী বা আনন্দের নন্দনলোকবাসিনী

যে অর্থেই গ্রহণ করা হউক না কেন, বাঙ্গালীর ঘরে কন্যাপ্রীতির আতিশয্য যে [illegible] তাহাতে সন্দেহ নাই। মাতৃস্নেহে সত্যই সে নয়নানন্দদায়িনী! কিন্তু সকল নন্দিনীই যে সকলের নয়নানন্দবর্দ্ধিনী হইবে তাহা বলিলে সত্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখা হয় না। তথাপি এক একটা লাবণ্যময়ী মেয়ে এমন এক সহজাত সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা লইয়া জন্মগ্রহণ করে যে শুধু সংস্কারের শঙ্কায় তাহাকে দূরে সরাইয়া রাখাও সব সময় সম্ভব হইয়া উঠে না।

অপি সত্যই নন্দিনী। তাই, তাহাকেও শুধু সংস্কারের শঙ্কায় দূরে সরাইয়া রাখা সম্ভব হইল না! অপি যেন আনন্দের ঝর্ণা! তাহার কলহাস্য মুখর করিয়া তুলে সারা পাড়াটা। তাহার সুকুমার নধর দেহবল্লরীর অন্তরালে যেন একটা উদ্দাম আনন্দের অনাবিল স্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলে। বালবৃদ্ধ, কিশোর কিশোরী, নরনারী নির্বিশেষে তাই অপিকে নাচাইয়া, হাসাইয়া, চুম্বনপ্লাবিত করিয়া আস্বাদন করে এক অনাস্বাদিত মাধুর্য্য! ৮

দেখিতে দেখিতে অপি পঞ্চম বর্ষ অতিক্রম করিয়া চলে। তাহার চঞ্চলতায় সারা পাড়াটা সর্ব্বদা সজাগ হইয়া উঠে। সকলেই সন্ত্রস্ত! কখন যে কাহার ঘরে তাহার আবির্ভাব ঘটিবে, কখন যে সে কাহার কি অনিষ্ট করিয়া বসিবে তাহার স্থিরতা নাই। সমবয়সী ছেলেমেয়েরা তাহার সহিত প্রতিযোগীতায় পারিয়া উঠে না। অলক্ষ্যে তাহাদের মায়েরা ঈর্ষা বিমিশ্র-কণ্ঠে কহে—বাপ মা খেয়ে মেয়ে যেন লোহার ভাঁটা হয়ে উঠেছে!

সময়ে সময়ে গোপজায়াকে দুই চারি কথা যে না শুনিতে হয় তাহা নহে। উপায় নাই। সর্ব্বদার জন্য ওই দুরন্ত শিশুকে নির্দ্দিষ্ট সীমানায় সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নহে। তাহা হউক! গোপজায়া বিনা প্রতিবাদে অপরের তিক্ত মধুর মন্তব্য নীরবে মাথা পাতিয়া লয়। মাঝে মাঝে অত্যন্ত অসহ্য হইলে মৃদু প্রতিবাদ করিয়া বলে—অভাগীর বাপ, মা নেই—ও অবোধ শিশু বা!

একদিন সাহেব-বেশী এক প্রৌঢ় ভদ্রলোকের আবির্ভাবে গ্রামে নূতন উত্তেজনা জাগিল। অপির কোথাও যে কেহ আত্মীয় বলিতে জগতে বর্ত্তমান থাকিতে পারে তাহা গ্রামের লোক যেন এক রকম ভুলিয়াই গিয়াছিল। তাই, সেই অপির আত্মীয় আবির্ভাবে একদিকে যেমন বিস্ময়ের অবধি রহিল না, অপর দিকে তেমনই এই সম্মানিত ব্যক্তিটির পরিচয় জানিবার অদম্য কৌতূহলেরও সীমা রহিল না! শান্ত সৌম্য ভদ্রলোকটি সত্যই স্বল্পভাষী! তিনি সংক্ষেপে শুধু ইহাই জানাইয়া দিলেন যে তিনি অপির দূর সম্পর্কীয় মাতুল। ভগ্নির মৃত্যুসংবাদ জানিয়া অপিকে লইতে আসিয়াছেন। তিনি নিজে বিস্তৃত আত্মপরিচয় প্রদান না করিলেও রটনাপটু গ্রামবাসীরা তাহাদের স্ব-কপোল কল্পিত পরিচয় রটনা করিতে ইতস্ততঃ করিল না। কেহ বলিল, ব্যারিষ্টার! কেহ বলিল—ডাক্তার! কেহ বলিল, উঁহু নামজাদা কণ্ট্রাক্টর, টাকার কুমীর! কলকাতায় সতের খানা বাড়ী! আরে আমার ভগ্নিপতির বেয়াই যে ওর অফিসে কাজ করে! ইত্যাদি ইত্যাদি।

যাহা হউক এদিকে মূল সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইল অপির যাওয়া লইয়া। প্রথমতঃ এক অপরিচিত ব্যক্তিকে একদিনে মাতুল জ্ঞানে নির্ব্বিবাদে তাহার সহিত গ্রাম ত্যাগ করা অপির পক্ষেও যেমন অসম্ভব, অপর পক্ষে বিজলী ও তাহার মাতার এতদিনের স্নেহবন্ধনকে শুধু আত্মীয়তার দাবীতে ছিন্ন করিতে যাওয়াও তেমনই অসম্ভব! বিজলীর মাতা ত স্পষ্টই বলিয়া দিল যে অপিকে ছিনিয়া লইয়া যাইলে অপিও বাঁচিবে না, সেও বাঁচিবে না!

ভদ্রলোক স্থিরভাবে মন্তব্যগুলি বিনা প্রতিবাদে শুনিলেন, মৃদু হাস্য-সহকারে অপিকে আদর করিলেন, কয়েকটা চকোলেট দিলেন এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই দুরন্ত মেয়েটাকে বশ করিয়া ফেলিলেন। সে দিন তিনি অপিকে লইয়া যাইবার আর নামও করিলেন না। বিনা বাক্যব্যয়েই গ্রাম পরিত্যাগ করিলেন।

গভীর রাত্রে ঘুমন্ত অপিকে বুকে জড়াইয়া গোপনআয়া কাঁদিয়া ভাসাইল। বার বার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জানাইল,—আমার অপিকে আমার কাছ থেকে দূরে নিয়ে যেওনা ঠাকুর! আমি যে ওর মা!

মা, সত্যই সে অপির মা! সে মাতৃস্নেহে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য ছিল না। সেই নীরন্ধ্র মাতৃস্নেহে ইঙ্গিত করিবার মত অবসর কোথাও ছিল না। তথাপি......

তথাপি অপিকে একদিন সেই দূর সম্পর্কীয় মাতুলের তত্ত্বাবধানে থাকিবার উদ্দেশ্যে এ গ্রাম ত্যাগ করিতেই হইল।

মাতুল মাসে একবার দুইবার করিয়া আসিতেন। প্রতিবারই প্রচুর উপহারাদি লইয়া আসিতেন। তাঁহার আলাপ আলোচনা যাহা কিছু সেই গোপি পরিবারেই নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার প্রতি বিজলী ও তাহার মায়ের বিরূপভাব ক্রমশঃ কমিয়া আসিতে লাগিল। তিনি তাহাদের বুঝাইলেন, অপিকে ভালবাসার অর্থ অপির ভবিষ্যৎ জীবনকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করা নহে। অপির অভাবে তাহারা যে বেদনা পাইবে তাহা তিনিও উপলব্ধি করিতেছেন, কিন্তু ইহা ত স্বার্থপরতা! অপির ভবিষ্যৎ......

হাঁ, অপির ভবিষ্যৎ! কিন্তু এদিকে তাহাদের বর্ত্তমানও যে অন্ধকারময়। যুক্তি দিয়া কি অন্তরকে অস্বীকার করা যায়! অপিকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেই যে মায়ের অন্তরের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় টন্ টন্ করিয়া উঠে। তথাপি ভবিষ্যৎ! মত দিতেই হইল। স্থির হইল, তিনি মাঝে মাঝে অপিকে লইয়া তাহার মাকে দেখাইয়া যাইবেন।

গ্রামের সঙ্কীর্ণ পথ বাহিয়া, গোয়ালের পাশ দিয়া, চণ্ডীমণ্ডপের ধার দিয়া অপি তাহার মাতৃক্রোড়ে চলিয়াছে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ এক নূতন পরিবেশের মাঝে!

ক্রন্দনরতা বিজলী ও তাহার মাকে সান্ত্বনা দিতে আসিয়াছিল অনেকেই! এই আনন্দময়ী মেয়েটিকে বিদায় দিতে সত্যই সকলের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল।

স্টেশনটি সামান্য দূরে। বিজলীদের বাটি। কিন্তু লাইনের পার্শ্বেই।
ট্রেন আসিয়া পড়িল। বিজলী ও তাহার মাতা অশ্রুসজল সতৃষ্ণ দৃষ্টি মেলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ধাবমান ট্রেনের জানালায় একখানি কচিমুখ ভাসিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মা!

'অপি!' করুণ অসহায় আর্তনাদ কঠিন লৌহদানবের গতিকে অতিক্রম করিয়া দূর প্রান্তরের বুকে আছাড় খাইয়া পড়িল।

•

সায়ান্স কলেজে অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য কোন একটি বিশেষ গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। আত্ম-সমাহিত সদানন্দময় এই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের পাত্র। বিশেষতঃ ছাত্রমহলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়। অকৃতদার এই নিরীহ মানুষটির যে কোথাও কেহ আত্মীয় আছে, তাহা কেহই জানিত না। তাই সহসা একদিন অপিকে তাঁহার বাসায় দেখিয়া ও তাঁহার ভাগিনেয়ী জানিয়া বন্ধু ও ছাত্র মহলে বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না। ছাত্রগণ এক প্রকার তাঁহার অজ্ঞাতসারে একদিন তাঁহারই গৃহে প্রচুর আহার্য্য বস্তু আমদানি করিয়া ভূরিভোজনের আয়োজন করিল এবং সেই সঙ্গে অপিকে প্রচুর উপহার ও আদর দিয়া কাঁদাইয়া ভাসাইল। নিরীহ অধ্যাপক স্মিতহাস্যে মাঝে মাঝে ব্যর্থ প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলিতে লাগিলেন—এসব কি ছেলে মানুষী! মানে, এ একেবারেই ছেলে মানুষী!

আসল কথা এই ভগ্নিটির কথা অধ্যাপকের যে একান্ত অগোচর ছিল তাহা নহে, কিন্তু দূর পল্লী গ্রামে যখন নিরীহ শান্ত দম্পতি সুখে স্বচ্ছন্দে গার্হস্থ্যসুখ উপভোগ করিতেছে, তখন সেখানে গিয়া তাহাদের শান্তি ভঙ্গ করতঃ মৌখিক আদর আপ্যায়নের যে কোন প্রয়োজন আছে তাহা তিনি ভাবিতেন না। ও পক্ষেও অবশ্য তাঁহাকে কোন দিন

বিশেষভাবে আহ্বান করা হয় নাই বা সেরূপ সুযোগও ঘটে নাই। এই ভাবেই উভয় পক্ষের যোগাযোগ এক প্রকার নষ্টই হইয়া গিয়াছিল। তাই, দীর্ঘ দিন পরে অধ্যাপক যখন শুনিলেন যে তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি উভয়েই একটি শিশু কন্যা রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তাঁহার কর্তব্য বুদ্ধি তাঁহাকে এ গ্রামে টানিয়া আনিল।

অধ্যাপনা কার্য্যে তাঁহার যথেষ্ট সুনাম থাকিলেও শিশু-পালন বিদ্যায় যে তিনি একান্তই শিশু তাহা তিনি প্রথম দিনই উপলব্ধি করিলেন। শিশু-মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা না থাকায় শিশুর অনুরাগ, বিরাগ, মান অভিমান, বাসনা বিতৃষ্ণা, ক্ষুধা তৃষ্ণার পার্থক্য নির্দ্দেশে অসমর্থ হইয়া নিজেকে তিনি একান্ত অসহায় বিবেচনা করিলেন।

অগত্যার অধ্যাপক বাধ্য হইয়া পর দিনই অপির জন্য একটি শিক্ষিতা গভর্ণেস নিযুক্ত করিলেন ও সাময়িকভাবে সমস্যার সমাধান করিতে পারিয়াছেন ভাবিয়া শান্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। যদিও একবার তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে, শিশুমনস্তত্ত্বমূলক পুস্তকরাজির মধ্য দিয়া ইহার একটা সুষ্ঠু মীমাংসায় উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন, তথাপি অপির চব্বিশ ঘণ্টার দুরন্তপনা তাঁহাকে এই পরীক্ষামূলক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে বিন্দুমাত্র উৎসাহ দান করিল না।

অধ্যাপক আবার গবেষণা কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার আবাসেও একটি ক্ষুদ্র ল্যাবোরেটরী ছিল। সকালের দিকটা তাঁহার এই ল্যাবোরেটরীতেই অতিবাহিত হইত।

দেখিতে দেখিতে সাত সাতটা বৎসর যে কোথা দিয়া কেমন করিয়া অতিক্রম করিয়া গেল, তাহা আত্মসমাহিত অধ্যাপকের খেয়াল ছিল না। একদিন বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া চায়ের টেবিলে উপস্থিত হইলে গভর্ণেস কুন্তলাদেবী জানাইয়া দিলেন, অপর্ণা পড়া-শুনায় অত্যন্ত অমনোযোগী হইয়া উঠিয়াছে। ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে অন্যান্য বালিকাদের

তার তাহার উন্নতি হইতেছে না। অধ্যাপক গম্ভীর মুখে কহিলেন,
—ওয়ার্থলেস!

কুন্তলাদেবী ভাবিয়া পাইলেন না, ওই 'ওয়ার্থলেস' শব্দটা কাহাকে উদ্দেশ করিয়া উচ্চারিত হইল! তাই, দ্বিতীয় মন্তব্যের আশঙ্কায় উন্মুখ হইয়া তাকাইয়া রহিলেন! অধ্যাপক পরম স্নেহে অপর্ণার মাথায় হাত রাখিয়া অতি কোমল কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,

—মন দিয়ে পড়াশুনা করছ না কেন মা?

—ভালো লাগে না মামাবাবু!

—কেন ভালো লাগে না মা—পড়া শক্ত লাগে?

—না, ক্লাসের মেয়েরা সব অসভ্য!

অসভ্য! কী উহার অভিযোগ! অধ্যাপক চিন্তিতভাবে কুন্তলাদেবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। কুন্তলাদেবী কেমন যেন অপ্রস্তুতভাবে দৃষ্টি নত করিলেন। অধ্যাপক ধীরে ধীরে বলিলেন—বেশ, কাল থেকে তোমার স্কুলে যেতে হবে না মা! তুমি বাড়ীতেই পড়ো।

অপর্ণা বাড়ীতেই পড়িতে লাগিল। উন্নতি যে বিশেষ কিছু হইল তাহা কুন্তলাদেবী বুঝিতে পারিলেন না, কিন্তু দ্বিতীয়বার অভিযোগ করিবার মত সাহসও তাঁহার হইল না।

অপর্ণা পড়াশুনাপেক্ষা এবার গৃহকর্ম্মে মন দিল বেশী। নারীর সহজাত সংস্কারে তাহার মন সহজেই সাড়া দিল। ঘর দ্বার পরিষ্কার করিয়া, বার বার সাজাইয়া গুছাইয়া, পুষ্পোদ্যানের সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিয়া, রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিয়া সে যথেষ্ট তৃপ্তি পাইল এবং সেই অবসরেই পাচিকা হইতে ভৃত্য পর্য্যন্ত সকলকেই তাহার সতর্ক প্রহরায় অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। বিশেষতঃ, যখন সে গম্ভীরভাবে গ্রীবা আন্দোলন করিয়া বিজ্ঞজনোচিত উপদেশ প্রদান করিত তখন যেন তাহাদের তাহা আরও অসহ্য হইয়া উঠিত! সে বলিত—বামুন মা! মামাবাবু সন্নিসি মানুষ

বলে কি তোমরা তাঁকে যা' তা খাওয়াবে? এ রান্না যে কুকুরেও খেতে পারে না।

প্রত্যুত্তরে বামুন মা বলিত—আমরা এখন বুড়ী-সুড়ী হ'য়েছি মা! বেশত, তুমিই একদিন ভালো করে রেঁধে তোমার মামাবাবুকে খাওয়াও না!

অপর্ণা বলিত—আমার হাতের রান্না খেলে তার পরদিন আর তোমার চাকরী থাক্‌বে না। তার চেয়ে বরং চেষ্টা করে আর একটু মন দিয়ে ভালো করে রাঁধো।' বলিয়াই আর দাঁড়াইত না। বুড়ী অন্তরে জ্বলিতে থাকিলেও মুখে কিছু বলিতে সাহস পাইত না, কারণ সকলেই জানিত ওই ছোট মেয়েটির শাসনের বিরুদ্ধে প্রবীণ অধ্যাপকের নিকট কোন অভিযোগই আমল পাইবে না।

বাড়ীর লিচু গাছটার প্রতি অপর্ণার আকর্ষণ ছিল অস্বাভাবিক! সময়ে অসময়ে ওই লিচু গাছটায় চড়িয়া সে যে কী শান্তি পাইত তাহা সেই জানে। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপে যখন সকলে রুদ্ধ কক্ষে পানীয়ের পর পানীয় উদরসাৎ করিয়াও তৃপ্তি পাইতেছে না, তখনও অপর্ণা সেই লিচু গাছটায় বসিয়া পা দোলাইতে দোলাইতে লেলিহ-জিহ্ব তাহার প্রিয় খানদান ডিগ্‌ডিগ্‌কে কত কি গল্প শুনাইতেছে! প্রাণচঞ্চলা অপর্ণা!

পরিপূর্ণ নর বা নারী এ সংসারে দুর্লভ! তাই, মনের দিক দিয়া একটি পুরুষ তাহার সমগ্র পৌরুষাভিমান সত্ত্বেও অংশতঃ নারী, আবার একটি নারীও তাহার পরিপূর্ণ নারীত্বের অভিমান সত্ত্বেও অংশতঃ পুরুষ। যদিও এই সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সব সময় সাধারণ মানব মনের অগোচরে বা অলক্ষ্যেই অবস্থান করে, তথাপি কিন্তু একথা এই সত্য

পরিপূর্ণ রূপ গ্রহণ করিয়াই ভারতীয় সংস্কৃতির ধ্যানে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সেই কারণেই অর্দ্ধ নারীশ্বরের পূজা জগতের অন্যত্র কোথাও প্রচলিত না থাকিলেও ভারতীয় সাধন পর্য্যায়ে ইহা সম্মানের সহিতই আসন লাভ করিয়াছিল।

ত্রয়োদশী অপর্ণার নারীত্বের বিকাশ হইতে হয়ত তখনও কিছু বিলম্ব ছিল। কিন্তু দেহে বালিকা হইলেও মনোজগতের কোন কোন ক্ষেত্রে সে একটি দুষ্টু বালকেরই অভিনয় করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ করিত। অনবদ্য স্বাস্থ্যশ্রীতে উজ্জ্বল, কমনীয়কান্তি এই বালিকার বালসুলভ, চপলতা তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যকে যেন আরও মনোহারিনী আরও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিল।

অপয়া অপি এখন দুরন্ত অপর্ণা! একদিনের কথা। গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে ডিগডিগকে পদনিম্নে রাখিয়া সে সেই প্রিয় লিচু গাছটায় বসিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে! তাহার নামিবার সময় হইয়াছে। তাহার নামিবার একটি বিশেষ ভঙ্গি আছে। সর্বনিম্ন শাখায় পদস্থাপনার পূর্ব্বে সে দ্বিতীয় শাখাটি ধরিয়া বার কয়েক দোল খাইবে, পরে শেষ শাখায় ভর দিয়া ডিগ্‌ডিগের সামনে লাফাইয়া পড়িবে! ডিগ্‌ডিগ্‌ তাহাকে সম্বর্দ্ধনা জানাইবে ভৌ-ভক্! সেদিনও সে যথারীতি পর্য্যায়ক্রম বজায় রাখিয়া ভূমি স্পর্শ করিতেই দেখিতে পাইল একটি তরুণ ডিগ্‌ডিগের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে!

—খুকী! প্রফেসর কি বাড়ী আছেন?

খুকী! অসভ্য! অপর্ণার আপাদ-মস্তক জ্বলিয়া গেল। প্রথমটা রীতিমত অপ্রস্তুত বোধ করিলেও এই সম্বোধনে তাহার জড়তা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। সে যথোচিত গাম্ভীর্য্যের সহিত উত্তর করিল—হয়ত আছেন, কিন্তু আমি জানি না। বলিয়াই তরুণের কুঞ্চিত কেশ শোভিত সুন্দর মুখখানির প্রতি তাকাইয়া দেখিল। দীর্ঘ ঋজু সুঠাম শোভন

কান্তি তরুণ! অপর্ণার বিরাগ আঘাত খাইয়া ফিরিয়া আসিল। তরুণ তেমনই কৌতুকোজ্জ্বল কণ্ঠে কহিল,

—কিন্তু তিনি নিশ্চয় আছেন কি না এইটেই আমি নিশ্চিত ভাবে জানতে চাই।

—তাহ'লে আমার নিশ্চিত ভাবেই আপনাকে তাঁর ঘরে নিয়ে যেতে হবে। আসুন আমার সঙ্গে। জেনে রাখুন, আমার নাম খুকী নয়—অপর্ণা। অপর্ণা মুখার্জ্জি।

—দেখছি ভেতরে ভেতরে আমার ওপর বেশ কিছু রেগেছ! আমি আমার দোষ স্বীকার করছি। স্বীকার না করে উপায় নেই, কারণ এখন থেকে প্রায় প্রত্যহই তোমাদের বাড়ী আসতে হবে। একদিনের ঝগড়া ঝেড়ে ফেলা যায়, কিন্তু প্রতিদিনের ঝগড়া নিয়ে একসঙ্গে চলা অসম্ভব!

—আপনি রোজ আস্‌বেন?

স্বরে আগ্রহ যেন উদগ্র হইয়া উঠিল।

—অন্ততঃ প্রফেসরের তাইত আদেশ!

—তাঁর আদেশ আপনি মানবেন কেন?

—গুরুকে মানবনা ত তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করলাম কেন?

তরুণের যুক্তি অপর্ণার অত্যন্ত ভাল লাগিল। তাহার বচনমাধুর্য্যে সে যেন একটা আনন্দের উৎস আবিষ্কার করিল। অপর্ণা কহিল,

—একবার স্বীকার করে আর অস্বীকার করা যায় না, না?

—মানুষ বলে পরিচয় দিতে হলে যায় না!

—যারা অমানুষ!

—তাদের পরিচয় নেবার দুর্ভাগ্য যেন তোমার না হয় অপর্ণা!

সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বরের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া অপর্ণা বিস্মিত হইয়া গেল। একটা মানুষের স্বরে একই সঙ্গে আনন্দ ও বেদনার এমন

পরিপূর্ণ পরিবর্তন সম্ভব। মাত্র ত্রয়োদশী বালিকা সে। তাহার পক্ষে এত বিশ্লেষণ সম্ভব নহে। অপর্ণা অন্যমনস্ক হইয়া গেল।

—মামাবাবু!

—এস মা!

প্রফেসর একাকী থাকিলে প্রায় ধ্যানমগ্ন অবস্থায় থাকেন। সেই স্তব্ধ মৌন মূর্ত্তিকে অপর্ণা শ্রদ্ধা করে, ভয় করে। তাই রুদ্ধদ্বার কক্ষে প্রবেশের পূর্ব্বে সে সাড়া না দিয়া আসে না। উভয়ে প্রবেশ করিতেই প্রফেসর সোল্লাসে আসন পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন—এই যে অরুণ এসে গেছ! ভাবলুম, ছুটির দিনে হয়ত আজ তুমি আসবে না!

—শুভকাযে একটা দিনও বিলম্ব করা বুদ্ধিমানের কায নয় স্যর!

—অর্থাৎ আপনার ছাত্রটি যে একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি সেইটেই বেশ করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন মামাবাবু!

—অরুণ! অপর্ণা আমার বয়সে ছোট হ'লেও কথায় কম নয়! ও এই বয়সে এমন সব ভারী ভারী কথা বলে যে, মাঝে মাঝে আমিই ভুলে যাই যে ও আমার সত্যিকার মা নয়! এখানে নিত্য যাওয়া আসা করতে হ'লে ওর দু'চারটে কঠিন মন্তব্য হজম না করে উপায় নেই। কিন্তু জেনে রেখো, ওর হাত খুব মিষ্টি! চা'য়ে চিনির মাত্রায় ওর কখনও ভুল হয় না।

—ওই যাঃ! তোমার চায়ের সময় হ'ল যে মামাবাবু! যাই, দু কাপ চা নিয়ে আসি। চপলা অপর্ণা মুহূর্ত্তে আত্মগোপন করিল!

অরুণ আচার্য্য। এম্, এস্, সি, তে রসায়নশাস্ত্রে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাকার্য্যে নিযুক্ত আছে। একুশ বৎসর বয়স্ক প্রতিভাদীপ্ত এই তরুণটি অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যের বিশেষ স্নেহের পাত্র। ব্যক্তিগত গবেষণায় তাহার সাহচর্য্য লাভের প্রস্তাব করিলে অরুণ সানন্দে

সম্মতি দিয়াছে। আগ্রহ উভয় পক্ষেই কাহারও কম নহে। প্রথম দিনেই কায আরম্ভ হইয়া গেল।

অপর্ণা আবিষ্কার করিল, অরুণ যে পরিমাণে অধ্যবসায়ী সেই পরিমাণেই চা-পিপাসু। ফলে, সময়ে অসময়ে নিঃশব্দ-পদ-চারিণীর ভূমিকায় তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল গবেষণাগারে! সে নিঃশব্দেই আসে, নিঃশব্দেই চায়ের পেয়ালা নামাইয়া চলিয়া যায়। প্রবীণ ও নবীন গবেষকদ্বয় হয়ত তখন কোনও গভীর তত্ব চিন্তায় নিমগ্ন। অপর্ণা স্বল্পকাল পরে পুনরায় প্রবেশ করে, দেখে, পানীয় শীতল হইয়া গিয়াছে। পুনরায় পেয়ালা পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। এমন দিন গিয়াছে, যেদিন উপর্যুপরি তিন তিনবার পেয়ালা পরিবর্ত্তন করিয়াও সে অরুণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই, আবার কোন কোন দিন প্রতিবারেই অরুণ স্মিতহাস্যে তাহার হস্ত হইতে পেয়ালা গ্রহণ করিয়াছে। গবেষণাগারে বাক্যালাপ বন্ধ। তাই কচিৎ কখনও 'বাঃ, খাসা হয়েছে' এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যটুকু ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না।

কখনও কখনও স্বল্প পরিচয়ের অবদানও অন্তরে জাগ্রত করে এক অনাস্বাদিত চেতনা! এই সূক্ষ্ম আধ-জাগরিত চেতনায় অপর্ণাও বুঝি নীরবে গোপনে ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল! যে অরুণকে সে নিত্য-সাহচর্য্যের মাঝে লাভ করে, সে অরুণাপেক্ষা বুঝি তাহার অনুভবগ্রাহ্য অরুণকে সে বেশী ভালবাসে! তাই সময়ে সময়ে একাকী অলক্ষ্যে অরুণের স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য সে পান করে। অরুণের স্বল্পভাষণ বুঝি তাহাকে অপর্ণার নিকট আরও রমণীয় আরও আকর্ষণী করিয়া তুলে।

এদিকে বৈজ্ঞানিক অরুণেরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখা দিতেছিল। আজকাল সে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই গবেষণাগারে প্রবেশ করে! অপর্ণাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চায়ের পেয়ালা হস্তে প্রবেশ করিয়া স্মিতহাস্যে বলে,

—দাদাবাবুর আসতে এখনও দেরী আছে!

—তোমার আসতে কিন্তু দেরী হয় নি!

অপর্ণা সহসা উত্তর দিতে পারে না! অতি সাধারণ প্রতি-উত্তর দিতে গিয়া কোথায় একটা সঙ্কোচ, একটা দুর্ব্বলতা আসিয়া তাহাকে মৌন মূক করিয়া দেয়। অরুণের আগমন-উন্মুখ সদাজাগ্রত মনের উদ্ঘাটন! অরুণ তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া বিস্মিত হয়। যেন নিজেকে সংশোধন করিতেই সহসা প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিয়া বলে,

—যাই বল, তোমার লেখাপড়া না করার কারণটা আমি ভাল বুঝতে পারি না।

—কতবার ত বলেছি ও আমার ভালো লাগে না।

—ভালো না লাগারও ত একটা কারণ আছে?

—নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু মেয়ে মানুষ কেন লেখাপড়া শিখবে?

আশ্চর্য্য প্রশ্ন! এ যেন উনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধের প্রথম প্রশ্ন! অরুণ গম্ভীর কণ্ঠে কহে,

—মেয়ে মানুষ লেখাপড়া শিখবে, কারণ, মেয়েদেরও যে জ্ঞান বুদ্ধি আছে সেটার চর্চ্চা হওয়া প্রয়োজন। এই চর্চ্চার ফলেই মেয়েরা সমাজের বেশী উপকার করতে পারবে।

—আগেকার আমলে আমাদের মা ঠাকুরমাদের মত মেয়েদের চেয়েও কি আজকের মেয়েরা সমাজের বেশী উপকার করছে?

অরুণ ঈষৎ ইতস্ততঃ করিয়া পুনরায় কহে,

—আমি তাঁদের কোন সমালোচনা করতে ইচ্ছুক নই।

অপর্ণাও তেমনই স্মিতহাস্যে কহে,

—সেই ভালো! সমালোচনা আমিও ভালবাসি না। তবে আমার কি মনে হয় জান? আমার মনে হয়, মেয়েরা চিরকাল পুরুষদের খুসী করতেই নিজেদের ইচ্ছাকে তাদের ইচ্ছার সঙ্গে একেবারে লোপ করে দিয়েছে।

—অনেক ছোট বেলায় একবার গিয়েছিলুম, ও ভারী অসভ্য।

অসভ্য! এমন কথা অরুণ এই প্রথম শুনিল। আর অনুরোধ না করিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

সপ্তাহের শেষে অধ্যাপক ভট্টাচার্য্য ল্যাবরেটরীর কাজ সমাপ্ত করিয়া আরাম কেদারায় সারা দেহটা পরিপূর্ণভাবে বিশ্রামের ভঙ্গীতে এলায়িত করিয়া দিলেন। ক্ষণপরে অরুণও আসিয়া চা পানের আশায় অপর একখানা চেয়ারে উপবেশন করিল।

সহসা অধ্যাপক যেন স্বগতোক্তি করিলেন,—অপর্ণার এবার বিয়ে দেওয়া উচিত।

বৈজ্ঞানিক চিন্তার সূত্র ইহা নহে! অরুণ এ মন্তব্যে কোন অংশ গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিল না।

—আমার মনে হয়, মেয়েদের বিয়ের বয়স সতেরর মধ্যেই বেঁধে দেওয়া উচিত।

এ সম্বন্ধেও অরুণের অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য নহে। সুতরাং নিরুত্তর অরুণ অধ্যাপকের মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া বসিয়াই রহিল। প্রফেসর প্রশ্ন করিলেন,

—তোমার কি মত?

—আমি ত কখনও এ বিষয় ভেবে দেখিনি স্যর!

—ঠিক কথা! আমিও কখন ভাবিনি! কিন্তু আমি ক'দিন ভাবছি। তুমিও ভেবে দেখো।

অরুণ ভাবিয়া পাইল না যে মেয়েদের বিবাহের বয়স লইয়া সে ভাবিবে কেন। তাই অসঙ্কোচে কহিল,—আপনি নিজে যদি বিবেচনা করেন কেন—

বাধা দিয়া অধ্যাপক যেন অসহিষ্ণু কণ্ঠে কহিলেন,

—না, না, এটা ঠিক বিবেচনার প্রশ্ন নয় অরুণ! এটা গভীরভাবে ভাববার কথা। তুমি ভালো করে ভেবে দেখো, তারপর মত দিও।

বারবার তাহাকে মত দিবার জন্য অধ্যাপকের এই বিশেষ অনুরোধে যেন একটা স্বতন্ত্র অর্থ প্রকাশ পাইল। সেই অর্থটার প্রতি লক্ষ্য পড়িতেই অরুণ একদিকে যেমন সরমে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল, অপর দিকে তেমনই একটা অনাস্বাদিত আনন্দের আভাসে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে অল্পক্ষণের মধ্যেই দুই এক কথার পর উঠিয়া পড়িল।

আ-কুমার ব্রহ্মচারী অধ্যাপক নিজ ছাত্রের নিকট ইহাপেক্ষা সরল ও স্পষ্ট ভাষায় কন্যাপেক্ষা প্রিয় ভাগিনেয়ীর বিবাহ প্রস্তাব তুলিতে পারিলেন না।

ইহা যে প্রস্তাবের নামান্তর তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অধ্যাপক স্বয়ং, অরুণ এবং অপর্ণা তিন জনেই ভাবিতে লাগিল। কথাটা প্রকাশ মুহূর্তে অপর্ণার কানেও গিয়াছিল, কারণ চা লইয়া প্রবেশ পথের মুখেই তাহার উৎকর্ণ কর্ণে এ প্রস্তাব শুনিয়াছিল। তাহার অতিগোপনে সঞ্চিত লালিত বাসনার সহসা নগ্ন প্রকাশে সে নিজেই প্রথমটা চমকিত হইয়া উঠিলেও, সে আত্মহারা হয় নাই। ধীর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সে আত্মগোপন করিয়াছিল। বহু আশা আর আনন্দভরা আত্মকেন্দ্রিক চেতনায় তিনটি প্রাণীই ভাবিতে লাগিল।

আরও একটি সপ্তাহ প্রায় নিঃশব্দে অতিবাহিত হইয়া গেল। কোন পক্ষ হইতেই আর দ্বিতীয়বার প্রস্তাব উত্থাপিত বা সমর্থিত হইল না। তিনজনেই যেন একটা গভীর সমস্যার ভারে পীড়িত! একে অপরের পানে তাকাইতে গিয়া ক্ষণে ক্ষণে অন্যমনস্ক হইয়া যায়। একে অপরের নিকট এখনই যেন দুর্জ্ঞেয় হইয়া উঠিতেছে। অধ্যাপক ভাবিলেন, প্রস্তাবটা হয়ত ঠিকমত উপস্থাপিত করা হয় নাই, হয়ত অরুণ ইহার সঠিক অর্থ অনুধাবন করিতে পারে নাই। অরুণ ভাবিল—অপর্ণার পরিপূর্ণ সম্মতি

ও আগ্রহ না দেখিয়া সহসা উত্তর দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে না। অপর্ণা ভাবিল—অরুণ হয়ত তাহাকে সমপর্য্যায়ে গ্রহণ করিবার মত মেয়ে বলিয়া মনে করে না।

সেদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপক ফিরিলেন না। অরুণও না। এমন একটা উদাস সন্ধ্যা অপর্ণাকে ইতিপূর্ব্বে কখনও এমন করিয়া বিরস করে নাই। আপন মনশ্চাঞ্চল্য গোপন করিবার জন্য সে নিজেকে নানাভাবে ব্যাপৃত রাখিবার চেষ্টা করিল। কখনও লেখাপড়া করিয়া, কখনও রন্ধনশালার তত্ত্বাবধান করিয়া, কখনও বা ডিগ্‌ডিগকে লইয়া সে অন্যমনস্ক হইবার চেষ্টা করিল। নটা, দশটা বাজিয়া গেল। বিষাদিত মনটা আশঙ্কিত হইয়া উঠিল। রাত্রের আহার্য্য গ্রহণ না করিয়াই সে শুইয়া পড়িল। এগারটা, বারটা, একটা! ঘুম আর আসে না! তাহার পর কখন যে শীতল নৈশ-বায়ু স্পর্শে ক্লান্ত অপর্ণা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে তাহা সে নিজেই জানে না।

উঠিতে অনেকখানি বেলা হইয়া গেল। এত বেলায় সে কখনও শয্যা ত্যাগ করে না। এই বিলম্বিত উত্থানে তাহার মনটা প্রথমেই বিরক্ত হইয়া উঠিল। মনে পড়িল, কাল রাত্রে মামাবাবু ফিরিয়া আসেন নাই। মনে পড়িতেই সে সেই শয্যা-বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন না করিয়া তদবস্থাতেই মামাবাবুর কক্ষে করাঘাত করিল। ঝি মনিয়া আসিয়া জানাইল যে, অসুস্থ মামাবাবু কাল রাত্রি তিনটায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন, এখন তাঁহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়াই কর্ত্তব্য। মামাবাবু অসুস্থ! কী হইয়াছে তাঁহার? এ সকল প্রশ্নের উত্তর ইহাদের নিকট পাওয়া যাইবে না। ভালো, মামাবাবুর জন্য সে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবে।

বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া দেখিল, সংবাদ-পত্রখানা আসিয়া গিয়াছে। তাড়াতাড়ি পাতা উল্টাইয়া শিরোনামাগুলি দেখিতে লাগিল।

দারুণ দুর্ঘটনা। বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বলতম রত্ন শ্রীমান অরুণপ্রকাশ আচার্য্য এম্, এস্, সি গতকাল সন্ধ্যায় এক লরী দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া অকালে ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন ··· ··· ··· আঃ ··· ··· ··· ।

দ্বিতীয় শব্দ উচ্চারিত হইবার পূর্ব্বেই অপর্ণার মূর্চ্ছিত দেহ মেঝের লুটাইয়া পড়িল।

জ্ঞান ফিরিলে অপর্ণা দেখিল, তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া আছেন শোক জর্জ্জরিত স্নেহ-দুর্ব্বল তাহার মামাবাবু। অপর্ণা নিজেকে সম্বরণ করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার অদম্য হৃদয়াবেগকে দমিত করিতে গিয়া তাহার সারা দেহটা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। কঠিন সঙ্কল্প লইয়া সে আপন ওষ্ঠাধর চাপিয়া ধরিল। অপর্ণা ভাবিল—কয়েক ঘণ্টায় মানুষের এমন পরিবর্ত্তন হয়? শিশুর মত সরল উদার মানুষটি সহসা অসহ বেদনায় মুহ্যমান হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি যেন এক দিনে মৃত্যুর পূর্ব্ব-সহচর জরা-জর্জ্জরিত বার্দ্ধক্যের কবলে স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন! আশে পাশে ডাক্তার, নার্স! তাহাকে বাঁচিতে হইবে! তাহার জন্যই মুহূর্ত্তে সব আয়োজন সুষ্ঠু হইয়া উঠিয়াছে! কিন্তু ওই মানুষটিকে দেখিবার কেহ নাই, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই।

অরুণ আর ইহ জগতে নাই! অপর্ণার মনে হইল ইহা যেন নিয়তির একটা নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ! এই ব্যঙ্গকে প্রতিব্যঙ্গ করিবার একটা তীব্র মনোভাব তাহাকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। সে শান্তভাবে উঠিয়া বসিল, কহিল,

—আপনারা সকলে যান, আমি ভাল আছি। শুধু মামাবাবু থাকুন।

ডাক্তার কহিলেন,—আপনি অসুস্থ। এখনই আপনাকে ··· ···

বাধা দিয়া অপর্ণা কহিল,

—কেন অকারণ আমায় উত্তেজিত করছেন! আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি। আপনারা অনুগ্রহ করে এখন আমায় একটু একলা থাকতে দিলেই আমার প্রতি সুবিচার করা হবে।

ডাক্তার, নার্স প্রস্থান করিলেন।

অপর্ণা শান্ত কণ্ঠে ডাকিল,—মামাবাবু!

—মা!

বৃদ্ধের নয়নে অশ্রুর ধারা নামিল। শিশুকে যেমন সান্ত্বনা দেয় তেমনই পরম স্নেহে মামাবাবুর অশ্রু মুছাইয়া অপর্ণা কহিল,

—মামাবাবু! আপনি জ্ঞানী মানুষ! জ্ঞানবাবুর ছোট মেয়েটি মারা গেলে একদিন আপনিই খেতে বসে নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলেছিলেন, সুন্দর ফুল ভগবান বড়ং ভালবাসেন! মেয়েটি সব দিক দিয়ে অত সুন্দর ছিল বলেই ভগবান অকালে ওকে কোলে তুলে নিলেন। অরুণদা'র মত সবদিকে অত সুন্দর মানুষটিকেও তাই ভগবান বুঝি এই মলিন মাটির বুকে আর রাখতে চাইলেন না। আমরা কেন তা'র জন্য শোক করব মামাবাবু! বিশেষতঃ, আপনার মত মানুষ যদি ভেঙে পড়েন, তা' হ'লে বিজ্ঞান-জগতের কত বড় ক্ষতি হবে বলুন ত?

—কিন্তু তা'র প্রতিভাও ত সামান্য ছিলনা মা! তা'র দানে সে একদিন আমাদের সকল আবিষ্কারকে ম্লান ক'রে দিয়ে যাবে এই আশাই মনে মনে পোষণ করেছিলুম।

—মানুষের আশা ত জলের বুদ্বুদ মাত্র মামাবাবু! মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সে বুদ্বুদ মহদ্-ইচ্ছার বুকে লয় পাচ্ছে, এ ত আপনারই বাণী!

—মানুষও তাই মা, মানুষও তাই! অনন্ত প্রাণ-প্রবাহের ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদ এই খণ্ড প্রাণ, খণ্ড আশা!

দুই জনে পরস্পরের হাত দুইখানি চাপিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। সেই পরিপূর্ণ শোকের মাঝেও একটা নিবিড় শান্তি ভাসিয়া উঠিল।

কয়েকদিনের মধ্যেই অপর্ণা কলেজে নাম লিখাইল।

দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর চলিয়া গেল। অপর্ণা আই, এ, পাশ করিল। অধ্যাপক গবেষণাগারে পূর্ব্বের ন্যায়ই আত্মনিয়োগ করিলেন, কিন্তু মনের সে প্রশান্তি আর ফিরিয়া পাইলেন না। তাঁহার দেহ ক্রমশই ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল।

একদিন আবার অধ্যাপকের অচৈতন্য দেহটিকে ধরাধরি করিয়া ছাত্রদল বাড়ী পৌছাইয়া দিয়া গেল। ব্লডপ্রেসার, কার্ষ্ট ষ্ট্রোক্! যথারীতি চিকিৎসার পর অধ্যাপক অনেকটা সুস্থ হইলেন।

অপর্ণা কলেজ ছাড়িয়া দিল। মামাবাবুকে লইয়া সে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য কয়েকটা স্বাস্থ্যকর স্থানে ঘুরিয়া ছয়মাস পরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। অধ্যাপকও কলেজ ত্যাগ করিয়া আপন গবেষণাগারেই কিছু কিছু কায করিতে লাগিলেন। অপর্ণা দেখিল, তাহার মামাবাবু কিছুতেই পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইতেছেন না। যে কোন দিন হয়ত তাঁহার শেষ ডাক আসিয়া পৌছিবে। চব্বিশ ঘণ্টা সে মামাবাবুর সেবায় নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিল। মামাবাবুর শেষবন্ধন বিচ্ছিন্ন হইবার চিন্তায় সে নিজেকে অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করিল। এই নিঃসঙ্গতা যেন হিমশীতল মৃত্যুরই নামান্তর!

একদিন সন্ধ্যায় অধ্যাপকের প্রিয় সুহৃদ হৃদয়রঞ্জন অপর্ণাকে একান্তে আহ্বান করিয়া কহিলেন,

—গৌরীর শরীরের অবস্থা ত দেখছ মা! প্রথম ষ্ট্রোকটা ও সামলে নিয়েছে, কিন্তু দ্বিতীয় ষ্ট্রোক ও সহ্য করতে পারবে বলে ত মনে হয় না, অন্ততঃ ডাক্তারদের তাই মত। এদিকে ওর আর্থিক অবস্থাও বেশ ভালো যাচ্ছে না। অসুখ বিসুখ ইত্যাদিতে বেশ কিছু খরচ হয়ে গেল। কিছু দেনাও হ'য়ে পড়েছে। যাক, সে কিছু নয়; কিন্তু তোমার জন্যই ওর ভাবনা বেশী! মৃত্যুতেও ও সান্ত্বনা পাচ্ছে না!

—আমার জন্যে? কেন?

হৃদয়রঞ্জনবাবু একটু ইতস্ততঃ করিয়া চাপা গলায় অসহায়ভাবে ধীরে ধীরে বলিলেন,

—মানে সেই অরুণের কথা আর কি। তোমাকে পাত্রস্থ না ক'রে অসহায় অবস্থায় ফেলে যেতে ও নিদারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করছে। অথচ তোমাকে বলবার সাহস ওর নেই!

গ্রীক দেবী-প্রতিমার মত কঠিন অপলক দৃষ্টিতে অপর্ণা তাকাইয়া রহিল। সে দৃষ্টির ভাষা নাই! হৃদয়রঞ্জন ভীত হইয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,

—না-না, তোমার অমতে কিছুই হ'বে না। তবে তুমি একটু ভেবে দেখো মা।

—ভেবে আমি দেখেছি রঞ্জনবাবু! মামাবাবুকে বলবেন, আমি প্রস্তুত! অতীতকে আঁকড়ে ধ'রে জীবন্ত সমাধি রচনা ক'রে সারা জীবন জ্বল্‌তে আমিও চাই না।

দ্রুত পদে আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া অপর্ণা আপন শয্যায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিতে লাগিল,—ভগবান! আমার সত্যিকার চাওয়া কি বলে দাও ঠাকুর! এই মাত্র গর্ব্ব করে যে বলে এলুম—এ আমি চাই না—আমার এ বলা যেন সত্যি হয়, সত্যি হয় ঠাকুর!

অপর্ণার বিবাহ হইয়া গেল। সকলের সমবেত চেষ্টায় বিবাহ ভালই হইল। পাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট, সুরূপ, স্বাস্থ্যবান, বিত্তবান। এক কথায়, লৌকিক কামনায় অপর্ণার স্বামী নিন্দনীয় ত নহেই বরং বিশেষভাবেই বরণীয়।

অপর্ণা বিবাহের এক মাসের মধ্যে ফিরিয়া আসিল এবং মামাবাবুর শারীরিক অবস্থা দেখিয়া আর ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিল না। অবশেষে, একদিন মামাবাবুই তাহাকে ত্যাগ করিয়া

অজ্ঞাত রাজ্যে যাত্রা করিলেন, হয়ত তাঁহার প্রিয়তম ছাত্র অরুণের আহ্বানেই সাড়া দিতে এ নশ্বর সংসার ত্যাগ করিলেন।

অপর্ণা স্বামীগৃহে যাত্রা করিল। সংসার বলিতে বৃদ্ধ শ্বশুর ও স্বামী। স্বামী বিখ্যাত ব্যবসায়ী। অবসর কম। তাই বলিয়া সে অপর্ণাকে অবহেলা করে না। স্বামীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ। স্বামী সম্বন্ধে অপর্ণার অভিযোগ করিবার মত কিছুই নাই।

স্বামাকে প্রায়ই বিদেশে বাহির হইতে হয়, অপর্ণা তাহাতে অনুযোগ করে না। ভিতরে ভিতরে সে যেন স্বামীর দূরত্বই কামনা করে। কিন্তু কেন? প্রাণপণে সে স্বামী-সেবা করিতে চাহে। তাহার আন্তরিকতায়, সেবায়, কোথাও অভিযোগের অবকাশ নাই। কোথায় অভাব? কীসের ব্যবধান? পরস্পর যেন পরস্পরের নিকট অন্তরে অন্তরে অপরাধী। সে অপরাধের সত্যকার সন্ধান তাহাদের চেতন মনে জানা নাই। বাহিরে নীরন্ধ্র ভালবাসা পরিবেশনের অন্তরালে ভিতরের শূন্যতা কেবলই বাড়িয়া চলে। তথাপি কোনও পক্ষেরই অভিযোগ নাই। পারিবারিক অশান্তি নাই, মানসিক শান্তিও নাই।

অপর্ণা সন্তান-সম্ভবা হইল। এই সম্ভাবনা জানিবার পর মুহূর্ত্ত হইতে সে যেন কেমন শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল, মিথ্যার মধ্য দিয়া, ছলনার মধ্য দিয়া, আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্য দিয়া কি সত্যসুন্দরের আবির্ভাব ঘটিবে? যদি ঘটে, তবে কি তাহাকে শাস্তি দিতে সেই সত্যসুন্দর তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন না? এক অনাগত দুর্যোগের আশঙ্কায় সে বিশীর্ণা হইয়া উঠিল।

একদিন গভীর রাত্রে সে স্বামীকে কহিল,

—শুনছ! জীবনে যে ভুল করেছি তোমাকে তা জানানো উচিত।

ক্লান্ত স্বামী আধতন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে কহিল,

—তুমি যা বলতে চাইছ তা' বলা উচিত নয়! আমি সন্তান চেয়েছি, তুমি আমায় সন্তান দিতে চলেছ। আমি ব্যবসায়ী মানুষ। আমার হিসাব ঠিক আছে। এর বেশী আমারও জানা উচিত নয়, তোমারও জানানো উচিত নয়!

—তবু,...

অনেকটা ধমকের স্বরেই স্বামী কহিল,

—বিরক্ত কোরো না অপর্ণা! কাল আমার অনেক কায।

সে রাত্রে স্বামী-স্ত্রীর আলাপন এই ভাবেই পরিসমাপ্তির রেখা টানিল।

অপর্ণা যথাসময়ে এক সুন্দর স্বাস্থ্যবান পুত্র উপহার দিল। ধনীর গৃহে উৎসব উল্লাসের সীমা রহিল না। নামকরণ উৎসবে খোকা নূতন নাম গ্রহণ করিল সোমনাথ! নামটা অপর্ণারই দেওয়া।

শিশুকে লইয়া অপর্ণা মাতিয়া গেল। কোথা দিয়া তাহার সব শূন্যতা মিলাইয়া গিয়া তাহাকে এক অখণ্ড পরিপূর্ণতা আনিয়া দিল। বিশ্ব সংসারে যেন খোকা সমী ব্যতীত অপর কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাই! স্বামী চিন্তা কোথায় হারাইয়া গেল। স্বামীও অপর্ণার অবহেলা গ্রাহ্য করিল না, কারণ সমী'র ভবিষ্যত যে অপর্ণাই!

সমী ক্রমশঃ বড় হয়। অপর্ণা তাহাকে আরও নিবিড় করিয়া জড়াইয়া ধরে। সমী অসুস্থ হইলে অপর্ণা আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, আবার সমী সুস্থ থাকিলে সে নাচিয়া, গাহিয়া, লঘুচিত্তে সারা বাড়ী মুখর করিয়া তুলে। সমী আধ আধ কথা বলিতে শিখিল, হাঁটিতে শিখিল, শেষে ছুটিতে শিখিল। অপর্ণা যেন একটার পর একটা রাজ্য জয় করিয়া চলিয়াছে।

ঘুমন্ত সমী'র কুঞ্চিত কেশ-শোভিত কপাল ও দীর্ঘ আয়ত চক্ষের পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া তাকাইয়া আশ আর মিটে না। সেদিনও সে

ঘুমন্ত সমীকে প্রথম দর্শনের মতই গভীর স্নেহে চুম্বন করিয়াছিল। তাহার চক্ষের সঙ্গে যেন কাহার চক্ষের সম্পূর্ণ মিল আছে। ও কে? ও কে? ও কে? সহসা তাহার সারা বক্ষ আন্দোলিত করিয়া এক গম্ভীর স্নিগ্ধ স্বর ভাসিয়া উঠিল, 'আমি—অরুণ।' অরুণ! তাইত! সেই মুখ! সেই চোখ! সেই কেশ-পাশ! অরুণ! অরুণ! অরুণ! সহসা তাহার দুই চক্ষু অশ্রু প্লাবিত হইয়া গণ্ড চিবুক ভাসাইয়া দিল। সে ঘুমন্ত শিশুকে বুকে জড়াইয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—খোকা, তুই যেই হোস্, আমার বুক ছেড়ে আর কোথাও যাস্‌নেরে! মাতৃ আলিঙ্গনপিষ্ট সদ্য-জাগরিত শিশুও আর্ত্ত চীৎকার করিয়া উঠিল।

মনের মুকুরে অবচেতন ইচ্ছা সহসা ভাসিয়া উঠিয়া অপর্ণাকে শঙ্কিত, বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিল। সেই শঙ্কা পাছে সত্যের রূপ নেয়, এই চিন্তায় সে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সমী যত বড় হইতে লাগিল অপর্ণা লক্ষ্য করিল, ততই সে অরুণের প্রস্ফুটরূপ পরিগ্রহ করিতেছে। তাহার চলিবার ভঙ্গী, তাহার কলহাস্য, তাহার বচন-মাধুরী, ক্ষণে ক্ষণে কেবল অরুণকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

অপর্ণা তাই বলিয়া তাহার দায়িত্বের প্রশ্ন অবহেলা করিল না। সে সমীকে শিক্ষিত করিতে, আদর্শ মানুষ করিতে, তাহার সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিল। তাহার আহার-নিদ্রা, লেখাপড়া, খেলাধুলা, শয়ন-বিশ্রাম, প্রতিটি মুহূর্ত্তের নিত্যসঙ্গিনী সে! অপর্ণা সমী! শাখা ও শাখী!

সমী বড় হইয়া উঠিতেছে। বালক সমী কিশোর সমী হইয়া উঠিতেছে। বাড়ীতেই শিক্ষক আসে। বাড়ীতেই খেলাধূলার ব্যবস্থা। সমী ম্যাট্রিক পাশ করিয়া এবার কলেজে প্রবেশ করিল।

প্রথম দিন সে মায়ের সহিতই মোটরে করিয়া কলেজে গেল। যথাসময়ে মায়ের মোটরেই ফিরিয়া আসিল। এমনই প্রতিদিন সে যাতায়াত করিতে থাকে। মেধাবী ছাত্র বলিয়া তাহার সুনাম আছে।

ছেলেরা তাহার সহিত মিশিতে চাহে। লাজুক সমী নম্রকণ্ঠে আলাপ জমায়। আলাপ ভাল জমে না। এ ছেলেটির সঙ্গে কোথায় যেন সকল সাধারণ ছেলের ব্যবধান!

সমী আরও বড় হইল। তাহার ব্যায়ামপুষ্ট সুগৌর তনুদেহ ঘেরিয়া তারুণ্যের দীপ্তি ঝলমল্ করিতে লাগিল। অপর্ণা অরুণের নবরূপ দেখিয়া বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া গেল। সমী আই, এস্ সি, পাশ করিয়া বি এস্-সি, পড়িতে লাগিল।

সমী'র সমগ্র অন্তর জুড়িয়া আছে তাহার মা আর তাহার বিদ্যার সাধনা। তাহার মায়ের মত অসামান্যা নারী সে জগতে খুঁজিয়া পায় না। অবশ্য তাহার জগতও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ! তাহাদের জগতে তাহার পিতাও যেন অবাঞ্ছিত। অবশ্য পিতার বিরুদ্ধে তাহার কোনও অভিযোগ নাই, তথাপি পিতা তাহাদের অন্তরঙ্গ নহেন! মা! তাহার মায়ের তুলনা একমাত্র মা! তবু সময় সময় তাহার মায়ের দৃষ্টি তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলে! সে দৃষ্টি যেন কতকটা অস্বাভাবিক! কতদিন গভীর রাত্রে মায়ের আর্ত্ত-চীৎকারে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! তাহার মা জানালার গরাদে ধরিয়া তীব্র করুণস্বরে ডাকিতেছেন—সমী! সমী! সমী! ঘুম ভাঙ্গিয়া সমী মায়ের দেহ ধরিয়া সজোরে ধাক্কা দিতে দিতে বলিয়াছে—এই যে আমি—মা—এই যে আমি! সমী যেন কোন দুর্ঘটনায় পতিত হইয়াছিল এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছে, এইভাবে তাহার সদ্য-সম্বিৎপ্রাপ্তা মা তাহার মস্তক টানিয়া অশ্রুপ্লাবিত চুম্বনে ভাসাইয়া দিয়া কেবলই বলিয়াছেন, সমী—সমী—আমার সমী! গভীর রাত্রে, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী তাহার মায়ের এই অসহায় করুণ মূর্ত্তি তাহাকে ব্যথিত করিয়া তুলে, কিন্তু নিশাশেষে তাহার মায়ের মুখের পানে চাহিয়া সে কিছুই বলিতে পারে না।

সমী বি-এস্-সি পাশ করিল। এবার সংসারে একটা ক্ষুদ্র আন্দোলন দেখা দিল। সমী'র পিতা আসিয়া প্রস্তাব করিলেন, সমী এবার তাঁহার

সহিত ব্যবসায়ে যোগ দিবে। অপর্ণা তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া কহিল, তাহা হইলে তাহার সন্তানকে লইয়া সে এ গৃহ ত্যাগ করিবে। সমী'র বিদ্যার বিঘ্ন হইতে পারে এমন কিছুই সে সহ্য করিবে না। সমী'র পিতা এই উগ্র প্রতিবাদে ব্যথিত হইলেও শান্তকণ্ঠে কহিলেন,

—আজ যদি সময়ে সমী সব লেখা পোনা করতে না শেখে তবে অসময়েই ও সব খুইয়ে পথে এসে দাঁড়াবে।

অপর্ণা কহিল,

—পথই যদি ওকে ডাকে, তবে ওর পায়ের চলায় সেই পথই হয়ে উঠবে গৌরবময়! সে পথের ধুলো নেবার জন্য লাখো মানুষ গড়াগড়ি দেবে।

—স্বপ্নের রাজ্য ছেড়ে তুমি কি এক ক্ষণের জন্যও বাস্তব মাটির বুকে নেমে আসতে পারো না অপর্ণা!

—আমার কাছে আমার স্বপ্ন আর বাস্তব এক হ'য়ে গেছে। সে তুমি বুঝবে না—বুঝবে না। একটা অস্বাভাবিক দ্রুততায় অপর্ণা সে স্থান ত্যাগ করিল।

সমী এম্-এস্‌সি ক্লাসে ভর্ত্তি হইল।

একদিন কি একটা ঘটনা উপলক্ষে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বেই কলেজের ছুটি হইয়া গেল। সমী সকাল সকাল গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার পাঠ কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণে মায়ের কণ্ঠস্বর তাহাকে সচকিত করিয়া তুলিল। তাহার মা বলিতেছেন,

—ভালো করে আপনি দেখুন ঠাকুর মশাই! তেইশ বছরে ছেলের কোন ফাঁড়া আছে কিনা। কোন মোটর দুর্ঘটনা বা অনুরূপ আর কিছু!

সমী' নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে গণৎকার ঠাকুর বাহিরে আসিলে সে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দশ মিনিটকাল হাঁটিবার পর গণৎকার

ঠাকুর এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সোমনাথ দ্রুত তাঁহার সম্মুখে আসিয়া কহিল,

—কতদিন থেকে আপনি আমার মাকে এ ভাবে ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করছেন?

ভীত বিস্মিত গণৎকার কাহলেন,

—বিশ্বাস করুন, আমি ভয় দেখাই নি। বরং অহেতুক ফাঁড়ার ভয় নষ্ট করতেই চেয়েছি, কারণ, সত্যিই আপনার তেইশ বৎসরে কোন ফাঁড়া নেই।

উত্তেজনায় সোমনাথ গণৎকারের একটা হাত সজোরে চাপিয়া কহিল,

—তাই যদি হবে, তবে আমার মা রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে চীৎকার করে ওঠেন কেন? তাঁর মনে এই ফাঁড়ার ভয় জাগিয়ে দিল কে? জানেন আপনি, আমার মা রাতের পর রাত এই মিথ্যা আশঙ্কায় কি নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করছেন?

—জানিনা, বিশ্বাস করুন, এ ভয় যেই জাগিয়ে দিয়ে থাকুক, সে আমি নয়। হাত ছাড়ুন। আমার বুড়ো হাড় সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে।

লজ্জিত ভাবে হাত ছাড়িয়া সোমনাথ কহিল,

—সত্য হোক, মিথ্যা হোক, আপনাকে আমার মায়ের এই আশঙ্কা দূর করতেই হবে। আজ এই পঞ্চাশ টাকা নিন। যদি সফল হন, দু'মাস পরে পাঁচশ টাকা পাবেন।

—বিশ্বাস করুন, টাকার জন্যে নয়, আপনার মায়ের জন্যেই আমি চেষ্টা করব; কিন্তু আমার মনে হয়, এর পেছনে হয়ত কোন করুণ ইতিহাস আছে যা আপনি বা আমি কেউ জানিনা এবং তা জানবার কোনও উপায় নেই।

—কেন?

—সামাজিক নিন্দাও ত তুচ্ছ করবার নয় সমী! তা ছাড়া যদিই বা তা'রা এই দুর্ণামের উর্দ্ধে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতো তা' হ'লেই কি সত্যকে সম্পূর্ণ স্বীকার করা হোতো?

—কেন নয় মা!

অপর্ণা নয়ন নিমীলিত করিল। পরে কহিল,

—শিল্পী এর জবাব ইঙ্গিতে তোমাদের কাছেই রেখে গেছেন সমী! অ্যাঠাইমার কথাগুলো বেশ ভালো করে পড়ে দেখো, তা'হলে তোমার প্রশ্নের উত্তর পা'বে। তবে একটা কথা সমী। সত্যকে স্বীকার করতে গিয়ে একদিন যদি তুমি আমাকেও অস্বীকার কর, তবে মনে মনে কিছুটা ক্ষুব্ধ হ'লেও আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদই করবো।

—মা!

সোমনাথ সহসা শরাহত পক্ষীশাবকের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

—পাগল ছেলে! মা কি তোর চিরকালই তোকে আগলে পড়ে থাকবে রে? তুই কি বড় হচ্ছিস না? বলিয়া অপর্ণা তাহার মাথাটা বুকে তুলিয়া লইল।

দুরন্ত অবোধ শিশুর মত সমী মাথা দুলাইয়া বলিতে লাগিল—না, না, তুমি ও কথা বলতে পাবে না, বলতে পাবে না।

সোমনাথ এম, এস, সি পাশ করিল। প্রথম শ্রেণী পাইয়া প্রথম হইল। সঙ্গে সঙ্গেই পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা করিবার অধিকার পাইল। অধ্যাপক ঘোষাল প্রথম দিনেই তাঁহার প্রিয় ছাত্র সোমনাথকে আন্তরিকভাবে গবেষণাগারে গ্রহণ করিলেন। সোমনাথের সম্মানিত নামটা সাধারণ ছাত্ররা সমীহ করিয়াই উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল।

সোমনাথ মাকে আসিয়া প্রণাম করিল। অপর্ণা আশীর্বাদ শেষে পুত্রের চিবুক স্পর্শ করিয়া অশ্রু-রুদ্ধ কণ্ঠে কহিল,

—সমী! আজ যদি মামাবাবু বেঁচে থাকতেন!

—তোমার মুখে কতবার তাঁর নাম শুনেছি মা! বিজ্ঞান জগতে তাঁর দান তিনি সম্পূর্ণ দিয়ে যেতে পারেন নি। আমি তাঁর কাষ শেষ করবো মা। অপর্ণার চক্ষে ভাসিয়া উঠিল সে দিনের অরুণ! তেমনই দৃঢ়! তেমনই সঙ্কল্পে কঠোর সুন্দর তরুণ! সেদিন সে ছিল মামাবাবুর ভবিষ্যৎ আশা ও আনন্দ! সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার মামাবাবুও ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অপর্ণার দৃষ্টি অস্বাভাবিক হইয়া আসিল। গভীর রাত্রির অসহায় আর্তনাদের ভঙ্গিতে সহসা অপর্ণা সোমনাথকে বিপন্ন করিয়া ডাকিয়া উঠিল—সমী-সমী-সমী!

—এই যে আমি মা—এইত তোমার সমী। সমী মাকে জড়াইয়া ধরিয়া বার বার ডাকিতে লাগিল।

অপর্ণার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। একটা অদ্ভুত অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া কহিল,—ভয় পেয়েছিস সমী! ও কিছু না।

প্রকাশ্য দিবালোকে সমী তাহার মাকে এই প্রথম জ্ঞান হারাইতে দেখিল। তাই একদিন নানা কথার পর ধীরে ধীরে কহিল,

—তুমি একবার ডাক্তার দেখাও মা!

অপর্ণা বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,

—কেন বলত?

—তুমি মাঝে মাঝে রাত্রে চীৎকার করে ওঠো। তোমার চোখ মুখ অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। যেন আমি কোন এ্যাক্সিডেন্টে পড়েছি। এতদিন তোমায় বলতে সাহস করিনি, কিন্তু সেদিন দিনের বেলায় ঠিক সেইভাবে তুমি জ্ঞান হারিয়ে ফেললে। তুমি অমত করতে পারবে না মা।

পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জার্ম্মাণী যাই এবং সেই বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করি। সর্ত্ত অনুসারে আমার ছ মাসের মধ্যেই ভারতবর্ষে ফিরে কাযে যোগদান করবার কথা। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই বন্ধুর চেষ্টায় আমি এক অসাধারণ বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করি। সেই বৈজ্ঞানিক তখন মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। আমি তাঁর সহকারী হবার আবেদন জানাই। কয়েকদিন পরে তিনি সম্মত হ'ন। কিন্তু সর্ত্তের ফাঁদে পড়ে আমার অবস্থা তখন শোচনীয়। সেই প্রফেসরই তখন বিশেষ চেষ্টা করে আমার পি এইচ ডি উপাধির জন্য আরও দু বৎসরের অনুমতি আনিয়ে দেন।

কায আরম্ভ হয়ে গেল। অদ্ভুত প্রতিভাধর সেই বৈজ্ঞানিক! আমার চক্ষে পৃথিবীর নতুন রূপ ধরা দিল। আমি দেখলুম, বিজ্ঞান জগতে আমি এক তুচ্ছ শিশু মাত্র! বৈজ্ঞানিকের অদ্ভুত প্রতিভায় আমি যেন সম্মোহিত হয়ে গেলুম। দিনের পর দিন সেই অজ্ঞাত রহস্যের সন্ধানে আমি সহকারীরূপে কায করতে লাগলুম।

এদিকে বহির্বিশ্বে তখন নতুন আলোড়ন সুরু হয়ে গেছে। প্রথম মহাযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

একদিন অকস্মাৎ ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের নিকট হতে আদেশ এল আমায় লণ্ডনে ফিরে যেতে হবে। মাঝপথে এইভাবে বাধাগ্রস্ত হয়ে আমি বিদ্রোহ ঘোষণা করলুম। আমি আদেশ অগ্রাহ্য করলুম। কয়েক মাসের মধ্যেই আমাকে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানার বলে জার্ম্মান পুলিশ ব্রিটীশ পুলিশের হাতে সমর্পণ করলো। যুদ্ধের তখনও দেরী আছে।

পরদিন ভোর না হতেই লণ্ডনের সকল বড় বড় সংবাদ পত্রে বড় বড় শিরোনামা দিয়ে প্রকাশিত হোলো—রাষ্ট্রদ্রোহী এম, জি গ্রেপ্তার। বিখ্যাত বিপ্লবীর গোপন তথ্য ফাঁস! অবাক হয়ে ভাবলুম, আমি রাষ্ট্রদ্রোহী! আমি বিপ্লবী! কবে, কোথায়, কোন বিপ্লবী দলের সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটলো?

যাক! পুলিশের নথি পত্রে আমার অপরাধ প্রমাণিত হয়ে গেল। আমি পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলুম। এত বড় মিথ্যার প্রতিবাদে আমি একটা শব্দও উচ্চারণ করতে পারলুম না! অবশ্য বিদেশে কয়েকজন ভারতীয় বন্ধু দয়া পরবশ হয়ে আমার মামলা চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের সহস্র ধন্যবাদ! মামলায় অনেক উত্তেজক সংবাদ পরিবেশন করা হয়েছিল, ফলে সংবাদপত্র জগতে সে মামলা বেশ একটা চাঞ্চল্যেরই সৃষ্টি করেছিল।

যুদ্ধ শেষে আমি ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করলুম। কিন্তু ব্রিটিশের সন্দেহ থেকে মুক্তি পেলুম না। বঙ্গবাসী কলেজে সামান্য ১৫০্ টাকা মাইনের প্রফেসরী পদ নিতে বাধ্য হলুম। সেই অবস্থাতেই আমি বিবাহ করি বা ঘটনাচক্রে বিবাহ করতে বাধ্য হই। যাক সে কথা।

গবেষণার ভূত কিন্তু আমার কাঁধ থেকে নামল না। আমি সেই স্বল্প আয় থেকেও কিছু কিছু বাঁচিয়ে একটা ল্যাবরেটরী গড়ে তুললুম। কিন্তু দুধের স্বাদ কি ঘোলে মেটে! আমার অর্থ কোথায়? তবুও কি আঘাতই না পেলুম! একদিন এক গোয়েন্দা পুলিশের দল আমার সেই ল্যাবরেটরী ভেঙ্গে তচনচ করে দিল। আমারই সুমুখে আমার এক একখানা পাঁজরা যেন নির্মম হাতে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে লাগল। আমি অসহায়ের মত কেবল দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম। প্রতীকারহীন অক্ষম চোখ দুটো শুকিয়ে উঠ্‌লো। একফোঁটা অশ্রুও তাতে ছিল না।

যাক সে অত্যাচারের কাহিনী। দয়া করে তাঁরা অবশ্য আর আমাকে ভারতীয় জেলে টেনে নিয়ে গেলেন না। কিন্তু আমার আশাও আর রইলো না। আমার নামের পেছনে কালো দাগ টানা হয়ে গিয়েছিলো।

তুমি জানো, এরপর বহু বৎসরে বহু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। আমার এই বৃদ্ধ বয়সে, মাত্র প্রায় পাঁচ বৎসর আগে, বিজ্ঞান কলেজের গবেষণাগারে স্থান লাভ করেছি। সোমনাথ! তোমাকে দেখে আবার আমার আশা জেগে উঠ্‌ছে। তুমি আমার সাহায্য করবে?

সোমনাথ তৎক্ষণাৎ তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া কহিল,

—সেই উদ্দেশ্যেই ত আজ এখানে এসেছি স্যর! আশীর্বাদ করুন, আমি যেন নিজেকে আপনার যোগ্য সহকারী বলে পরিচয় দিতে পারি।

বৃদ্ধ ঘোষাল আনন্দে সোমনাথকে জড়াইয়া ধরিলেন। বহুকাল সঞ্চিত রুদ্ধ অশ্রু আজ আনন্দবেগে বন্ধনমুক্ত নদীর ন্যায় তাঁহাকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল।

রাত্রে ফিরিয়া সোমনাথ প্রথমেই অপর্ণাকে সকল কাহিনী বিবৃত করিয়া কহিল,—এতে অনেক টাকা দরকার মা! তোমায় কিন্তু এখনই অন্ততঃ হাজার দশেক টাকা দিতে হবে।

—অত টাকা আমি কোথায় পাব রে?

—কোথা থেকে পাবে আমি জানি না, কিন্তু টাকা আমার চাই-ই। বাবাকে আমি বলতে পারবো না, আর বললেও তিনি হয়ত ঠিক বুঝতে পারবেন না।

অপর্ণা কহিল,—আচ্ছা, টাকার ব্যবস্থা আমি-ই করবো। তোমায় আর ভাবতে হবে না। বলিয়াই মৃদু হাসিয়া কহিল,

—কিন্তু আসল ঘটনাটাই যে এখনও বললি না সমী?

বিস্মিতকণ্ঠে সোমনাথ কহিল,—আসল ঘটনা? তার মানে?

অপর্ণা যেন রহস্যময়ী হইয়া উঠিতেছে। সে তেমনই মৃদু হাসিয়া কহিল,—প্রফেসরের সেই মেয়েটি? বছর তেরো চোদ্দো বয়স, বড় বড় চোখ, কোঁকড়া চুল, ধবধবে রঙ্……

সোমনাথ হাসিয়া ফেলিল, কহিল,

—এইবার তুমি হেরে গেলে মা! এতক্ষণ আমি ভাবছিলুম, হয়ত তোমার ও বাড়ীর সঙ্গে কোনও সূত্রে পরিচয় আছে, কিন্তু তা নয়। সত্যিই প্রফেসরের একটি তেরো চোদ্দো বৎসর বয়সের মেয়ে আছে বটে কিন্তু রঙ তার ধবধবে নয়।

অপর্ণা ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া নিমীলিত নয়নে কহিল,

—তা হোক, ভারী সুন্দর মেয়ে, ভারী দুষ্টু মেয়ে, ভারী মিষ্টি মেয়ে!

অপর্ণা যেন স্বপ্নের ঘোরে কথা কহিতেছে।

সোমনাথ সভয়ে ডাকিল,—মা!

অপর্ণা চক্ষু মেলিয়া কহিল,

—মেয়েটির নাম কি রে?

—সুপ্রিয়া"। কিন্তু দুষ্টু কি মিষ্টি তা'র পরিচয় এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি। বরং আজ খুব শান্তশিষ্ট মেয়েটির মতই সে চা পরিবেশন করে গেল।

—তুই তা'কে এখনও কিছুই চিনতে পারিসনি সমী! স্বাস্থ্যে ভেঙে পড়ছে মেয়েটা! ওর সেই চঞ্চলতা ওর প্রাণশক্তির স্বাভাবিক প্রকাশ মাত্র! কিন্তু তুই যেন তা'কে তুচ্ছ করিস না সমী!

সোমনাথ অবাক হইয়া কহিল,

—তোমার আজ কি হয়েছে মা! তোমার কথাগুলো আজ যেন ঠিক তাল রেখে চল্‌তে পারছে না। তাকে তুচ্ছ করা বা না করার প্রশ্ন এর মধ্যে আসে কোথায়!

—সে কথা আজ তুই ঠিক বুঝতে পারবিনা সমী! তবে তোর মায়ের এ কথাটি কখনও যেন ভুলিস না! এ আমার অনুরোধ, আমার আদেশ!

বলিতে বলিতে ব্যাকুলভাবে অপর্ণা সোমনাথের হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিল। সোমনাথ যেন তাহার মাকে সান্ত্বনা দিতেই গভীরভাবে উচ্চারণ করিল,

—তাই হবে মা, তাই হবে, তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরেই পালিত হবে।

সপ্তাহ শেষ না হইতেই অপর্ণা সোমনাথকে সঙ্গে লইয়া প্রফেসরের গৃহে উপনীত হইল। প্রফেসর তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। স্ত্রী রাজলক্ষ্মী তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন,—আসুন ভাই আসুন! মনে মনে আপনাকেই আমি চাইছিলুম।

—কেন বলুন ত!

—সোমনাথকে আমার আশ্চর্য্য-সুন্দর লাগে। তাই মনে মনে এই আশ্চর্য্য-সুন্দর ছেলেটির মাকেই কামনা করছিলুম!

—ছেলের সামনে মাকে বড় অপ্রস্তুতে ফেললেন দিদি! সমী'র গর্ব্ব বেড়ে যাবে। ওর ধারণা জগতে ওর মায়ের দ্বিতীয় কেউ নেই।

—সত্যিই নেই! ওর ধারণায় ভুল নেই।

এমন সময় দুরন্ত ঝড়ের বেগে প্রবেশ করিয়া কি একটা বলিতে গিয়া সুপ্রিয়া সহসা অপর্ণার চোখে চোখ পড়িতেই সংযত হইয়া থামিয়া গেল।

উভয়ের চক্ষে পলক আর পড়ে না। কক্ষের স্তব্ধতা যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে! কতক্ষণ—কতক্ষণ এ ভাবে কাটিয়া গেল—কাহারও তাহা ধারণা নাই। সহসা অপর্ণা তাহার দুই ব্যগ্রবাহু দিয়া সুপ্রিয়াকে জড়াইয়া ধরিয়া মনে মনে উচ্চারণ করিল,—সুপ্রিয়া আমাকে তুই মুক্তি দে মা, মুক্তি দে! সুপ্রিয়া মন্ত্র-শান্ত স্থির দৃষ্টি মেলিয়া অপর্ণার পানে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

এই নাটকীয় পরিস্থিতি অপর সকলেরই নিকট দুর্বোধ্য মনে হইল।

সোমনাথ মায়ের হাত ধরিয়া কহিল,—বাড়ী চল মা!

—নারে না—ভয় নেই—আমি ভালই আছি! পরে সুপ্রিয়াকে পরম স্নেহে আদর করিয়া কহিল,—ভারী মিষ্টি মেয়ে! কিন্তু দুষ্টু মেয়ে! আমার সঙ্গে কথা কইছিস না কেন বলতো?

রাজলক্ষ্মী কহিলেন,

—সত্যি ভাই! ও ভারী দুষ্টু মেয়ে! ওর দুষ্টুমির জ্বালায় বাড়ীতে বাস করা দায় হয়ে উঠেছে। সারা বাড়ীখানা কোন দিন না ওর পায়ের চাপে ভেঙে পড়ে। পড়াশুনায় যে এদিকে একেবারে মা সরস্বতী! অপর্ণা একটা অদ্ভুত তৃপ্তির হাসি হাসিয়া কহিল,

—দুষ্টু মেয়ে বলেই ত ও অত মিষ্টি মেয়ে! কিন্তু দোহাই দিদি! আমার মাকে যেন কোনদিন আপনারা অযত্ন করবেন না। ও অনেক লেখাপড়া শিখবে—ও আপনিই শিখবে—কিছু ভাবনা নেই। ভারী মিষ্টি মেয়ে, ও ভারী মিষ্টি মেয়ে!

অপর্ণা সুপ্রিয়ার গণ্ডদেশে আপন গণ্ডদেশ স্থাপিত করিয়া স্থির দৃষ্টিতে রাজলক্ষ্মীর পানে চাহিয়া রহস্যময়ী হাসি হাসিতে লাগিল।

এবার রাজলক্ষ্মীর চক্ষের সম্মুখ হইতে যাদুমন্ত্রবলে যেন একটা রহস্যের যবনিকা সরিয়া গেল। সেই মুক্ত আলোকে তিনি দেখিলেন, অপর্ণা ও সুপ্রিয়ার চক্ষে যেন একই আলো! দুজনার চক্ষে যেন একই ভাষা! রাজলক্ষ্মী উভয়ের পানে চাহিয়া হাসিয়া কহিলেন,

—সুপ্রিয়া যদি একদিন তোমাকেই মা বলে পরিচয় দেয় তবে সাধারণের দরবারে আমি হেরে যাবো ভাই।

অপর্ণা প্রত্যুত্তরে একটী বাক্যও উচ্চারণ না করিয়া তেমনই মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

অপর্ণা ফিরিয়া আসিয়া সেইরাত্রেই জ্বরে পড়িল। ইহার মূলে ছিল তাহার সুপ্রিয়াদর্শনজনিত উত্তেজনা। সোমনাথ সকালে উঠিয়া দেখিল, মা জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ সুষ্ঠু ব্যবস্থা করিয়া প্রফেসরকে সংবাদ দিল যে, সে কয়েকদিন

ল্যাবোরেটরীতে অনুপস্থিত থাকিবে। সন্ধ্যার সময় অপর্ণা তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া হাসিয়া কহিল,

—কী এমন হয়েছে সমী, যে তুই এতটা বাড়াবাড়ি কচ্ছিস! দেখিস, ছুদিনেই আমি সেরে উঠব। চব্বিশ ঘণ্টাই যদি আমার পাশে বসে থাকিস তা'হলে তুই নিজেই যে অসুখে পড়ে যাবি।

শঙ্কিত কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—তোমার সমীর কিছু হবে না মা! সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তুমি শীগ্‌গীর সেরে ওঠো।

পরম স্নেহে পুত্রের মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া অপর্ণা কহিল,

—আচ্ছা সমী! সেরে না হয় উঠলুম, কিন্তু সত্যিই ত একদিন আমি আর থাকবো না। সেদিন কি তুই আমার জন্যে তোর সাধনা, তোর ভবিষ্যৎ, পথের ধুলোয় ধূলিসাৎ করে দিবি?

—ও কথা বলো না মা!

অপর্ণা দৃঢ়স্বরে বলিতে লাগিল,

—সমী! সংসারের ঝড় ঝঞ্ঝা থেকে দূরে থাকতে চাইলেই ত মানুষ তা হ'তে অব্যাহতি পায় না বাবা! তোকে ত আমি অসহায় বড়লোকের ছেলে করেই মানুষ করিনি সমী! একদিন যদি ভাগ্যের খেলায় তোকে পথে নেমে আসতে হয়, তবে সে দিনও তুই যাতে মাথা উঁচু করে লক্ষ্যের পথে এগিয়ে যেতে পারিস্ তেমনই করেই ত তোকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি বাবা।

—বেশ ত, তুমি বেঁচে থেকেই আমার সেই পরীক্ষা নাওনা মা!

অপর্ণার অধরে ক্ষীণ বিষণ্ণ হাসি ফুটিয়া উঠিল,

—বেঁচে থাকা না থাকা নিজের হাতে নেই সমী! তবে শতদলের এক একটি পাপড়ী যখন ঝরতে থাকে তখন তা'র আসন্ন মৃত্যুটাও অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে, তা'তে দুঃখ করবার কিছু নেই।

এবার সোমনাথ নিজের পক্ষে যুক্তি খুঁজিয়া পাইল, কহিল,

—তাই যদি হয়, তা হ'লে তোমার জীবন-সকালের একটা পাপড়ীও ত আজও খসে পড়েনি মা! তোমার একটি দাঁতও পড়ে নি, একগাছা চুলও পাকেনি! তবে কেন তুমি ও কথা বলে আমায় দুঃখ দিচ্ছ?

অপর্ণা হাহা করিয়া হাসিয়া কহিল,

—ভয় নেই সমী, ভয় নেই! আমি আজই মরছি না! কিন্তু যা অবশ্যম্ভাবী তা উচ্চারণ করলে তুই অমন অসহায় হয়ে পড়িস্ কেন বলত?

—জানি না মা, কেন হয়ে পড়ি। সেই অন্ধকারময় ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে আমি কিছুই দেখতে পাই না। আমার সাধনা, আমার সত্য, তোমাতেই ষোলআনা আশ্রয় নিয়ে পরম নিশ্চিন্তে বাস করছে। একদিন হয়ত আমিও চলে যাবো, কিন্তু তা'র আগেকার সেই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা আমি কল্পনা করতে পারি না। এত বড় জগতে তুমি ছাড়া আমার আর ত কেউ সত্যিকার বন্ধু নেই মা!

—বন্ধু ত সহজে এসে ধরা দেয় না সমী! তোমার সত্যিকার বন্ধু হয়ত তোমারই পাশে এসে দাঁড়িয়ে রয়েছে তোমার আহ্বানের অপেক্ষায়! আজ সম্পদের মাঝে যদি তাকে চিনতে না পারো তবে দুর্দ্দিনের মাঝে তাকে চিনতে পারবেই!

—এমন কি সম্পদ আছে মা, যা সত্যিকার বন্ধুকে আড়াল করে রাখে?

অপর্ণা ক্লান্তভাবে চক্ষু নিমীলিত করিল! সোমনাথ ভাবিল, দুর্ব্বল দেহে আর অধিক চিন্তার প্রশ্রয় দেওয়া উচিত হইবে না। তাহার জীবনে তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ তাহার মা! কে সে বন্ধু তাহার আহ্বানের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে সে জানে না, জানিতে চাহে না! তাহার মায়ের বিনিময়ে সে বন্ধুত্ব তাহার নিকট তুচ্ছ!

ইহার পর অপর্ণা দুই তিনবার প্রোঃ ঘোষালের বাড়ী গিয়াছে, কিন্তু আর কোন দিন কেহ তাহার ভাবান্তর লক্ষ্য করে নাই। নানাবিধ আলাপ আলোচনায় কয়েক ঘণ্টা কাটাইয়া, একটা আনন্দের পরিবেশ সৃজন করিয়া সে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এমন আলাপী আনন্দময়ী নারীর একান্ত সান্নিধ্যে আসিয়া সুপ্রিয়াও অপর্ণার অত্যন্ত অনুরাগিণী হইয়া উঠিল। তাই পরসপ্তাহে যখন একদিনও অপর্ণার ও বাড়ীতে পদার্পণ ঘটিল না তখন সুপ্রিয়াই প্রথম প্রশ্ন করিল,

—সমীদা! মাসীমা আর আসছেন না কেন?

—মা'র শরীর ভাল যাচ্ছে না সুপ্রিয়া!

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—কি হয়েছে? জ্বর? আমরা কাল যাবো?

সোমনাথ যেন কথাটা চাপা দিতে গিয়াই তাড়াতাড়ি কহিল,

—না না, এমন কিছু নয়! কাল ত তিনি বাড়ী থাক্‌বেন না!

সুপ্রিয়া ভাবিল, এ কি রকম কথা! অসুস্থ অবস্থায় তিনি অন্যত্র যাইতে পারেন অথচ এখানে আসিতে পারেন না; তবে কি সোমনাথ তাঁহার সহিত তাহাদের মেলামেশা পছন্দ করে না? কিন্তু কেন? তাহারা ত তাঁহার কোন অসম্মান করে নাই। একটা প্রচ্ছন্ন আঘাতে সুপ্রিয়া বিমর্ষ হইয়া গেল। দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়াই সে প্রস্থান করিল।

রাজলক্ষ্মী প্রশ্ন করিলেন,

—তোমার মা'র শরীর কি অসুস্থ?

সোমনাথ এ প্রশ্নে নিজেকে বিব্রত বোধ করিল, কিন্তু সঙ্কোচ না করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,

—দেখুন, কথাটা আপনাকে না বললে অন্যায় হবে, কারণ এই সামান্য ব্যাপার নিয়েই একটা ভুল বোঝার সূত্রপাত হতে চলেছে। ব্যাপারটা বিশেষ কিছু না হলেও একদিক দিয়ে এর গুরুত্বটা অল্প নয়। ব্যবহারিক

জগতে আমার মা'র মত তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালিনী নারী এ সংসারে খুব কমই আছেন, কিন্তু কখনো কখনো উনি যেন স্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন অবস্থায় থাকেন, তখন বাস্তব আর ওঁর স্বপ্ন এক হয়ে যায়। প্রথম দিনের কথা যদি আপনার মনে থাকে, তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন সেদিন ওঁর আচরণ একটু অসংলগ্নই ছিল।

—তুমি কি বলতে চাইছ সমী। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

সোমনাথ একটা অপ্রতিভের হাসি হাসিয়া কহিল,

—আমিও যে খুব ভালো বুঝেছি তা বললে সত্য বলা হবে না। তবে যে ক'দিনই মা এখানে এসেছেন সে ক'দিনই উনি মানসিক উত্তেজনায় জ্বরে পড়েছেন। হয়ত ওঁর কোন স্বপ্নের সঙ্গে এখানকার কিছু মিল ঘটেছে। তাই আমিই তাঁকে অনুরোধ করেছি এখানে না আসতে।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে রাজলক্ষ্মী কহিলেন,

—কিন্তু এতে যদি তাঁর সম্ভ্রমে আঘাত লাগে, তবে তা'র ফল কি আরও মন্দ হবে না?

—বোধ হয় না। কারণ তাঁ'র ধারণা, আমি কোন অন্যায় অনুরোধ করি না।

—তিনি কি বললেন?

—তিনি হেসে বললেন, তোমার অনুরোধটা কঠিন; তবু আশীর্ব্বাদ করি, কঠিনের সাধনায় তুমি সিদ্ধ হও। সেই সিদ্ধিতে ধন্য কর তুমি জগৎকে তোমার দাক্ষিণ্য দিয়ে।

—তুমি সে কথায় কি বুঝলে?

—মা'র সব কথার অর্থ আমি সব সময় ঠিক বুঝতে পারি না। সে সময় তাঁর দৃষ্টিতে, তাঁ'র স্বরে অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে, যার ফলে, আমি তা'র অর্থের কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাই না।

—মানে না পেলেও নিজেই তার অর্থ উদ্ভাবন করতে চেষ্টা কোরো না! ও গুলো হয়ত অসংলগ্ন প্রলাপ নাও হতে পারে।

বলিয়াই আর অপেক্ষা না করিয়া গম্ভীর মুখে রাজলক্ষ্মী চলিয়া গেলেন। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের অবসর সোমনাথের কম, কিন্তু তাই বলিয়া তাহার মায়ের সম্পর্কে অপর কেহ তাহাকে হিতোপদেশ প্রদান করিয়া যাইবে ইহাও সে মনে মনে স্বীকার করিতে পারিল না। সে অসন্তুষ্ট হইল। হউন তিনি রাজলক্ষ্মী! হউন তিনি সুপ্রিয়ার মা!

আসলে অপর্ণা যেদিন আবিষ্কার করিল যে সোমনাথ অরুণেরই নবরূপ, সেই দিন হইতেই তাহার ধারণা বদ্ধমূল হইল যে সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়াই এবার অরুণ এ জগতে তাহার পরিপূর্ণ জীবনের প্রকাশ দেখাইবে। এবং এই ধারণা তাহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাহাকে এমন সত্যরূপে পাইয়া বসিল যে, ভবিষ্যত সোমনাথকে সে আপন মনের মুকুরে স্পষ্ট প্রতিভাত দেখিতে পাইল। কিন্তু ইহাও ভাবিল যে, সোমনাথ স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে, হইতে পারে না। তাহার জীবনেও আসিবে একটী কল্যাণময়ী নারী, যে সর্ব্ব বিষয়ে সোমনাথের সহধর্ম্মিণী হইবার অধিকারিণী! মায়ের ব্যক্তিত্বের প্রভাবে সোমনাথ আচ্ছন্ন। সোমনাথকে মাতৃত্বের ভূমিকায় পরিপূর্ণতার পথে টানিয়া লইয়া যাইবার অবসর দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সোমনাথ তপস্যামগ্ন ধ্যানী সোমনাথ! প্রয়োজন এবার জাগ্রত সোমনাথের। নচেৎ দেবতার ভূমিকায় অভিনয় করিতে গিয়া প্রথম আঘাতেই সোমনাথ ভূমিসাৎ হইয়া যাইবে আর সে ভূমিশয্যা হইতে তুলিবার সেদিন আর কেহ থাকিবে না।

এ পৃথিবীতে নর ও নারীর আছে বিশেষ ভূমিকা! সেই ভূমিকায় সুষ্ঠু অভিনয়ের আয়োজনেই সংসার! ইহা অস্বীকার করার অর্থ

জীবনকে অন্ধকার করা। সুপ্রিয়ার মাঝে অপর্ণা পাইয়াছে প্রচুর সম্ভাবনা, পাইয়াছে সোমনাথের ভবিষ্যৎ। না, সে ভুল করে নাই। সুপ্রিয়া দিনে দিনে শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। ঐ শত-দলের সুপ্ত মধুধারায় স্নাত হইবে সোমনাথ। সুপ্রিয়াকে প্রিয়ার ভূমিকায় লাভ করিবে সোমনাথ! মাতৃত্বের করুণায় বিগলিত সুপ্রিয়া একদিন মুক্তি দিবে সোমনাথকে বিশ্বের কল্যাণে! সোমনাথ দুর্জয় সঙ্কল্পে হইয়া উঠিবে অজেয়। বিশ্বামিত্রের দুঃসহ তপস্যায় বসিয়া নূতন সৃষ্টির স্রষ্টারূপে বৈজ্ঞানিক সোমনাথ জগতে রাখিয়া যাইবে অতুল কীর্ত্তি!

ভাবিতে ভাবিতে অপর্ণা আবেশে অবশ হইয়া আসিল। কিন্তু উহারই মাঝে আবার ভাসিয়া উঠিল নিয়তির নিষ্ঠুর নির্দ্দেশ। যদি আবার মধ্য পথে অরুণেরই মত সোমনাথ অকালে অদৃশ্য লোকে অপসৃত হইয়া যায়! না না, এত বড় অভিসম্পাত সে সহ্য করিতে পারিবে না। সে তাহার সঞ্চিত পুণ্যের সমস্ত নিঃশেষ করিয়া সোমনাথের আয়ু ভিক্ষা করিয়া লইবে। সোমনাথকে বাঁচিতেই হইবে, বাঁচিতেই হইবে। উত্তেজনায় অপর্ণা শয্যা ত্যাগ করিয়া বিরাট হলটার একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দ্রুত পদচারণা করিতে লাগিল।

সোমনাথ তাহার গবেষণাগারে নিয়মিতভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে। সময় যত অগ্রসর হইতেছে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পরীক্ষাও তাল রাখিয়া সেই অনুপাতে কখনও ধীর-মন্থর কখনও বা দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। সাফল্যের পথ এখনও বহুদূর হইলেও নৈরাশ্য-জনক নহে।

অপর্ণার সদাজাগ্রত মনটি কিন্তু পড়িয়া থাকে সুপ্রিয়া-সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়া। সোমনাথ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে অপর্ণা খুঁটিয়া খুঁটিয়া সুপ্রিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করে। সোমনাথ মাকে প্রসন্ন করিতে সুপ্রিয়ার কথা বলিয়া চলে। অপর্ণা বিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারে না, কারণ সোমনাথের চক্ষে বা স্বরে ভাসিয়া উঠে একটা নির্লিপ্ততার ছবি। অপর্ণা বেশ বুঝিতে

পারে বৈজ্ঞানিক সোমনাথ তাহার হৃদয়কে ল্যাবরেটরীতেই আবদ্ধ রাখিয়াছে, সেখানে আজিও সুপ্রিয়া বিশেষ রেখাপাত করিতে পারে নাই! তথাপি অপর্ণা নিরুৎসাহ হয় না। কৌশলে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া মানব মানবীর হৃদয়দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণ সুরু করিয়া দেয়, অবশ্য উপলক্ষ থাকে কোন প্রসিদ্ধ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা।

প্রায় এক বৎসরের উপর হইতে চলিল তথাপি সুপ্রিয়ার আকর্ষণ সোমনাথ অনুভব করে না দেখিয়া এবার অপর্ণা কিছুটা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। শুধু উদ্বিগ্ন নহে, মনে মনে সুপ্রিয়ার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। একবার মনে হইল এখনই যাইয়া সুপ্রিয়াকে তিরস্কার করিয়া বলে, সুপ্রিয়া তোর ষোড়শী রূপের কি কোন আকর্ষণই নাই! প্রকৃতি তোকে এত ঐশ্বর্য্য দিয়াছেন কি শুধু হেলায় অবহেলিতা হইবার জন্য? একটা অক্ষম বেদনায় অপর্ণা পীড়িতা হইতে থাকে। মা হইয়া সে তরুণ তরুণীর হৃদয় দ্বন্দ্বের সুকুমার অংশে কেমন করিয়া অভিনয় করিবে! সে প্রার্থনা করে, হে অতনু! তোমার পুষ্পধনু সংযোজনা কর দেব! প্রকৃতির সহজাত সংস্কারে একি নির্ম্মম অবহেলা!

অপর্ণা যেমনটি চাহিতেছিল ঠিক তেমনটি না হইলেও ইহা মনে করিলে ভুল হইবে যে সোমনাথ সুপ্রিয়া পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্য কামনা করিত না। উভয়ের মেলামেশা দীর্ঘ না হইলেও একই আবাসে একবারে বিরলও ছিল না। ক্লান্ত সোমনাথ বাহিরে ইজি চেয়ারটায় তাহার দীর্ঘ দেহটিকে এলায়িত করিয়া দিলে সুপ্রিয়া চা পরিবেশন করিতে করিতে বহুবিধ উচ্ছল প্রশ্ন করিত। স্বল্পভাষী সোমনাথকে সে বাকপটু দেখিতে চাহে। মাতৃসাহচর্য্যে সোমনাথ অবশ্য অনেকটাই পটুত্ব লাভ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতিগত সে স্বল্পভাষী! সুপ্রিয়ার প্রগল্‌ভতা সে উপভোগ করে কিন্তু উহার সহিত সমপর্য্যায়ে আলোচনা চালাইবার অবসর তাহার কম। সোমনাথ লক্ষ্য করিল, স্বভাবে সরলা হইলেও সুপ্রিয়ার বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষুতারকায়

প্রতিভার অভাব নাই। তাহার মাকে সে দেখিয়াছে, গভীর শান্ত; তাহা যেন তরঙ্গহীন বিশাল স্বচ্ছ হ্রদ! সুপ্রিয়া যেন উর্মি-মুখর স্রোতবতী ঝরণা। মা বলেন—সুপ্রিয়া দুষ্টু হলেও ভারী মিষ্টি মেয়ে!

মিষ্টি মেয়ে! মা'র যেমন কথা! মেয়ে আবার মিষ্টি কি! মিষ্টত্ব ত স্বাদে! কিন্তু বর্ণে, গন্ধেও ত মিষ্টত্ব রহিয়াছে! মা'র কথাই সত্য! সুপ্রিয়ার মিষ্টত্ব তাহার বর্ণে, তাহার গন্ধে! অত্যন্ত মিষ্টভাষিণী সুপ্রিয়া! সময় সময়ে অতি হাল্কা ধরণের হাস্য পরিহাস করিলেও ওর বাক্যে গভীরতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। ওর নিজস্ব চিন্তা আছে। আবার মাঝে মাঝে ওর অত্যন্ত ছেলেমানুষী দেখিয়া না হাসিয়া থাকা যায় না। অবসর সময়ে তাহাকে হাসাইবার জন্য যেন ও ব্রতধারণ করিয়াছে। ওর খুসী মত তাহাকে হাসিতে হইবে। এ যেন এক প্রকারের জুলুম! কিন্তু উপায় কি? শুধু শুধু উহার মনে দুঃখ দিয়াই বা সে কি এমন সান্ত্বনা লাভ করিবে? বরং তাহার বিদ্যার অহঙ্কার প্রকাশ পাইয়া সুপ্রিয়াকে অকারণ ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিবে। তুচ্ছতার মাঝেও একটা বিলাস আছে। এ বিলাস উপভোগ করিবার মত সরলতা তাহার আছে! অবশ্য এই তুচ্ছতার অবসরে ক্লিন্নতাকে সে প্রশ্রয় দিতে চাহে না। অবশ্য সুপ্রিয়া সম্পর্কে সে আশঙ্কা একেবারেই নিরর্থক।

সুপ্রিয়া সেদিন দেখিল চা পান পর্ব্ব শেষ করিয়া অন্যমনস্ক সোমনাথ সম্মুখস্থ প্রস্ফুটিত রজনীগন্ধার পানে অপলক দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছে। তাহার উপস্থিতিতে এই অন্যমনস্কতায় সুপ্রিয়া মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়, কিন্তু কেন তাহা সে নিজেই জানে না। ইহা তাহার বিরাগ না প্রচ্ছন্ন অভিমান তাহা সে কখনও বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই! তাহার মনে হয়, ইহা যেন তাহাকে অবজ্ঞা! না, বিনাপরাধে সে অবজ্ঞা সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। সহসা চায়ের পেয়ালা পড়িয়া গিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দ উঠিল। সোমনাথ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিতেই সুপ্রিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

—বেশ মানুষ! পেয়ালা ভাঙলে?

অপ্রস্তুত কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—তাইত! আমিই ভেঙ্গে ফেললুম?

দুষ্টামি করিয়া প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্যে সুপ্রিয়া কহিল,

—তবে কি আমিই ভেঙ্গে ফেললুম!

উভয়েই উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। প্রফেসর বাহিরে আসিয়া কহিলেন,

—কি ব্যাপার সোমনাথ!

—দেখ ত বাবা! সমীদা এমনই অন্যমনস্ক মানুষ যে চায়ের পেয়ালা ভেঙ্গে আমায় জিজ্ঞেস করছে পেয়ালাটা কি আমিই ভাঙলুম?

প্রফেসরের প্রশান্ত মুখখানা অনাবিল হাস্যে ভরিয়া গেল, কহিলেন,

—অন্যমনস্ক মানুষদের মনস্ক করবার জন্যেই ত তোমাদের মত মেয়েদের দরকার মা!

—ও দায় নিতে আমাদের দায় পড়েছে বাবা! তবে তোমার কাছে সত্যি কথাই বলি, কাপটা আমিই ভেঙ্গেছি!

—ভাঙাটা স্বীকার না করাই ছিল ভাল মা! কারণ, স্বীকার করলেও ওটা আর জোড়া লাগবে না।

—তবে এর আগেও যে আরও ছটা কাপ ভেঙ্গে ফেলেছি বাবা!

—তাইত ভাবছি, এত অল্প আয়াসে এই গুণপনা স্বীকার করার অর্থ কি? শুনেছি চীন দেশে নাকি চোদ্দ কাপের কম চা খেলে শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। তুমি যদি একটা কাপ ভেঙ্গেই স্বীকার করে ফেল, তবে তুমিও যে অসুস্থ হয়ে পড়বে মা!

অভিমান ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—কিন্তু কেন ভেঙেছি সে কথা জিজ্ঞাসা না করে তোমার এ ভাবে রায় দেওয়া উচিত হোলো না বাবা!

—ঠিক্ ত! ঠিক ত! আমাদের ভুল আমরা সংশোধন করতে রাজী! কি বল সোমনাথ! সোমনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল,

—অবশ্য তার আগে ভুলটা প্রমাণিত হওয়া দরকার!

—ঠিক ত! ঠিক ত! ভুলটা প্রমাণ করে দাও মা!

—চায়ের কাপে একটা গৎ তুলছিলুম বাবা! তাইতেই সব শুদ্ধ সাতটা কাপ ভেঙেছে।

সোমনাথ পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল,

—সরস্বতীর সুর সাধনায় সপ্তস্বরের রূপ নিতে গিয়ে সাত সাতটি পেয়ালা অকালে আত্মাহুতি দিলো!

দৃপ্ত কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—কিন্তু তাদের জীবনদানে সত্যিই সুর প্রাণ পেয়েছে! বলিয়াই দ্রুত চলিয়া গেল। ক্ষণপরে কয়েকটা পেয়ালাসহ রাজলক্ষ্মীকেও সঙ্গে লইয়া প্রবেশ করিল। সম্মুখস্থ টেবিলটায় পেয়ালা ক'টা সাজাইয়া চামচ দিয়া সুপ্রিয়া অত্যন্ত মৃদু আঘাতে সুর তুলিতে লাগিল। প্রথমটা সুর তাল ঝঙ্কার দিল না, কিন্তু দুই চারি মিনিট না যাইতেই সুরতরঙ্গে তিন জনেই সোজা হইয়া বসিলেন।

সুপ্রিয়া চক্ষু মুদিয়া আপন আনন্দে বাজাইয়া চলিয়াছে। একটা অনাবিল তৃপ্তি ও সাফল্যে তাহার মুখখানি মাধুর্য্যে স্বর্গীয় হইয়া উঠিয়াছে।

অপর তিনটি প্রাণী বিমুগ্ধ বিস্ময়ে উহার চম্পক-কলি তুল্য অঙ্গুলির পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। ও যেন সুরস্রষ্টা বাঙ্গালার বিটোভেন!

বাজনা থামিলে প্রফেসর কন্যাকে আনন্দে জড়াইয়া ধরিলেন। একটি বাক্যও উচ্চারিত হইল না, কিন্তু সেই স্তব্ধতার সৌন্দর্য্যে সোমনাথ অভিভূত হইয়া পড়িল। সুপ্রিয়া তিন জনকেই প্রণাম করিলে রাজলক্ষ্মী ও প্রফেসর ঘোষাল কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সোমনাথ কহিল,

—জীবনে এত আনন্দ আর কখনও পাইনি সুপ্রিয়া!

এই প্রশস্তিতে সুপ্রিয়া সঙ্কুচিত হইল, কহিল,

—কিন্তু আমি মিথ্যা বলেছি। চীনে-মাটির কাপ ভাবলেও এগুলো সবই আসলে কাঁসার পেয়ালা। অবশ্য একদিন চীনে-মাটির চায়ের পেয়ালা ভেঙেই আমার মাথায় এ খেয়াল ওঠে; কিন্তু ঠিক ঠিক সুর বার করতে চীনে-মাটির পেয়ালা আমায় সাহায্য করেনি।

সোমনাথ প্রসন্ন স্বরেই কহিল,

—হোক মিথ্যা। মিথ্যাকে আশ্রয় করেই যদি একদিন সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে এমন মিথ্যা আমি হাজার বার বলতে রাজী আছি।

এই উচ্ছ্বাসে সুপ্রিয়া পুলকোচ্ছল হইয়া উঠিল, কহিল,

—কিন্তু তোমার সত্য আবিষ্কারে একদিন সারা জগতে সাড়া পড়ে যাবে, আর আমার সত্য এই চারটি দেওয়ালের বাইরে প্রকাশ পাবে না।

—কেন সুপ্রিয়া!

—তা'র কারণ, আমার জগত খুবই ছোট। সেখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও আঙুলে গোনা যায়।

সোমনাথ দেখিল সুপ্রিয়ার চক্ষে তাহার মায়ের গম্ভীরতা! তাহার ভাষায় ভাসিয়া উঠিতেছে তেমনই গভীর রহস্য। সোমনাথ সহজ ভাবেই কহিল,

—বিপুলা চ পৃথ্বি। পৃথিবীর সংজ্ঞা অত ছোট নয় সুপ্রিয়া। এই পৃথিবীর কন্যা হওয়া কম গৌরবের নয়। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

অপর্ণাকে সে দিনের ঘটনা বিবৃত করিলে অপর্ণা এই সামান্য ব্যাপারে একদিকে যেমন উল্লসিত হইয়া উঠিল অপর দিকে তেমনই আশঙ্কিত হইয়া পড়িল।

উল্লাসের কারণ,—ইহারই মধ্যে অনুরাগের যে অবতারণা বা আভাস দেখা দিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে অনুকূল আবহাওয়ায় অগ্রসর হইলে একদিন তাহার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। সুপ্রিয়া সামান্যা নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সোমনাথকে দিয়াই সে স্বীকার করাইয়া লইতে চাহে। এই আগ্রহের মূল উৎসে অবগাহন করিলে প্রচ্ছন্ন বাসনার সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু···অপর্ণা শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—কিন্তু সুপ্রিয়ার প্রতিভার বিচ্ছুরণ উভয়ের মিলনের পক্ষে বিষম অন্তরায়! মিলন হইলেও তাহার পরিণাম সব সময় মধুময় হয় না। অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সঙ্গীতে ও বিজ্ঞানে দুইটি প্রতিভা যদি বিচ্ছেদের রেখা টানিয়া উভয়কে ধরণীর দুই মেরু প্রদেশে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নারীর সেবা ও সমর্পণের মধ্য দিয়াই পুরুষের চিত্ত বিশ্রাম পায়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রসারে যদি তাহা স্ফুরিত হইবার অবকাশ না পায়, তবে অসামান্যতার দাবীতে সুপ্রিয়া যত বড়ই হউক, প্রেমিকার ভূমিকায় তাহার গভীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সোমনাথের প্রতি সুপ্রিয়ার অনুরাগ যদি ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে সোমনাথের তৃপ্তির জন্যই সে যাহা কিছু করিয়াছে তাহা পরিসমাপ্তির সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাই মুখে সুপ্রিয়ার প্রতিভার প্রশংসা করিলেও অপর্ণা নীরবে তাহার পরবর্তী ঘটনার জন্য উৎসুক রহিল।

ইহার পর আরও দুইটি মাস কাটিয়া গেল। অবসর সময়ে সোমনাথ একদিন কহিল,—সুপ্রিয়া! আর কি গৎ তুললে? আর ত তোমার পেয়ালা তরঙ্গের সুর শুনতে পাই না?

সুপ্রিয়া অতি সাধারণভাবে কহিল,

—আর গৎ তুলিনি। কে অত খাটবে বল! ঐ গৎএর ভূত মাথায় চেপে ক'দিন রাতে আমার ভালো ঘুমই হয় নি। তা ছাড়া দুটো পেয়ালা গেছে ভেঙে, আর তিনটে গেছে হারিয়ে।

[illegible] আর কখনও পাইনি সুপ্রিয়া।

এই [illegible]তে সুপ্রিয়া সঙ্কুচিত হইল, কহিল,

—কিন্তু আমি মিথ্যা বলেছি। চীনে-মাটির কাপ ভাঙলেও এগুলো সবই আসলে কাঁসার পেয়ালা। অবশ্য একদিন চীনে-মাটির চায়ের পেয়ালা ভেঙেই আমার মাথায় এ খেয়াল ওঠে; কিন্তু ঠিক ঠিক সুর বার করতে চীনে-মাটির পেয়ালা আমায় সাহায্য করেনি।

সোমনাথ প্রসন্ন স্বরেই কহিল,

—হোক মিথ্যা। মিথ্যাকে আশ্রয় করেই যদি একদিন সত্যের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তবে এমন মিথ্যা আমি হাজার বার বলতে রাজী আছি।

এই উচ্ছ্বাসে সুপ্রিয়া পুলকোচ্ছল হইয়া উঠিল, কহিল,

—কিন্তু তোমার সত্য আবিষ্কারে একদিন সারা জগতে সাড়া পড়ে যাবে, আর আমার সত্য এই চারটি দেওয়ালের বাইরে প্রকাশ পাবে না।

—কেন সুপ্রিয়া!

—তা'র কারণ, আমার জগত খুবই ছোট। সেখানকার অধিবাসীর সংখ্যাও আঙুলে গোনা যায়।

সোমনাথ দেখিল সুপ্রিয়ার চক্ষে তাহার মায়ের গভীরতা! তাহার ভাষায় ভাসিয়া উঠিতেছে তেমনই গভীর রহস্য। সোমনাথ সহজ ভাবেই কহিল,

—বিপুলা চ পৃথ্বি। পৃথিবীর সংজ্ঞা অত ছোট নয় সুপ্রিয়া। এই পৃথিবীর কন্যা হওয়া কম গৌরবের নয়। বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল।

অপর্ণাকে সে দিনের ঘটনা বিবৃত করিলে অপর্ণা এই সামান্য ব্যাপারে একদিকে যেমন উল্লসিত হইয়া উঠিল অপর দিকে তেমনই আশঙ্কিত হইয়া পড়িল।

উল্লাসের কারণ,—ইহারই মধ্যে অনুরোধের যে অবতারণা বা আভাস দেখা দিয়াছে তাহা ধীরে ধীরে অনুকূল আবহাওয়ায় অগ্রসর হইলে একদিন তাহার অন্তরের অভিলাষ পূর্ণ হইবে। সুপ্রিয়া সামান্যা নহে, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সোমনাথকে দিয়াই সে স্বীকার করাইয়া লইতে চাহে। এই আগ্রহের মূল উৎসে অবগাহন করিলে প্রচ্ছন্ন বাসনার সন্ধান পাওয়া যায় কিন্তু···অপর্ণা শঙ্কিত হইয়া ভাবিতে লাগিল—কিন্তু সুপ্রিয়ার প্রতিভার বিচ্ছুরণ উভয়ের মিলনের পক্ষে বিষম অন্তরায়। মিলন হইলেও তাহার পরিণাম সব সময় মধুময় হয় না। অন্ততঃ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায় না। সঙ্গীতে ও বিজ্ঞানে দুইটি প্রতিভা যদি বিচ্ছেদের রেখা টানিয়া উভয়কে ধরণীর দুই মেরু প্রদেশে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় তবে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। নারীর সেবা ও সমর্পণের মধ্য দিয়াই পুরুষের চিত্ত বিশ্রাম পায়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের প্রসারে যদি তাহা স্ফুরিত হইবার অবকাশ না পায়, তবে অসামান্যতার দাবীতে সুপ্রিয়া যত বড়ই হউক, প্রেমিকার ভূমিকায় তাহার গভীর পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। তবে সোমনাথের প্রতি সুপ্রিয়ার অনুরাগ যদি ঐকান্তিক হয়, তাহা হইলে সোমনাথের তৃপ্তির জন্যই সে যাহা কিছু করিয়াছে তাহা পরিসমাপ্তির সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে। তাই মুখে সুপ্রিয়ার প্রতিভার প্রশংসা করিলেও অপর্ণা নীরবে তাহার পরবর্তী ঘটনার জন্য উৎসুক রহিল।

ইহার পর আরও দুইটি মাস কাটিয়া গেল। অবসর সময়ে সোমনাথ একদিন কহিল,—সুপ্রিয়া! আর কি গৎ তুললে? আর ত তোমার পেয়ালা তরঙ্গের সুর শুনতে পাই না?

সুপ্রিয়া অতি সাধারণভাবে কহিল,

—আর গৎ তুলিনি। কে অত খাটবে বল! ঐ গৎএর ভূত মাথায় চেপে ক'দিন রাতে আমার ভালো ঘুমই হয় নি। তা ছাড়া দুটো পেয়ালা গেছে ভেঙে, আর তিনটে গেছে হারিয়ে।

বিস্মিত কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—বিস্ময় লাগে সুপ্রিয়া তোমায় দেখে! আশ্চর্য্য তোমার খেয়ালী মন। তোমার আপন প্রতিভা সম্পর্কে তুমি এতটুকু সচেতন নও। কিন্তু কেন বলত? নিশ্চয়ই তুমি বুদ্ধিহীনা নও!

সুপ্রিয়া কোন উত্তর না দিয়া চক্ষু মুদিল। সোমনাথ কহিল,—উত্তর দাও না যে?

—উত্তর দিয়ে কি হবে! তুমি ত এসব পছন্দ কর না। সময়ে অসময়ে তুমি নানাভাবে কেবলই আমার পড়া নিয়ে অভিযোগ কর।

সোমনাথ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

—জানিনা, লেখাপড়ায় তোমার এত বিরাগ কেন। তবু মনে হয়, এ তোমার সত্যি কথা নয়। লেখাপড়া তুমি ভালোবাসো, লেখাপড়া তুমি যথেষ্ট করোও, কেবল লেখাপড়ার বিজ্ঞাপনটা তুমি এড়িয়ে চলতে চাও। কিন্তু কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির কি কোন মূল্যই তোমার কাছে নেই?

—ডিগ্রির মূল্য, হয়ত কেন নিশ্চয়ই আছে। ডিগ্রিহীনা বলেই কি আমি তোমার অসহ্য হব? আমার নিজস্ব কি কোন মূল্যই নেই?

সোমনাথ অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইয়া স্খলিত কণ্ঠে কহিল,

—ডিগ্রিহীনা বলে তুমি অসহ্য হবে; এমন অপদার্থ আমি? এতটা কঠিন মন্তব্যের জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না সুপ্রিয়া! মনে মনে আমি জানতুম তুমি আমায় শ্রদ্ধা কর।

সোমনাথের এই খেদোক্তিতে সুপ্রিয়া যেন অত্যন্ত লঘু হইয়া গেল। সত্যই সে সোমনাথকে শ্রদ্ধা করে। সে শ্রদ্ধায় এতটুকু কৃত্রিমতা নাই। সোমনাথ তাহাকে এভাবে প্রতিঘাত করিয়া বসিবে তাহা সে ভাবে নাই, তাই কি ভাবে কথাটাকে আবার সহজ খাতে প্রবাহিত করা যায় তাহা ভাবিতে গিয়া কহিল,

—তোমার ধারণা ভুল। পড়তে আমার আপত্তি নেই। আপত্তি শুধু শিক্ষার শেষে ঐ বৃত্তিগুলোতে। কিন্তু এ বয়সে কা'র কাছে পড়ব? তুমি আমায় পড়াবে?

সোমনাথ বিব্রতভাবে কহিল,

—জীবনে কোন দিন ছাত্র পড়াইনি, ও কাজ আমার নয়। তা ছাড়া আমার অবসরও কম। তুমি আপন চেষ্টায় পড়ে পরীক্ষা দাও। আমার মনে হয়, তোমার বাইরের সাহায্য প্রয়োজন হবে না।

—বেশ তাই হবে।

ভিক্ষুণীর অধম সুপ্রিয়া

প্রভু আজ্ঞা হইবে বিজয়া।

তাহার বলিবার ভঙ্গিতে সোমনাথ হাসিয়া ফেলিল, কহিল,

—পাকা মেয়ে! তবে জেনো রেখো তুমিও ভিক্ষুণী নও, আর আমিও তোমার প্রভু নই। আরও জেনে রেখো এ যুগটাও বৌদ্ধযুগ নয়।

দুষ্টামির হাসি হাসিয়া সুপ্রিয়া অতি-ভালমানুষীর স্বরে কহিল,

—বিস্মরণী-নদীতে ডুব দিয়ে স্মৃতিটা হারিয়ে গেছে সমীদা। গম্ভীর কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—ছাত্রীর পক্ষে এ স্বীকার গৌরবের নয় সুপ্রিয়া। তবে ভয় নেই, আমি তোমায় এ বিপদ থেকে উদ্ধার করছি। কণ্ঠ-চাতক বর্তমানে চা-বারি পান করলেই স্মৃতিটা আবার ফিরে আসবে।

কলহাস্যে মুখর হইয়া সুপ্রিয়া কহিল,

—সমীদা! তুমি বৈজ্ঞানিক না হ'লে ভালো সাহিত্যিক হ'তে পারতে।

—তুমিও সঙ্গীতানুরাগিণী না হলে ভালো বৈজ্ঞানিক হতে পারতে।

সুপ্রিয়া হাসিতে হাসিতে চায়ের জন্য স্থান ত্যাগ করিল।

সুপ্রিয়া [illegible] তবলে সেদিন যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিল তাহা আকস্মিক নহে। রাজলক্ষ্মী তাঁহার ছাত্রী-জীবনে খেয়াল ও ঠুংরীতে বহুবারই আন্তঃকলেজ প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছিলেন; এমন কি একবার সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানও অধিকার করিয়াছিলেন। কয়েকটি সন্তান অকালে বিনষ্ট হওয়ায় তাঁহার স্বাভাবিক উৎসাহ স্তিমিত হইয়া আসিয়াছিল। তাঁহার সন্তান সন্ততিদের মধ্যে সুপ্রিয়াই শেষ বয়সের একমাত্র কন্যা, যে মহাকালের অকাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছে। রাজলক্ষ্মীর সুপ্ত মাতৃত্ব ইহাকেই অবলম্বন করিয়া লালিত হইতেছিল। তাই, সুপ্রিয়ার খেয়ালী মনের খোরাক দিতে গিয়া কন্যাকে কিছুটা প্রশ্রয় না দিয়া উপায় ছিল না। সুপ্রিয়া নিজ খেয়াল খুসীমত লেখা পড়া গান বাজনা লইয়া থাকে। তবে রাজলক্ষ্মী স্বেচ্ছায় যেদিন সুপ্রিয়াকে সঙ্গে লইয়া তানপুরায় রেওয়াজ আরম্ভ করিলেন সেদিন সুপ্রিয়া বিনা দ্বিধায় মায়ের সঙ্গীত বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। বলা বাহুল্য সুপ্রিয়া কোনও দিন কোন প্রতিযোগীতায় যোগদান করে নাই এবং ঠিক সেই কারণেই তাহার যোগ্যতা সম্পর্কে তাহার সঠিক ধারণা ছিল না। রাজলক্ষ্মী কিন্তু কন্যার উন্নতিতে অত্যন্ত আশান্বিত হইয়া উঠিলেন এবং কোনও বড় ওস্তাদের স্মরণ লওয়া সম্ভবপর কিনা তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন।

সুপ্রিয়া কৃতিত্বের সহিত প্রাইভেটে পর পর ম্যাট্রিক ও আই এ পাশ করিয়া এবার বেথুন কলেজে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিল। কলেজ পরিবেশ তাহার মন্দ লাগিল না। বিচিত্র রুচির বিচিত্র বেশভূষায় মেয়েদের সে যেন নূতন করিয়া দেখিল। তাহাদের সঙ্গ ও সাহচর্য্যে সে যেন নূতন জগতের নিকট সংস্পর্শে আসিয়া পড়িল। মেয়েদের মধ্যে সে দেখিল শিল্পানুরাগিণী, সাহিত্যানুরাগিণী ও রাজনীতি অনুরাগিণী মেয়েদের সংখ্যাই অধিক। তন্মধ্যে রাজনীতির আবহাওয়ায় আজন্মবিধ্বর

প্রায় সকলেই [illegible]। এই রাজনীতি আবার বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত। কেহ কংগ্রেসী, কেহ সোশ্যালিষ্ট, কেহ কম্যুনিষ্ট আবার কেহ বা ফরোয়ার্ড ব্লক পন্থী! বিভিন্ন মতবাদের ঝগড়া তর্কে সময়ে অসময়ে আসর সরগরম হইয়া উঠে। সেদিন কি একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া কম্যুনিষ্ট মেয়েদের সহিত কংগ্রেসী মেয়েদের রীতিমত হাতাহাতি হইয়া গেল। অত্যন্ত লজ্জাকর এই পরিস্থিতি। দলের অন্তর্ভুক্ত না হইলে অপরের অপ্রীতিভাজন হইতে হয়। সুপ্রিয়া এসব পছন্দ করে না। ইহার মধ্যে কোথায় যেন ক্ষুদ্রতা ইতরতা জড়াইয়া রহিয়াছে। যে রাজনীতি সাধারণ ভদ্রবুদ্ধি লোপ করিয়া দেয় সে রাজনীতিকে সে শ্রদ্ধা করিতে পারে না।

তরুণ তরুণীর জীবনে দীর্ঘ তিনটি বৎসর বড় অল্প নহে। সোমনাথ সুপ্রিয়ার নিত্য সাহচর্য্য তাহাদের পরস্পরকে অতি নিকটে আনিয়া ফেলিয়াছে। ইহার মাধুর্য্য, উত্তাপ এখন উভয়েই অন্তর দিয়া অনুভব করে, তাই সুপ্রিয়া তাহার কলেজের দৈনন্দিন কলকোলাহলের অন্তরালে উন্মুখ হইয়া থাকে শেষ ঘণ্টাটির অপেক্ষায়! সে স্পষ্ট দেখিতে পায়, তাহার প্রত্যাবর্ত্তন আশায় সোমনাথ সাগ্রহে উন্মুখ হইয়া বসিয়া আছে! তাহার দীর্ঘ প্রশস্ত ললাটে স্তবকে স্তবকে কুঞ্চিত কেশরাশি অযত্নে বায়ুভরে ক্রীড়া করিতেছে। স্বপ্নদ্রষ্টা সোমনাথ কাহার স্বপ্ন দেখিতেছে কে জানে!

সুপ্রিয়ার জগতে আজ একছত্র সম্রাট সোমনাথ! আজ সে বালিকা নহে, কিশোরীও নহে। কালের হিন্দোল দোলায় দোলায়িত পরিপূর্ণ যৌবন সম্ভারে সমৃদ্ধা যুবতী সে। সে সোমনাথকে পরিপূর্ণ ভাবেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে। তাহার কামনা বাসনা সোমনাথকেই আশ্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে বাস করিতেছে। সে জানে, উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষ কোন বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষায় আছেন। সে শুনিয়াছে, এ মিলনের একমাত্র অন্তরায় নাকি তাহার বয়স। বিশ বৎসর বয়সে তাহার নাকি কী একটা

সঙ্কটজনক পীড়ার সম্ভাবনা আছে। আর সে সম্ভাবনা তাহাকে মৃত্যুর অমৃতলোকে পৌঁছাইয়া দিবার পক্ষে যথেষ্ট। উপর্য্যুপরি কয়েকটি সন্তান নষ্ট হইয়া যাওয়ায় রাজলক্ষ্মীর দৃষ্টি এ সম্পর্কে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং সজাগ। ইতিমধ্যেই ভট্টপল্লীতে যাগযজ্ঞে বহু অর্থ ব্যয়িত হইয়া গিয়াছে। তাহার নিজের অত্যন্ত আপত্তি সত্বেও কেবল মায়ের অশ্রু নিরোধ করিতেই সে কবচ ধারণ করিয়াছে। তাহার নিজের আস্থা এ বিষয়ে বিশেষ নাই। মৃত্যু চিন্তায় তাহার ভয় হয় না। সে ভাবে, মন্দ কি? অজানা বলিয়াই যে পরলোক ভয়াবহ হইবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? সেই অনাবিষ্কৃত দেশের সন্ধানে যাহারা যাত্রা করিয়া আজ পর্য্যন্ত প্রত্যাবর্ত্তন করে নাই তাহাদের মধ্যে বহু শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ব্যক্তি আছেন। তাঁহাদের নিকট সাহচর্য্যে সে উন্নততর জীবন লাভের অধিকারিণী হইবে। কিন্তু সোমনাথকে ফেলিয়া যাত্রা করিতে তাহার মন সরে না। তাহা ব্যতীত এই যাত্রার পিছনে যে করুণতা আছে তাহাও উপেক্ষণীয় নহে। তাহার পিতামাতার একমাত্র অবলম্বন সে। সেই পিতামাতা বহু দুঃখ পাইয়াছেন, সে আর তাঁহাদের দুঃখের উপলক্ষ হইতে চাহে না।

অপর পক্ষে বাঁচিবার আনন্দও কম নহে। সোমনাথ যেদিন তাহার সাফল্য-গৌরবে সারা বিশ্বের বিস্ময় সৃজন করিবে, সেদিন সে তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সেই গৌরবের অংশভাগিনী হইবে। সে সোমনাথের সান্ত্বনা। ক্লান্ত সোমনাথের সেবার অধিকারিণী হওয়াই কি কম গৌরবের?

সোমনাথ ভাবে, সুপ্রিয়া দিন দিন যেন বেশী শান্ত হইয়া আসিতেছে। চঞ্চলা মুখরা সুপ্রিয়া এখন গাম্ভীর্য্যের আবরণে নিজেকে আড়াল দিয়া রাখিতে চাহে। চটুলা কিশোরী সুপ্রিয়াকেই যেন সোমনাথ বেশী ভালবাসে। সোমনাথ ভালবাসে!

হাঁ, সোমনাথ সুপ্রিয়াকে ভালবাসে। কিন্তু সেই ভালবাসার পরিণাম লইয়া সে কোন দিন বিশেষ ভাবে নাই। এই ভালবাসা সহজ, সরল, স্বচ্ছ!

কেন ভালবাসে, কবে হইতে ভালবাসে, কী ভাবে ভালবাসে, এবং সে ভালবাসার প্রত্যুত্তরে সুপ্রিয়াও ভালবাসে কিনা তাহা লইয়া সোমনাথ নিজেকে প্রশ্ন করে নাই। সুপ্রিয়া যে যৌবনে ভর দিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে পারে, সে যে, যেকোন মুহূর্তে বিবাহের দ্বারা তাহার স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইতে পারে, সে স্বীকৃতির পরিণামে যে সে তাহার মাতৃত্বের দাবী জানাইতে পারে, এ সকল চিন্তা বৈজ্ঞানিক সোমনাথকে বিচলিত করে নাই।

সোমনাথের মা আজও সকল যুক্তি তর্কের ঊর্দ্ধেই অবস্থান করিতেছেন। মায়ের ইচ্ছাই সর্ব্বজয়ী। মায়ের ইচ্ছার লৌহকপাট ভেদ করিয়া অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুসাধ্য নহে। সুপ্রিয়াকে সে গ্রহণ করিতে পারে বিনা দ্বিধায়, কিন্তু মায়ের বিনানুমতিতে বা বিনা ইচ্ছায় নহে। ভালবাসার দুর্জ্জয় বেগে সোমনাথ কম্পমান নহে। সে ধীর স্থির। চারিদিকে যে পরিবেশ রচিত হইয়াছে, তাহা তাহাদের মিলনের সম্পূর্ণ অনুকূল। কিন্তু কোন পক্ষ হইতেই এই অনুকূলতার সাহায্য গ্রহণ করা হইতেছে না। সোমনাথ ভাবে ইহার নিশ্চয় কোন অর্থ আছে। অতি আগ্রহে অনর্থ সৃষ্টি করা তাহার দিক দিয়া নিশ্চয়ই সঙ্গত হইবে না। ফলে, রাজলক্ষী অপর্ণা গম্ভীর। সোমনাথ সুপ্রিয়া গম্ভীরতর!

মায়ের কথার ইঙ্গিত সোমনাথ হৃদয়ঙ্গম করে। তাহার জীবনের বন্ধুকে আহ্বান করিবার সাহস সে রাখে। কিন্তু এ কথাও সত্য, সম্পদের মাঝে সে বন্ধুকে সব সময় চেনা সহজ হয় না। সুপ্রিয়া কি দুর্দ্দিনের বন্ধু হইবার যোগ্যতা রাখে? সোমনাথ যেন মনে মনে কামনা করে আসন্ন দুর্দ্দিনের! সুপ্রিয়াকে সে পরিপূর্ণরূপেই পাইতে চায়। তারপর, সে তাহার দুরন্ত আহ্বানে ঝড়ের বেগে তাহাকে লইয়া যাত্রা সুরু করিবে। সুপ্রিয়ার এই অংশ এখনও সোমনাথের অনাবিষ্কৃত!

একমাত্র শর্মিষ্ঠাই বোধ হয় সহপাঠিনীদের মধ্যে সুপ্রিয়ার দৃষ্টি ও সমর্থন লাভ করিয়াছিল। দীর্ঘ একহারা ছন্দিত দেহ। বর্ণের অত্যধিক শুভ্রতা সহসা বাঙ্গালী মেয়ে বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া বিভ্রম ঘটায়। স্বরে ও আচরণে একটা দৃঢ়তা আছে, যাহা প্রথম দৃষ্টিতে কমনীয়তাপেক্ষা পৌরুষকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

শর্মিষ্ঠা স্বেচ্ছায় সুপ্রিয়ার সঙ্গে আলাপ জমাইল। সুপ্রিয়ার বৈশিষ্ট্য তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অপর পক্ষে সুপ্রিয়া দেখিল শর্মিষ্ঠার কোন রাজনৈতিক মতবাদের বালাই নাই। অথচ প্রতি তর্ক সভায় সে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করে। বাকপটুতায় সে সাধারণের পর্য্যায়ে পড়ে না। তাই ফরোয়ার্ডব্লকপন্থী ও কংগ্রেসীর কলহে সে কমুনিষ্ট বুলি আওড়াইয়া উভয় পক্ষকে শান্ত করে, আবার সোস্যালিষ্ট-কমুনিষ্ট কলহে সে কংগ্রেসী পক্ষ সমর্থন করিয়া দুইদলের মীমাংসায় সাহায্য করে। শর্মিষ্ঠাকে সকলেই দলে পাইতে চাহে, কারণ সকলের ধারণা তাহার অন্তর্ভুক্তিতে দল সমৃদ্ধ হইবে, কিন্তু শর্মিষ্ঠা সর্ব্বদাই দলগত রাজনীতির উর্দ্ধে!

সুপ্রিয়া শর্মিষ্ঠার এই নিষ্ক্রিয় এবং নির্লিপ্ত আধিপত্য উপভোগ করিয়া তাহার আহবানে সাদরে সাড়া দিল। শর্মিষ্ঠাও সুপ্রিয়ার ভিতর যে অসামান্যতা আছে তাহার সন্ধান চাহে। অল্প পরিচয়েই সে জানিতে পারিয়াছে যে, সুপ্রিয়া শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, সঙ্গীতে, কলায়, তাহাদের অনেক উর্দ্ধে!

কিন্তু সাধারণ মেয়ের মত সে তাহার নিজের পরিচয় লইয়া মাতামাতি করিল না এবং সুপ্রিয়াকেও পারিবারিক প্রশ্নে আপ্যায়িত করিল না। সুপ্রিয়ার ইহা ভালই লাগিল। উভয়ে অবসর সময়ে ক্লাশের নোট ও গান বাজনা লইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

ছয় মাস না যাইতেই কলেজের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন আরম্ভ হইল। সুপ্রিয়া এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ তাই স্বেচ্ছায়

অগ্রসর হইয়া আসিল না। শর্মিষ্ঠা মিসেস লোমের সাহায্য করিতে লাগিল। এ বিষয়ে তাহার সাহায্য অপরিহার্য। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় তাহার পরে কর্তৃপক্ষ নির্ভরশীল। একদিন ছাপার অক্ষরে প্রতিষ্ঠা-দিবস কর্মসূচী বাহির হইলে দেখা গেল সুপ্রিয়া বিদায়-অভিশাপে দেবযানীর ভূমিকা লাভ করিয়াছে এবং কচের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে শর্মিষ্ঠা স্বয়ং। ক্লাসিক সঙ্গীতে খেয়ালে তাহার নামটা বড় বড় অক্ষরেই ছাপা হইয়াছে। সুপ্রিয়া শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল,

—একি করেছ ভাই শর্মিষ্ঠা! আমি যে কখনও আসরে গাই নি; ষ্টেজে অভিনয়ও কখন করিনি।

—যা আগে কখনও করনি তা ভবিষ্যতে কখনও করবে না এমন কিছু কি প্রতিজ্ঞা আছে তোমার? নার্ভাস হবার কিছুই নেই। এখানে মেয়েরাই অভিনয় করে, মেয়েরাই দেখে। কয়েকজন বিচারপতি, মেয়র, দু'চার জন সাহিত্যিক ও স্বল্প সংখ্যক সঙ্গীতজ্ঞ এখানে নিমন্ত্রিত হয়ে আসেন মাত্র!

—কিন্তু আমি ভাবছি……

—তুমি যা ভাবছ তা ভাবতে পাবে না। কারণ, এখন প্রোগ্রাম পাল্টান সম্ভব নয়। বরং তুমি ভাবো, যাতে তুমি সম্মানের সঙ্গে তোমার কর্তব্যটুকু করতে পারো। মনে রেখো, তোমার সাফল্য মানে আমার সাফল্য, কলেজের সাফল্য।

সুপ্রিয়া হাসিয়া কহিল,

—আমার সাফল্যে তোমার সাফল্য কি রকম?

—সিলি গার্ল! ভুলে যাচ্ছ, তুমি আমারই আবিষ্কার! এখনও পর্য্যন্ত কলেজে তোমায় চেনে কে? তোমার সাফল্যের পাদপীঠে আমার সম্মান আরও উচ্চে আসন লাভ করবে। বলিয়াই সুপ্রিয়ার গ্রীবাপ্রান্ত নাচাইয়া ছাড়িয়া দিল।

সুপ্রিয়া দেখিল অব্যাহতি নাই। শর্মিষ্ঠা তাহার কোন কথাই কানে তুলিবে না। ভয়ে ভয়ে কথাটা সোমনাথের কানে তুলিল। সোমনাথ উৎসাহিত করিয়া বলিল,

—ভালই ত! তুমি যেটুকু শিখেছ তার সমঝদার চাই। Proper appreciation হওয়া দরকার। না না, তোমার শর্মিষ্ঠা ঠিকই বলেছে, তুমি নার্ভাস হয়ে পড়েছ।

—আমি কিন্তু কখনও অত লোকের সামনে আসরে নামিনি। তুমি যাবে সেদিন?

সোমনাথ হাসিয়া কহিল,

—আমি যে অবাঞ্ছিত অতিথি! আমার ত সেখানে প্রবেশাধিকার নেই।

—শর্মিষ্ঠাকে দিয়ে সে ব্যবস্থা আমি করিয়ে দেবো, কারণ বাইরের দু'চারজন বিশিষ্ট অতিথিও থাকবেন।

—ধন্যবাদ তোমার শর্মিষ্ঠাকে। কিন্তু অতগুলি মেয়ের মধ্যে আমিও যদি নার্ভাস হয়ে পড়ি তবে সেটা কারও পক্ষেই উপভোগ্য হবে না। তা'তে তোমার উপকার না হয়ে অপকারই হবে। তুমি একাই যাও। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি শ্রেষ্ঠ জয়ের মালা তোমার কণ্ঠে আনন্দে দুলছে।

সুপ্রিয়া অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে কহিল,

—এ যেন সবাই মিলে ষড়যন্ত্র করে আমায় চক্রব্যূহের মাঝে ঠেলে দেওয়া! তুমি পুরুষ মানুষ হয়ে নার্ভাস হবে? মিথ্যে কথা!

সোমনাথ উচ্চ হাস্যে কহিল,

—ভয় নেই, সুপ্রিয়া ভয় নেই! চক্রব্যূহে এবার অভিমন্যুর অকাল মৃত্যু হবে না বরং সপ্তরথীর রথধ্বজাই ধুলোয় লুণ্ঠিত হবে এ আমি জোরের সঙ্গেই বলছি।

—তোমার জোরে যে আজ জোর পাচ্ছ না।

—কারণ আমার 'পরে তোমার বিশ্বাসের অভাব ঘটেছে। এর জন্য হয়ত তুমিও সবটা দায়ী নও, দায় আমারও কিছুটা আছে।

—অর্থাৎ অনুরোধের উত্তরে পৃষ্ঠ ভঙ্গ দেওয়াটার যুক্তি নেই, তাই জোরও নেই। পরে সুপ্রিয়া স্বর নামাইয়া সাগ্রহে কহিল,

—তবে তুমি মত দিলে ?

—না। ভীমসেন সেদিন অভিমন্যুকে চক্রব্যূহের দ্বারপথে পৌঁছে দিয়েই সরে পড়েছিলেন, তাকে অনুসরণ করে কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অদৃষ্টের ওপর আক্রোশ করে লাভ নেই।

একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস মোচন করিয়া সুপ্রিয়া কহিল,

—তা' হলে মনে রেখো ঠিক ছটায় আমায় চক্রব্যূহের দ্বারপথে পৌঁছে দিতে হবে।

—অর্থাৎ তোমার সারথ্য গ্রহণ করতে হবে। বেশ, তা'তে আমার অমত নেই।

যথা নির্দ্দিষ্ট তারিখে ঠিক ছয়টার সময় সোমনাথ তাহার নিজের 'কারে' করিয়া সুপ্রিয়াকে কলেজে পৌঁছাইয়া দিল। সুপ্রিয়া নামিয়া গেলে দৃঢ় অথচ মৃদুকণ্ঠে সোমনাথ কহিল,—নার্ভাস হোয়ো না সুপ্রিয়া। তোমার সত্যকার মূল্য সকলকে জানিয়ে দাও।

ইহা যেন অনুরোধ নহে—আদেশ! সুপ্রিয়া সকল দুর্ব্বলতা পরিহার করিয়া দৃঢ় পদক্ষেপে কলেজ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল।

সাতটায় আসর বসিবে; কিন্তু সুপ্রিয়া কোথাও শর্ম্মিষ্ঠাকে খুঁজিয়া পাইল না। হয়ত সে হোষ্টেলের নিজ কক্ষটিতে প্রসাধনে ব্যস্ত আছে। সুপ্রিয়া জানিত শর্ম্মিষ্ঠা হোষ্টেলে থাকে। সহরের বিশিষ্ট ধনীগৃহে তাহার জন্ম। তাহার পিতা সহরের বিশিষ্ট নাগরিক। অলক চৌধুরীর

আর বাড়ীর কথায় কে না জানে। শর্ম্মিষ্ঠা কিন্তু কোন দিন বাড়ী যায় না। ছুটিতেও না। মাঝে মাঝে তাহার পিতা আসিয়া তাহাকে দেখিয়া যান। কোন কোন দিন ইচ্ছা হইলে সে পিতাকেই গাড়ীখানা পাঠাইতে বলিয়া দেয়। তাহার খুশীমত সহরের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত সে অলস সন্ধ্যায় ঘুরিয়া আসে। সুপ্রিয়া ভাবে, হয়ত ইহার পশ্চাতে এমন কোনও পারিবারিক ঘটনা আছে যাহা জানিতে যাওয়া শোভন বা সঙ্গত নহে। অবশ্য সে জানিতে না চাহিলেও অতি আগ্রহশীলা অপর মেয়েরা কখনও কখনও জানিতে গিয়া ধমক খাইয়াছে।

ঠিক সাড়ে ছয়টায় শর্ম্মিষ্ঠা আসিয়া প্রথমেই সুপ্রিয়াকে দেখিয়া জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—মাই লভ্! সুপ্রিয়া!

সুপ্রিয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

—কচের দুর্ব্বলতায় দেবলোক ধিক্কার দিয়ে উঠ্ছে শর্ম্মিষ্ঠা!

শর্ম্মিষ্ঠা উচ্চ হাস্যে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল—না, আর ভয় নেই। গ্যারান্টি দিয়ে বলছি তুমি অনায়াসে অনার্স নিয়ে পাশ করবে।

ওদিকে পাদ-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল। ঐক্যতান বাদন সুরু হইয়াছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত, আধুনিক-সঙ্গীত, ঠুংরী, খেয়াল! মেয়েরা সাধ্যমত নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী আসরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া, সঙ্গে সঙ্গে করতালি ধ্বনি সংগ্রহ করিয়া গ্রীনরুমে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিল।

সুপ্রিয়া ঘোষাল্!

শান্ত সমাহিত ভঙ্গিতে সুপ্রিয়া তানপুরা লইয়া প্রবেশ করিল। দীর্ঘ বিলম্বিত লয়ে মৃদুস্বরে সুপ্রিয়া একখানি শুক্লা বেলাবলি আলাপ আরম্ভ করিল। তবলচী যতীন বাবু এতক্ষণে যেন সম্ভ্রমে সোজা হইয়া বসিলেন। সুপ্রিয়ার কোকিল কণ্ঠ উচ্চ হইতে উচ্চতর গ্রামে আরোহণ অবরোহণ করিতে লাগিল। সুরের ব্যঞ্জনায় সভা মুগ্ধ হইয়া গেল। তানের বিস্তারে ও বিভঙ্গতায়, মূর্চ্ছনা মীড় ও গমকে সুরের ইন্দ্রজাল

হরণ করিয়া সুপ্রিয়া [illegible] পাগল করিয়া তুলিল। যে [illegible] সঙ্গীতজ্ঞ গুণী সভায় আমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিলেন সঙ্গীত শেষে তাঁহারা পরস্পরের মুখের পানে বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। গানের চালে ঘরওয়ানা গোপন থাকে নাই ; কিন্তু কাহার ছাত্রী এ মেয়েটি ? আজ পর্য্যন্ত কোনও আসরে ইহার দর্শন মিলে নাই কেন ?

ইহার পরও বিস্ময় ছিল। আবৃত্তি আরম্ভ হইল। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, শ্রেষ্ঠদান প্রভৃতি আবৃত্তি যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা লাভ করিল।

পর্দ্দা উঠিল। বসন্তের পরিবেশ পরিবেষণ করা হইয়াছে। বাসন্তী আলোকে মঞ্চ স্বপ্ন-সুষমা সৃজন করিয়াছে। কোকিলের কুহুতানে দর্শক চিত্ত পুলকিত। পুষ্পধনু হস্তে মদন ও পুষ্পসম্ভার লইয়া রতি প্রবেশ করিয়া একখানি গীত গাহিতে গাহিতে সারা মঞ্চ ফুলে ফুলময় করিয়া চলিয়া গেল।

দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইল। দেখা গেল, দেবযানী আপন মনে পুষ্প-মাল্য রচনা করিতে করিতে গুন গুন স্বরে গান গাহিতেছে। কচ প্রবেশান্তে বিদায় বার্ত্তা নিবেদন করিয়া কহিল,

—সুকল্যাণ হাসে
প্রসন্ন বিদায় আজি দিতে হবে দাসে।

মুহূর্ত্তে দেবযানী বেদনায় বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার ক্ষুব্ধ বেদনাতুর হৃদয় হইতে অপূর্ব্ব ঝঙ্কারে বাহির হইয়া আসিল,

হাসি ? হায় সখা, এ তো স্বর্গপুরী নয়।
পুষ্পে কীটসম হেথা তৃষ্ণা জেগে রয়
মর্ম্ম-মাঝে, বাঞ্ছা ঘুরে বাঞ্ছিতেরে ঘিরে
লাঞ্ছিত ভ্রমর যথা বারম্বার ফিরে
মুদ্রিত পদ্মের কাছে। হেথা সুখ গেলে
স্মৃতি একাকিনী বসি দীর্ঘশ্বাস ফেলে
শূন্যগৃহে ; হেথায় সুলভ নহে হাসি।

তাহার পর দেবযানী কচকে অপূর্ব কৌশলে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। কখনও রুষ্ট হইয়া, কখনও ক্ষুব্ধ হইয়া, কখনও ভালবাসার বাহুদণ্ড বুলাইয়া, কখনও তাহার পৌরুষকে আঘাত করিয়া, কখনও বা তাহার দেবত্বের নিকট আবেদন জানাইয়াও যখন তাহার সকল কৌশল ব্যর্থ হইল, তখন নারীত্বের গৌরব গাথায় পুরুষকে লঘু করিবার দুর্জয় সঙ্কল্পে সে দৃঢ় হইল। দৃপ্ত মাধুর্যে গ্রীবা উন্নত করিয়া কহিয়া উঠিল,

বিদ্যারি লাগিয়া শুধু লোকে দুঃখ সহে
এ জগতে? করেনি কি রমণীর লাগি
কোনো নর মহাতপ? পত্নীবর মাগি
করেন নি সম্বরণ তপতীর আশে
প্রখর সূর্যের পানে তাকায়ে আকাশে
অনাহারে কঠোর সাধনা কত? হায়,
বিদ্যাই দুর্লভ শুধু, প্রেম কি হেথায়
এতই সুলভ!

নিষ্পলক দৃষ্টিতে দর্শকজন মঞ্চের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াছে। কিন্তু সকল ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া কেবল যেন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই সজাগ রহিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি ইহা যে অভিনয় তাহা যেন সকলেই ভুলিয়া গিয়াছেন।

ভাবের এমন অপরূপ অভিব্যক্তি ইতিপূর্বে বুঝি কেহ কল্পনাও করে নাই। তাই শেষে দেবযানী যখন কচকে অভিশাপ দিয়া কহিল,

—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ;
শিখাইবে, পারিবে না করিতে প্রয়োগ।

এবং কচ দেবদূলভ তাঁহাকে কহিল,—

আমি বর দিনু, দেবী, তুমি সুখী হবে।

ভুলে যাবে সর্ব্বগ্লানি বিপুল গৌরবে।

তখনও কচ দর্শক চিত্তে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি সঞ্চার করিতে সক্ষম হইল না; সকলেই কচের হৃদয়-হীনতায় বিরক্ত এবং দেবযানীর প্রতি সমবেদনার সংবেদনশীল হইয়া উঠিলেন। একেবারে শেষের দিকে দেবযানীর ব্যর্থ হৃদয়ের শুষ্ক দর্প-হারা দৃষ্টিতে যে ভাবাতীত মর্মব্যথার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিল, তাহা সকলের অন্তর নিঙাড়িয়া হাহাকারে পূর্ণ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠানের শেষে বিচারপতি সেন সুপ্রিয়াকে বিশেষভাবে অভিনন্দিত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিলেন,—জীবনে বহু সাংস্কৃতিক সম্মেলনে পৌরহিত্য করবার গৌরবলাভ করেছি, কিন্তু আজকের অনুষ্ঠানটির সঙ্গে বুঝি সে সবের তুলনা হয় না। সঙ্গীতে, আবৃত্তিতে কুমারী সুপ্রিয়া ঘোষাল যে অনবদ্য রস সৃষ্টি করেছেন তার যোগ্য প্রশংসা করবার যোগ্যতা আমার নেই। এক কথায় এইমাত্র বলতে পারি, আমরা সে সময়টুকু যেন স্বর্গরাজ্যে অতিবাহিত করেছি। এই দরদ, এই প্রাণ সঞ্চার, অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে সম্ভবপর তা আজকের আসরে যাঁরা উপস্থিত হবার সৌভাগ্য লাভ করেন নি, তাঁরা যত বড় গুণীই হোন, তাঁরা তা কল্পনা করতে পারবেন না। আমি আমার কন্যাস্থানীয়া মেয়েটির দীর্ঘ গৌরবময় জীবন কামনা করছি এবং আমার অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতিস্বরূপ একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি জানাচ্ছি।

তুমুল জয়-ধ্বনির মধ্যে সভাপতি অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করিলেন। সুপ্রিয়ার অভিনয় সাফল্যে কলেজের সকলেই গৌরবান্বিতা। তৃতীয় দিনে শর্মিষ্ঠা তাহাকে একরূপ বন্দি করিয়া আনিয়া হোস্টেলে নিজ কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল, কহিল,

—সুপ্রিয়া। তোমার অভিনয় বাস্তব।

সুপ্রিয়া বিচলিত হইলেও নিমেষে নিজেকে সংবরণ করিয়া ফেলিল, হাসিয়া কহিল,

—অর্থাৎ? শর্মিষ্ঠার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিন্তু সুপ্রিয়ার এই মুহূর্তের ছলনা গোপন রহিল না, সে কহিল,

—তোমার আসল রুচের সংবাদ তুমি অতি সযত্নে গোপন রেখেছ। তোমার আত্মনিবেদন সেই আসল রুচেরই উদ্দেশ্যে।

প্রত্যুত্তরে সুপ্রিয়া ততোধিক গাম্ভীর্যের সহিত কহিল,

—আমার উনিশ বৎসর বয়সে কি আমায় রুচি বলে সন্দেহ হয়?

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হইল। সে স্পষ্ট বুঝিল, সুপ্রিয়া তাহাকে গোপন করিতে চাহিতেছে। তাই কৌশলে কথাটা ঘুরাইয়া দিল, কহিল,

—রুচি সংসদের সভ্যা হ'লে খুব বেশী বেমানান লাগবে না। যাক্, তোমার সাফল্যে সত্যিই আমার সম্মান বেড়ে গেছে। মিসেস সোম কাল বলছিলেন—শর্মিষ্ঠা, এবারের সাফল্যে তোমার কৃতিত্বই ষোল আনা।

—বহুবার শর্মিষ্ঠা দেবী, আমারও অভিনন্দন গ্রহণ করুন।

শর্মিষ্ঠা হাসিতে হাসিতে কহিল,

—বেথুনের সারা বার্ণার্ড! তোমার যোগ্য সমাদর বাংলা দেশে হোক এই প্রার্থনা করি। হাঁ, আসছে বারে তুমি হ'বে জুলিয়েট আমি রোমিও।

বিস্ময়বিস্ফারিতনেত্রে সুপ্রিয়া কহিল,

—এক বৎসর আগেই প্রোগ্রাম ও প্রতিশ্রুতি? অসম্ভব। সারা বার্ণার্ডের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র ঈর্ষা নেই। জেনে রাখো, প্রশংসার লোভে দ্বিতীয়বার মঞ্চে আমি অবতরণ করবো না।

তাহার স্বরের দৃঢ়তায় শঙ্কিত মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না।

সপ্তাহ অন্তে কণ্ঠে স্বর্ণপদক ঝুলাইয়া সোমনাথের সম্মুখে বিজয়িনীর ভঙ্গিতে কটিদেশে দুই হাত রাখিয়া সুপ্রিয়া কহিল,

—তোমার শ্রেষ্ঠ জয়ের মালা!

—কিন্তু তোমার এ মালা না দোলাতে আপনি দোলে। ভেবে পাই না, এ তোমার মালার গুণ না গলার গুণ!

—জানিনা যাও! বলিয়াই পদকটা সহসা সোমনাথের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া সুপ্রিয়া দ্রুত আত্মগোপন করিল। সোমনাথ ডাকিলে সে আর সাড়া দিল না। কিন্তু বেশীক্ষণ অন্তরালে থাকাও সমীচীন নহে, কারণ, চা পিপাসু সোমনাথ চায়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে।

চা লইয়া প্রবেশ করিতেই সোমনাথ সহাস্যে কহিল,

—সঙ্গীত শাস্ত্রে আমি অনভিজ্ঞ, তাই পদকটা অভিমানে গুমরে উঠছে। ওর যোগ্যস্থান তোমার কণ্ঠেই! বলিয়া সোমনাথ অতি সযত্নে পুনরায় সুপ্রিয়ার কণ্ঠে পদকটা পরাইয়া দিল।

এবার সুপ্রিয়া কোন উত্তর না দিয়া একটি ভক্তিনম্র আনত প্রণামান্তে শান্তভাবে সে স্থান ত্যাগ করিল।

এই ইঙ্গিতপূর্ণ প্রণামে সোমনাথ অভিভূত হইয়া পড়িল। সহসা যেন একটা আনন্দের ঝড় তাহার বুকের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল।

বাহিরে কিন্তু সে আন্দোলনের একটি কণাও প্রকাশ পাইল না! শান্ত সমাহিত সোমনাথ।

শর্মিষ্ঠার সন্দেহ যে সত্য তাহা প্রমাণিত হইবার পূর্ব্বেই শর্মিষ্ঠা তাহাকে ধ্রুব সত্য বলিয়া ধারণা করিয়া বসিল। সুপ্রিয়া তাহাকে গোপন করিয়া তাহার বন্ধুত্বের অপমান করিয়াছে মনে করিয়া সে অন্তরে নারী সুলভ ঈর্ষার জ্বালা অনুভব করিতে লাগিল। শর্মিষ্ঠা স্বভাবতঃ অনুদার নহে। সুপ্রিয়ার শ্রেষ্ঠত্ব সে অকুণ্ঠভাবেই স্বীকার করিয়া লইয়াছে, কিন্তু পরাজয়ের আঘাতও সে সহ্য করিতে প্রস্তুত নহে। সুপ্রিয়াও যদি স্বাভাবিক ঔদার্য্যে তাহার হৃদয়-দ্বন্দ্বের কাহিনী কিছুটা প্রকাশ করিত তবে হয়ত এ প্রশ্ন উঠিত না। কিন্তু সুপ্রিয়ার গোপনতাই তাহাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। উত্তেজনার শেষে আপন মনে একবার হাসিয়া সে বলিল, সে কি সুপ্রিয়ার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী? কেন সে সামান্য কারণে উত্তেজিতা হইতেছে? পরক্ষণে নিজেই তাহার উত্তরে কহিল, সুপ্রিয়াকে এই লুকাচুরীর জবাব না দিলে সে শান্তি পাইবে না। অতএব... ...

অতএব পরের রবিবারেই 'কার' লইয়া সে সকাল ও সন্ধ্যায় দুইবার সুপ্রিয়ার বাড়ীর আশপাশে ঘুরিয়া আসিল কিন্তু আশানুরূপ কিছুই লক্ষিত হইল না। তাই বলিয়া সেইখানেই সে নিরস্ত হইল না। নানাভাবে সে সংবাদ সংগ্রহ করিতে প্রয়াস পাইল। সে জানিতে পারিল প্রোঃ ঘোষালের প্রিয় শিষ্য স্কলার সোমনাথই সুপ্রিয়ার দুর্ব্বলতম অংশ! ঘটনাক্রমে একদিন সোমনাথকে চিনিবার সুযোগও ঘটিয়া গেল। কিন্তু পরবর্ত্তী প্ল্যানটা স্থির করিতে গিয়া সে অস্থির হইয়া পড়িল।

আত্ম-সমাহিত সোমনাথকে দেখিয়া সে কিছুটা নিরাশ হইয়া পড়িল। এ ধরণের পুরুষের সহিত লাবলীল ভঙ্গিতে তুচ্ছ বিষয় লইয়া আলাপ জমান শক্ত! গভীর বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ও সর্ব্বদা মগ্ন! সুপ্রিয়া তাহার

মগ্নচৈতন্যে হয়ত নবচেতনার সঞ্চার করিতে সক্ষম হইয়াছে এবং ঠিক সেই কারণেই ও মাত্র সুপ্রিয়াকেই সাড়া দেয়। তৃতীয় পক্ষের আবির্ভাবে ও হয়ত একেবারেই যৌন মূক হইয়া যাইবে এবং সে ক্ষেত্রে সুপ্রিয়াকে জয় করিতে গিয়া সে নিজেই জব্দ হইয়া আসিবে। তথাপি ... ...

তথাপি সে থামিতে চাহিল না। সোমনাথের সম্মুখেই তাহাকে তুচ্ছ করিয়া দিবার দুর্বার আবেগে সে সকল বাধা অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিল। ভাবিল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে ক্ষতি কি? সত্যইত সে সুপ্রিয়ার প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বিনী নহে, কাজেই তাহার দুর্বলতার কোন কারণ নাই। যদি সক্ষম হয়, সে সুপ্রিয়াকে উচিত মত শিক্ষা দিয়া তাহার সুবোধ গ্রহণ করিবে, যদি না হয়, তাহা হইলেও হৃদয়-ভঙ্গজনিত পীড়ায় তাহাকে শয্যাশায়ী হইতে হইবে না।

সে দিন সবে মাত্র চা পরিবেশন করিয়া সুপ্রিয়া সোমনাথকে কি একটা বলিতে যাইবে এমন সময় দেখিল শর্মিষ্ঠা নিজেই গাড়ীর ব্রেক কষিয়া তাহাদের গেটের সম্মুখে থামিয়া পড়িল। বিনা আমন্ত্রণে সহসা শর্মিষ্ঠার এই আগমন সুপ্রিয়াকে চিন্তিত করিয়া তুলিল। শর্মিষ্ঠা সোজা নামিয়া আসিয়া তাহাদের সম্মুখে সহজ ভঙ্গিতে অভিবাদন করিয়া সহাস্যে কহিল,

—সুপ্রিয়া তোমার নিমন্ত্রণ রাখতে এতদিন দেরী হয়ে গেল বলে কিছু মনে কোরো না ভাই! আপনি নিশ্চয় সোমনাথ বাবু! আপনার সম্বন্ধে সত্য মিথ্যা এত শুনেছি যে আপনাকে চিনতে মোটেই অসুবিধা হয় না। নমস্কার! প্রত্যুত্তরে সোমনাথও মৃদু হাসিয়া প্রতি-নমস্কার করিয়া কহিল,

—নমস্কার! আমার সম্বন্ধে মিথ্যা বলাটা অস্বাভাবিক নয় কারণ আজও আমি সত্যের সন্ধান পাইনি। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে আপনার বন্ধুটি এত অল্প বলেছেন যে তাইতেই বুঝেছি, আপনার মূল্য আমার চেয়ে অনেক বেশী।

শর্মিষ্ঠা দেখিল তাহার আশঙ্কা অমূলক। বাক্‌চাতুর্যে সোমনাথ শিশু নহে। কিন্তু তাহার প্রাথমিক অভিনয় ভালই হইয়াছে। সুপ্রিয়া তাহার নির্জলা মিথ্যাভাষণের প্রথম আঘাত এখনও ঠিকমত সামলাইতে পারে নাই। সে প্রাণপণ শক্তিতে বিস্ময় ও বিতৃষ্ণা গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, যাহার ফলে সে এখনও তাহাকে প্রাথমিক সম্ভাষণ জানাইতে সক্ষম হয় নাই। ভয়, পাছে নিজেকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলে। শর্মিষ্ঠা সুপ্রিয়াকে গ্রাহ্য না করিয়া সোমনাথের মন্তব্যের প্রত্যুত্তরে কহিল,

—মূল্যবান বস্তু সংসারে দুর্লভ। কিন্তু তাই বলে তার আলোচনাটাও দুর্লভ হবে এ যুক্তি ভালো বুঝতে পারলুম না।

—বুঝতে না চাইলে আমাকে নিরুত্তর হতে হয়। কিন্তু আপনিই বলুনত ক'টা গরীব চাষীর ঘরে কোহিনুরের আলোচনা হয়? অথচ সংসারে তাদের সংখ্যাই ত বেশী?

—বিনয়ের প্রতিযোগীতায় হার স্বীকার করছি সোমনাথ বাবু! তবে আপনার কথার জের টেনেই বলছি, গরীব চাষীর সুমুখে সত্যিই যদি কোহিনুর ধরা যায়, তবে তার অবস্থাটা কি রকম হয় আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন? কথাটা ঘুরাইয়া দিয়া সোমনাথ কহিল,—হয়ত পারি, কিন্তু সব কথা সব সময় বলা উচিতও নয় শোভনও নয়। পরে সুপ্রিয়ার পানে চাহিয়া কহিল,—সুপ্রিয়া! তোমার বন্ধুটি আমাকে দিয়েই তাঁর মূল্য যাচাই করিয়ে নিতে চান। কিন্তু আর কথা বাড়িয়ে কায নেই। তোমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে উনি তোমার সম্মানিত অতিথি। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ওঁর যোগ্য সমাদর কর।

সুপ্রিয়া এতক্ষণে স্বাভাবিক হইয়া আসিয়াছে। সে স্মিত হাস্যে শান্ত কণ্ঠেই কহিল—ওর কাছে বন্ধুত্বের দাবীটাই বড়, তাই আতিথ্যের সম্ভাবনা গ্রাহ্য না করেই আজ ও এসেছে। তা ছাড়া তোমার সঙ্গে আলাপ করবার

আগ্রহ ওর এত প্রবল যে হাইফেনের প্রয়োজন ও অনুভব করে না। শর্ম্মিষ্ঠাকে সুপ্রিয়া যেন ইচ্ছা করিয়াই আঘাত হানিল। শর্ম্মিষ্ঠা সে আঘাত উপেক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেও গোপন করিতে পারিল না। সোমনাথ এই বেসুরা আলাপে অস্বস্তি অনুভব করিল। কোথায় যেন একটা গরমিল আত্মপ্রকাশ করিয়া আবহাওয়াটাকে অস্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিতেছে। কারণ যাহাই হউক, সুপ্রিয়াকে বর্ত্তমান সঙ্কট হইতে রক্ষা করিতে হইবে। এ অসৌজন্যে সুপ্রিয়াই শর্ম্মিষ্ঠার নিকট ছোট হইয়া যাইতেছে। সোমনাথ কহিল,

—হাইফেনের মূল্যটাও আমাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নেওয়া শোভন হবে না সুপ্রিয়া। তার ওপর সন্দেহ হতে পারে দুই বন্ধুতে ষড়যন্ত্র করে হয়ত আমাকে দিয়েই হাইফেনের ভূমিকা অভিনয় করিয়ে নিচ্ছ। কারণ, অভিনয়ে তোমরা দুই বন্ধুই সম্প্রতি অবিসম্বাদী সাধারণ-স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছ।

তিনজনেই এবার উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। আলোচনার গতি ফিরিয়া গেল। শর্ম্মিষ্ঠা ও সুপ্রিয়া উভয়েই সোমনাথের নিকট সংযত হইয়া গেল। নানাবিধ আলাপ আলোচনায় ঘণ্টাখানেক কাটাইবার পর শর্ম্মিষ্ঠা বিদায় চাহিল। সুপ্রিয়া অনুনয় করিয়া কহিল,

—কিছু না খেয়ে গেলে মা দুঃখ করবেন শর্ম্মিষ্ঠা!

শর্ম্মিষ্ঠা অর্থপূর্ণ বক্রোক্তি করিয়া কহিল,

—বিদায়-অভিশাপ সহ্য করিতে পারবো না সুপ্রিয়া! মায়ের আশীর্ব্বাদ না নিয়ে গেলে আমারও দুঃখ থেকে যাবে। চল একেবারে মায়ের রান্নাঘরেই হানা দিই।

শর্ম্মিষ্ঠা প্রণাম করিলে মা সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া কহিলেন,

—সারা কলেজের মধ্যে তুমিই ওর একমাত্র বন্ধু মা! তোমাদের এই বন্ধুত্ব যেন চিরস্থায়ী হয়।

ইহা অনুরোধ, আদেশ, আবেদন না সাধারণ শুভেচ্ছা!

রাজলক্ষ্মীর পানে শর্মিষ্ঠা পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইল, শান্তকণ্ঠে কহিল,—মায়ের আশীর্বাদ থাকলে নিশ্চয়ই হবে মা।

গাড়ীতে ষ্টার্ট দিবার পূর্ব্বে শর্মিষ্ঠা হাসিয়া কহিল,

—নির্জ্জলা মিথ্যাভাষণের অভিনয়ে দুজনেই আজ আমরা ভালো অভিনয় করেছি! কিন্তু আমি কি ভাবছি জানো সুপ্রিয়া, কী এর প্রয়োজন ছিল! সোমনাথবাবু যে তোমায় ভালবাসেন একি আজও তুমি সন্দেহ কর, কিম্বা আমার মত কোন মেয়ে সোমনাথবাবুকে তোমার মন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কা কর।

এই স্পষ্ট নগ্ন সত্যের সম্মুখীন হইয়া সুপ্রিয়া সহসা যেন বিহ্বল হইয়া গেল। তাহার অসহায় দৃষ্টি শর্মিষ্ঠাকে আরও কোমল করিয়া আনিল, সে পুনরায় কহিল,

—আত্ম-বিশ্বাস অটুট রেখো সুপ্রিয়া! তোমার দোলায়মান মনপবনের ঝাপটায় যদি সোমনাথবাবু সহসা দূরে সরে যান, তবে তা কারো পক্ষেই মঙ্গল হবে না।

পরে তাহার চিবুকে অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া পরিহাস-তরল কণ্ঠে কহিল,

—ভুলে যেয়োনা বন্ধু! তব সোমনাথ, চিরসাথী তব, অন্য কাহারো নয়।

বলিয়াই গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

ধাবমান গাড়ীটার পানে শুষ্ক দৃষ্টি মেলিয়া সুপ্রিয়া মনে মনে কহিল, তোমার অভিনয় সুষ্ঠু হইলেও তোমার মনের দোলা গোপন রাখিতে পারো নাই বন্ধু! তোমাকে দুঃখ দিবার ভয়েই আমি সোমনাথকে অন্তরালে রাখিতে চাহিয়াছিলাম। সোমনাথকে চেষ্টা করিয়া তুমি ভুলিতে পারিবে না, পারা সম্ভব নহে। ইহা যুক্তির কথা নহে, বিচারের কথা নহে, ইহা হৃদয়ের কথা! বয়স্থা কুমারীর শুষ্ক জীবনে সোমনাথের

প্রভাব অনতিক্রম্য ! ইহাকে অতিক্রম করার অর্থ দেহীর নিঃশ্বাস গ্রহণ না করিবার সঙ্কল্পের মত। ঈশ্বর তোমার মনে শান্তি দিন !

শর্মিষ্ঠা সুপ্রিয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া হোষ্টেলে প্রত্যাবর্তন করিয়া গভীর আলস্যে শয্যায় শুইয়া পড়িল। এই ক্লান্তি, এই অবসাদ তাহার অপরিচিত। সাধারণ স্বাস্থ্য তাহার ভালই, তাই প্রাণবন্ত এই মেয়েটির নিস্প্রভতায় কক্ষটাও যেন আজ করুণ হইয়া উঠিয়াছে। কক্ষে সে একাকীই থাকে, কিন্তু সেই একাকীত্বের গুরুতার আজ যেন সে প্রথম অনুভব করিল। তাই বলিয়া এই মুহূর্তে সেই একাকীত্ব লোপ করিতে অন্য কোন মেয়েকে আহ্বান করিতেও সে স্বস্তি বোধ করিল না। সে ভাবিতে লাগিল,—

আজিকার অভিনয় মন্দ হয় নাই। জীবনটাই ত একটা অভিনয়। তথাপি ইহা সত্য যে অভিনয়ের অন্তরালে সত্যকে স্পর্শ করিবার উদগ্র কামনায় মানুষের অন্তর কখন কখন অধীর হইয়া উঠে। সোমনাথ বলিয়াছে মিথ্যা বলাটা অস্বাভাবিক নহে কারণ আজিও সে সত্যের সন্ধান পায় নাই। এই সত্য বলিতে সে কি বুঝিয়াছে তাহা সেই জানে। তাহার নিজের জীবনে সত্যের জিজ্ঞাসা জাগে নাই। মিথ্যার স্রোতে গা ভাসাইয়া সে চলিয়াছে। মিথ্যার মাধুর্য্যে সে মুগ্ধ! হউক অসার, হউক ক্ষণিক, তথাপি মিথ্যাই মানুষকে বহু দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনা দিয়াছে, সাহস দিয়াছে। তাহারও জীবন যদি মিথ্যার মধ্য দিয়াই একদিন শেষ হইয়া যায় সে দুঃখ করিবে না, ভগবানকে টানিয়া আনিয়া অভিশাপ দিবে না। শর্মিষ্ঠা জানে, তাহার জীবনে তাহাকে ঈর্ষা করিবার মত কিছু নাই; কিন্তু অন্য মেয়েরা তাহার ঐশ্বর্য্যকে ঈর্ষা করে! ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমানে তাহার হয়ত কিছু আছে, কিন্তু শর্মিষ্ঠা ভালই জানে সে ঐশ্বর্য্য মিথ্যার বালুস্তূপে অবস্থিত।

পিতা তাহার স্নেহময়। সে স্নেহে সন্দেহের অবকাশ নাই! কিন্তু এই মানুষটিকে সমালোচনা করিলে দেখা যাইবে এত বড় দুঃখী মানুষ বুঝি এ সংসারে দ্বিতীয় নাই। স্বকৃত উপার্জনে তিনি আজ সহরের শ্রেষ্ঠ ধনীদের অন্যতম। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার বুদ্ধি, তাঁহার লোকহিতকর কার্য্যাবলী সাধারণে তাঁহাকে একটি বিশেষ মর্য্যাদা দান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও সত্য যে তাহার পিতা -অর্থ-গৃধ্নু! অর্থই তাঁহার বন্ধু! সেই অর্থের বেদীমূলে তিনি সংসারকে উৎসর্গ করিয়াছেন। স্ত্রী পুত্র সকলেই তাঁহার বিরুদ্ধে! মাতার দিকে তাহার আপন জননীর সংকীর্ণতায়, ক্ষুদ্রতায় সে সংসার ছাড়িয়া হোষ্টেলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে। দাদারা অত্যন্ত ক্ষুদ্রচেতা, স্বার্থপর! সংসারে নিত্য কলহ লাগিয়াই আছে। সেই কলহের কারণ এবং অভিব্যক্তিও অত্যন্ত কুৎসিত! বাহিরের সম্মানে উন্নতশির পিতা গৃহকোণে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের ন্যায় নিরীহ! স্ত্রী ও পুত্রদের ভয়ে তিনি সর্ব্বদা শঙ্কিত! বাহিরের উদার আকাশ যেন সভয়ে দূরে সরিয়া গিয়াছে।

সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় এবং লজ্জার বিষয় এই যে তাহার আপন জননী তাহাকে ঈর্ষা করেন। একথা কাহাকেও বলিবার নহে, কিন্তু ইহা সত্য! এই সত্য তাহার বুকে নিত্য আঘাত হানিতেছে। তাহার অপরাধ তাহার পিতা তাহাকে স্নেহ করেন। তাহার অসহায় পিতা তাহাকেই সংসারের মধ্যে একমাত্র নির্ভরশীল আশ্রয় বলিয়া মনে করেন।

ভ্রাতারা ভাবে পিতা হয়ত 'উইল' সম্পাদন করিয়া সম্পত্তির অধিকাংশ তাহাকেই প্রদান করিয়া যাইবেন। সে জানে, ইহা তাহাদের মিথ্যা আশঙ্কা! পিতা অন্তরে অত্যন্ত স্নেহ-দুর্ব্বল। কোন দিন তিনি পুত্রদের কঠিন শাসন করিতে পারেন নাই। অবশ্য তাঁহার ব্যক্তিত্বের সম্মুখে তাহারাও কোনদিন জোরে প্রতিবাদ তুলিতে সাহস করে নাই। যদিও মাতা এবং পুত্রদের মধ্যেও বিশেষ সদ্ভাব নাই তথাপি পিতার

বিপক্ষাচরণ করিতে তাহারা ঐক্যবদ্ধ! মায়ের বুকে মেয়েদের স্বভাবতঃ যে আসন পাতা থাকে তাহাতে বঞ্চিতা হইয়া শর্ম্মিষ্ঠা বাহিরে কিছুটা রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু শিক্ষায় সভ্যতায় হৃদয়-মাধুর্য্যে সে এই গৃহ-পরিবেশের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমই ছিল। কেবল একটা প্রশ্নের সে কিছুতেই মীমাংসা করিতে পারিত না। তাহার আপন গর্ভধারিণী জননী তাহাকে ঈর্ষা করেন কেন? পিতার স্নেহলাভ সে কি এত বড় অপরাধ যাহার ফলে তাহার মাতা তাহার নামে অযথা কুৎসা রটনা পর্য্যন্ত করিতে দ্বিধাবোধ করেন না? তাহার পিতা তাহাকে পাত্রস্থ করিবার জন্য গত দুই বৎসর হইতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু প্রতিবারেই এক অদৃশ্য হস্ত তাহার সেই বিবাহে বাধা ঘটাইতেছে। সম্প্রতি সে বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিয়াছে সেই অদৃশ্য হস্তের রচয়িতা তাহার মা। চিন্তা করিতেও তাহার সারা অন্তর বেদনায় বিবর্ণ হইয়া উঠে!

সর্ব্বস্বের বিনিময়েও যদি সে তাহার মায়ের সংকীর্ণতা দূর করিতে পারিত তবে তাহার সকল ত্যাগ সার্থক হইয়া উঠিত! কিন্তু তাহা অসম্ভব! সে নিজে কোন চেষ্টা করিতে গেলে তাহার ফল হইবে বিপরীত। বিবাহ দ্বারা ভাবী সুখের কল্পনা সে করে না, কিন্তু সে তাহার পিতাকে নিশ্চিন্ত দেখিতে চাহে। পিতার চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু হায়, তাঁহার পদগৌরব, ব্যক্তিত্ব, অর্থ, তাহার নিজের রূপ, গুণ, সমস্তই মায়ের কুৎসিত চক্রান্তে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে।

এই মিথ্যার মধ্য দিয়াই সে এতটা কাল কাটাইয়া আসিতেছে। ইহা যেন একটা দুঃস্বপ্ন! এই দুঃস্বপ্নের শেষে প্রথম উষার আলোকে সে দেখিল সোমনাথকে! বুদ্ধি-দীপ্ত সরল উদার সোমনাথ! মানুষটিকে দেখিলে শ্রদ্ধায় শির স্বতঃই নত হইয়া আসে। সত্যের পূজারি ও। ও নিঃসংশয়, ও নির্ভয়! ওর সংস্পর্শে মন যেন সমস্ত তুচ্ছতার উর্দ্ধে আশ্রয় লাভ করে।

সুপ্রিয়া ভাগ্যবতী! কিন্তু আশ্চর্য্য! বিনা আয়াসে ও সোমনাথকে লাভ করিতে চলিয়াছে বলিয়া ও সোমনাথের মূল্য বুঝে না। সুপ্রিয়ার আসনে যদি শর্ম্মিষ্ঠা নিজেকে প্রতিষ্ঠিতা করিতে পারিত, তবে সে জগতকে দেখাইয়া দিতে পারিত তাহার যোগ্যতা! সে তাহার শ্রেষ্ঠ পূজার সম্ভারে সোমনাথকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিত! সোমনাথ! সোমনাথ! সোমনাথকে আপন বলিবার সৌভাগ্যের তুলনা বুঝি জগতে আর নাই! সোমনাথ যেন সমগ্র পুরুষ জাতির মূর্ত্ত প্রতীক! সুযোগ পাইলে সেও তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে ঘোষণা করিতে পারিত যে, সেও নারী জাতির প্রতীক! সোমনাথের দীপ্তি ও শৌর্য্য তাহার প্রেম ও সেবার আশ্রয় লাভ করিয়া স্রষ্টার সৃষ্টিকে সার্থক করিয়া তুলিত! উত্তেজনায় শর্ম্মিষ্ঠা শয্যায় উঠিয়া বসিল। সম্মুখে স্বচ্ছ মুকুরে তাহার আপন প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহার স্ফুরিত নাসা ও বিস্তৃত নয়নে আপন উত্তেজনা লক্ষ্য করিয়া সে লজ্জায় পুনরায় শয্যায় লুটাইয়া পড়িল।

সুপ্রিয়ার নিকট মনে মনে মার্জ্জনা চাহিয়া কহিল, সে তাহার বন্ধুত্বের অপমান করিয়াছে। বাস্তব জগতে এই মিথ্যা ভাব-বিলাসের কোন অর্থই নাই! জীবন স্রোত আদিহীন অন্তহীন প্রবাহে বহিয়া চলিয়াছে! তাহার মত কত খড় কুটা সে স্রোতাবর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া চলিল কে তাহার হিসাব রাখে! স্রোতাবেগে সে সাগরে মিলিত হইতে সক্ষম হইল কি মধ্যপথে মরুমাঝে বিলীন হইয়া গেল কে তাহার সন্ধান রাখে! না, বৃহত্তের সাধনা তাহার নহে। ক্ষুদ্রের মাঝেই সে নিজেকে সমর্পণ করিয়া জীবনানন্দ পান করিতে চাহে। হউক মিথ্যা! মিথ্যার মধুচক্রই সে রচনা করিবে। কবি সত্যই বলিয়াছেন,

—কামনা মঞ্চে কত ফুল ফোটে কে তাহার খোঁজ রাখে?

জীবনের গান তাই,

আপনার মনে গাহিয়া গাহিয়া আনমনে চলে যাই। ...

জীবনের গান সে আজিও শুনিতে পায় নাই। তাহার কামনা মনে ফুল ফুটিবার পূর্ব্বেই ঝরিয়া পড়িবার উপক্রম করিয়াছে। তথাপি পথের প্রান্তে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে সেই দেবালয় যেখানে তাহার দেবতা তাহার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন। সে মনে মনে কহিল, সোমনাথ! তুমি আমার ধ্যানের সোমনাথ! তোমাকে আমি অস্বীকার করিতে পারিব না। আমার কর্ম্মমুখর কঠিন পৃথিবীর বুকে চলার পথের লক্ষ্মী তুমি নও। তোমাকে লাভ করিবার তপস্যা আমার নাই। আমার জীবন-সাথী কোথায় আছে আজিও তাহা আমি জানি না। তবে সংসারে যদি আমায় বাঁচিয়া থাকিতে হয়, যদি সংসারকে আমার কিছু দিবার থাকে, তবে জগতের যে প্রান্তেই সে থাক, সেই সাথী আমার আসিবেই। সুপ্রিয়া তোমাকে কেমন করিয়া সার্থক করিয়া তুলে তাহা আমি দূর হইতেই দেখিব, দূর হইতেই তোমাকে শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিব, আর ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিব,—সোমনাথ তুমি জাগো—জাগো! তোমার উন্নত শির উত্তুঙ্গ এভারেষ্টকে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধ আকাশ স্পর্শ করুক, যেখানে সারা বিশ্ব পরম বিস্ময়ে অসীম শ্রদ্ধায় তোমাকে অবলোকন করিবে। সে যুক্ত করে সোমনাথের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

একটা অপূর্ব্ব শান্তিতে শর্ম্মিষ্ঠার হৃদয় ভরিয়া হইয়া গেল। মুকুরে এবার তাহার শান্ত প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়া উঠিল।

শর্ম্মিষ্ঠা উঠিয়া স্নান সারিয়া কিছু আহার না করিয়াই শয্যাশ্রয় করিল ও ক্ষণপরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

কয়েকদিন ক্লাশে শর্ম্মিষ্ঠাকে অনুপস্থিত দেখিয়া সুপ্রিয়া চিন্তিত হইল। ভাবিল, শারীরিক অসুস্থতা হইলে নিশ্চয়ই হোষ্টেলের অপর মেয়েদের

নিকট তাহা জানিতে পারিবে, কিন্তু হোষ্টেলের একটি মেয়েকে প্রশ্ন করিয়া সে জানিল, শর্মিষ্ঠা কাহাকেও কিছু না জানাইয়াই বাড়ী চলিয়া গিয়াছে। তাহার গতিবিধির কারণ পশ্চাতে রাখিয়া যাওয়া তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তথাপি ফিরিবার পথে সে হোষ্টেলের তত্ত্বাবধায়িকার সন্নিধানে তাহার তত্ত্বটা জানিবার প্রয়াস পাইল। তিনি সংক্ষেপে গম্ভীরভাবে জানাইলেন, তাহার পিতা অসুস্থ। হোষ্টেলের নিয়মানুযায়ী সে আবেদন পত্রে ঐ কারণই উল্লেখ করিয়াছে, ইহার অধিক তিনি জানেন না।

সুপ্রিয়া বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার পিতা ও সোমনাথ আজ বাহিরে বারান্দার স্থির ভাবে পরস্পরের মুখের পানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। হয়ত কোন দুরূহ সমস্যা দেখা দিয়াছে। সুপ্রিয়া কিন্তু আজ এই স্তব্ধতার সন্ধান না দিয়া পিতার সম্মুখে আসিয়া অনুযোগ করিল,—বাবা! আজ কাল তুমি আমাদের এড়িয়ে চলছ।

প্রফেসর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় সজাগ হইয়া অপ্রতিভ কণ্ঠে কহিলেন,

—কি রকম! আমি এড়িয়ে যাচ্ছি? কখনই না! এইত সেদিন তোমাকে আর তোমার মাকে দক্ষিণেশ্বর বেড়িয়ে নিয়ে এলুম!

—সেদিনটা ছ'মাস হয়ে গেল বাবা!

—তাইত! এতদিন হয়ে গেছে! আচ্ছা, আর একদিন যাবো! কিন্তু সোমনাথ, তোমারও যাওয়া চাই! তুমি কঠিন পরিশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়ছ। তা' ছাড়া তোমার মনও বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। তুমি আগেকার মত পরীক্ষাগারে মনঃসংযোগ করতে পারছ না।

সোমনাথ আত্মভোলা প্রফেসরের মন্তব্যে লজ্জিত কণ্ঠে কহিল,

—না স্যর! আমি ভালই আছি। তবে আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা বোধ হয় ঠিক পথে চলছে না। আমরা পেছিয়ে পড়ছি। কল্মূলায় কোথাও গলদ আছে।

—এ সন্দেহ আমারও জেগেছে সোমনাথ! কিন্তু তা সংশোধন করতে পারতেন একমাত্র আমার বৈজ্ঞানিক গুরু! আজ আর তিনি ইহ জগতে নেই!

তাঁহার স্বরে গভীর নৈরাশ্য ভাসিয়া উঠিল। সোমনাথ সুপ্রিয়া উভয়েই বেদনাতুর দৃষ্টি বিনিময় করিল!

সোমনাথ দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,

—আমি কিন্তু নিরাশার কিছু দেখছি না স্যর! আপনার সাধনা ব্যর্থ হ'বে না। সময়টা কিছু পেছিয়ে গেল এই যা।

উৎফুল্ল কণ্ঠে অধ্যাপক বলিয়া উঠিলেন,

—আমার সময় বড্ড কম সোমনাথ, বড্ড কম! তবু তোমার এই আশা আমায় উৎসাহিত করছে আমার মৃত্যুর পরেও যদি তুমি সফল হও তবে, তাই হবে আমার শ্রেষ্ঠ সান্ত্বনা! সোমনাথ! তোমার ওপর আমার আস্থা আছে। তুমি পারবে—তুমি পারবে। কিন্তু সাবধান! এর ধ্বংসের অংশটাকে প্রকাশ কোরো না, এর কল্যাণের অংশে জগতকে সমৃদ্ধ কোরো। জগতবাসী ধন্য হবে। তোমায় আশীর্বাদ করবে।

বলিতে বলিতে বৃদ্ধ আবার গবেষণাগারে প্রবেশ করিলেন।

জ্ঞান-বৃদ্ধ অধ্যাপকের পানে উভয়েই সশ্রদ্ধ দৃষ্টি মেলিয়া তাকাইয়া রহিল। সুপ্রিয়ার শ্রদ্ধা স্বাভাবিক। কিন্তু তাহার দুঃখ এই যে, এই মহৎ মানুষটির কোন উপকারেই সে আসিল না। তাহার জ্ঞান বুদ্ধি তাঁহার সাহায্যে আসে না। তাহার সেবা তাঁহার মনকে স্পর্শ করে না, কারণ মন তাঁহার এ সকল অনুভব করিবার অবসর পায় না। আজ সোমনাথ তাঁহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আসন লাভ করিয়াছে, কারণ সোমনাথকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার সাধনা রূপ পরিগ্রহ করিতে চলিয়াছে। সোমনাথকে সে ঈর্ষা করে না। সোমনাথের প্রতি সে

কৃতজ্ঞ। কিন্তু সোমনাথ কি সত্যই সক্ষম হইবে? সে শুনিয়াছে, জগতের প্রত্যেক বৃহৎ শক্তি এই আবিষ্কারের পশ্চাতে কোটি কোটি মুদ্রা মুক্ত হস্তে ব্যয় করিতেছে! তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন ধ্বংসের দেবতা মহাকাল। সেই মহাকালকে তুষ্ট করিতে, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় নটরাজকে প্রলয়কাণ্ডে অংশ গ্রহণ করাইতে, তাহারা পঞ্চ-মুণ্ডির আসন পাতিয়াছে। তুলনায় তাহার পিতা ও সোমনাথ দরিদ্র। ধন্যা সে! তাহার পিতা, তাহার সোমনাথ এই ধ্বংসের অংশকে পরিহার করিয়া কল্যাণকেই প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন। প্রসন্ন হও প্রভু, প্রসন্ন হও! সোমনাথের আশ্বাসকে সত্যরূপ দান কর!

মনে মনে প্রার্থনা করিতে করিতে সুপ্রিয়া চক্ষু মুদিত করিল।

সোমনাথ কহিল,

—আজ কিছুটা দেরী যে?

—হোষ্টেলে শর্মিষ্ঠার সন্ধানে গিয়েছিলুম।

—সন্ধানে? কেন শর্মিষ্ঠা দেবী কি পলাতকা?

—প্রায়! ক'দিন ক্লাসে না দেখে হোষ্টেলে সন্ধান নিতে গিয়ে দেখি বাপের অসুখ শুনে সে বাড়ী গেছে। বাড়ী বড় একটা সে যায় না, তাই মনে হয় অসুখ নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি।

উদ্বিগ্ন কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—তাহলে তার বাড়ীতেও ত একবার সংবাদ নেওয়া উচিত, কারণ শুনেছি কলেজে উনিই তোমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু!

—তাতে অন্তরায় আছে। বাড়ীর ঠিকানা জানি না।

—কিন্তু অত বড় লোকের বাড়ী নিশ্চয়ই ফোন আছে।

উৎফুল্ল কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—ঠিক বলেছ! ওর বাবা সহরের বিখ্যাত লোক। অলক চৌধুরী। কাল সকালেই একটা ফোন করে দিও ত!

—কোনটা তুমি করলেই ভালো হয় না ?

—তাও হয়, কিন্তু তোমারই বা আপত্তি কিসের ? আমার বন্ধুকে তোমার কেমন লাগে ?

বলিয়াই আগ্রহাকুল স্থির দৃষ্টি মেলিয়া বসিয়া রহিল।

সোমনাথ মৃদু হাসিয়া কহিল,

—আমাকে দিয়ে তোমার বন্ধুর প্রশংসা না সমালোচনা কোনটা শুনতে চাও ?

শান্ত কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—দুটোই !

সোমনাথ ততোধিক শান্ত কণ্ঠে কহিল,

—অতএব কোনটাই আশা কোরো না।

—কারণ ?

—কারণ, প্রশংসা করতে হলে যতটা পরিচয়ের প্রয়োজন হয় আমার তার সুযোগ ঘটেনি ; আর নারী চরিত্র সমালোচনায় বিপদ আছে।

—বিপদটা কোন দিক থেকে ?

—উভয় দিক থেকেই।

সুপ্রিয়া হাসিয়া ফেলিল, কহিল,

—তোমাকে দেখলে কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে তোমার পেটে এত শয়তানী আছে।

—কারণ শয়তানের বুকে থাকে বিষ, আর মুখে থাকে মহত্ত্বের মুখোস। ও আর্টটা যত্নে আয়ত্ব করতে হয়েছে।

—আচ্ছা মশাই ! তুমি অবসর সময়ে সাইকোলজী পড়, না ?

—কেন বলত ?

—কথাগুলো তুমি সহজভাবে বলে গেলেও মাঝে মাঝে কেমন যেন মুখস্ত বিদ্যে বলে মনে হয় !

—তার কারণ সাধারণতঃ আমি অসামাজিক। অবশ্য আমার অবসরও কম। এই ভগ্নাংশকে পূরণ করবার ভার নিয়েছেন আমার মা। মায়ের স্বচ্ছ ধারা আমাতে প্রকাশ পায় নি! আমার অনেক কথাই মায়ের কথার পুনরাবৃত্তি, তাই তোমার মত যারা একেবারে মনের খুবই নিকটে এসে পড়েছে, তাদের কাছে ধরা পড়ে যাই।

সুপ্রিয়া সোমনাথের সরল স্বীকৃতিতে উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, তাই কথাটার জের টানিয়া দুষ্টামি করিয়া কহিল,

—তোমার মনের খুবই নিকটে যারা এসে পড়েছে তা'রা কারা? এ যেন গৌরবে বহুবচন বলে মনে হচ্ছে?

সোমনাথ এই কৌশল অনায়াসেই ধরিয়া ফেলিল, কহিল,

—গৌরবটা দুই বন্ধুতেই ভাগ করে নিতে পারো। অন্ততঃ এ উদারতা আশা করা অন্যায় নয়।

—কিন্তু আশার পেছনে যদি আশঙ্কা থাকে?

সোমনাথ দেখিল সম্মুখে অতলস্পর্শ প্রপাত। তথাপি প্রশান্ত কণ্ঠেই কহিল,

—মেয়েরা স্বভাব-ভীরু! কিন্তু কারণহীন ভীরুতায় অগৌরব আছে সুপ্রিয়া!

প্রত্যক্ষ আঘাতে সুপ্রিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রত্যুত্তর খুঁজিয়া না পাইয়া চুপ করিয়া রহিল। সোমনাথ পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া আসিয়া কহিল,

—শর্মিষ্ঠাকে সত্যিই ভালো মেয়ে বলে মনে হয়। এ মেয়ের বন্ধুত্ব নিয়ে তুমি গর্ব করতে পারো।

—ও কিন্তু ভারী খামখেয়ালী! ও যেকোন মুহূর্তে আমার বন্ধুত্ব অস্বীকার করতে পারে।

—তার কারণ ও তোমাকে মনে মনে স্বীকার করে নিয়েছে।

—আমাকে স্বীকার করেছে বলে আমার বন্ধুত্বকেও অস্বীকার করবে?

—হয়ত করবে না, কিন্তু যদি করে তা'তে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

বিস্মিত কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—তোমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না। এও কি তোমার মায়ের কথারই পুনরাবৃত্তি ?

—না। মেয়েদের বন্ধুত্বটা আপেক্ষিক। অর্থাৎ যতদিন কোন সংঘর্ষের সম্মুখীন না হতে হয় ততদিন ওর সত্যরূপ প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেই সংঘর্ষের আঘাতে বন্ধুত্বটা যদিও যায় খসে, ব্যক্তিত্বটা হয়ে ওঠে আরও উজ্জ্বল !

—ওর সঙ্গে আমার সেই সংঘর্ষের সম্ভাবনা আছে বলে মনে কর ?

—বিন্দুমাত্র না ! তথাপি···

—তথাপি নিঃসন্দেহেই আমায় চা আপ্যায়নে অবিলম্বে আপ্যায়িত করা উচিত।

—যথা আজ্ঞা ! বলিয়া সুপ্রিয়া উঠিয়া পড়িল।

ইহার পরও কয়েক দিন শর্ম্মিষ্ঠার সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। একদিন সকালে সংবাদ পত্রে বড় বড় হরফে বাহির হইল—শোক সংবাদ। বিখ্যাত ব্যারিষ্টার অলক চৌধুরীর কর্ম্মময় জীবনের অবসান। বাহির হইল, সহরের বিশিষ্ট নাগরিকের জীবনাবসানে বহু মনীষির শ্রদ্ধাতর্পণ। সুপ্রিয়া ভাবিল, এই দুর্দ্দিনে সে শর্ম্মিষ্ঠার পাশে এখনি ছুটিয়া যায়। যে শর্ম্মিষ্ঠা ছুটিতেও বাড়ী যাইতে চাহিত না, পিতার মৃত্যুতে সেই বাড়ীতে সে কতটা অসহায় ও নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িয়াছে ভাবিতে গিয়া সুপ্রিয়া গভীর বেদনা অনুভব করিল। সুপ্রিয়া জানে বাড়ীর পরিবেশ তাহার প্রতিকূল, কিন্তু এই প্রতিকূলতাকে অগ্রাহ্য করিবার মত মনোবল সে রাখে। তথাপি পিতার মৃত্যুর আঘাত সে কেমন ভাবে গ্রহণ করিয়াছে কে জানে। হয়ত সে

অশ্রু সে প্রাণপণে অবরুদ্ধ রাখিয়াছে, তাহার উপস্থিতিতে সে অশ্রু বাধা মানিতে অস্বীকার করিবে। পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনীর আবর্জনায় সে এই পবিত্র অশ্রু হয়ত মোচন করিতে চাহে না। না, সে সাধারণ মৌখিক সান্ত্বনা দান করিতে শর্ম্মিষ্ঠার কাছে ছুটিয়া যাইবে না। সে অপেক্ষা করিবে যে পর্য্যন্ত না শর্ম্মিষ্ঠা হোষ্টেলে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করে।

একদিন একদিন করিয়া শ্রাদ্ধান্তে সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া গেল, তথাপি শর্ম্মিষ্ঠা হোষ্টেলে ফিরিয়া আসিল না। সুপ্রিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। তবে কি সে নিজেও শয্যা গ্রহণ করিল? মনে মনে স্থির করিল, আগামীকাল শনিবার দিন ছুটির পর সে শর্ম্মিষ্ঠার বাড়ী যাইবে।

বাড়ী ফিরিতেই রাজলক্ষ্মী কহিলেন,

—সুপ্রিয়া তোর একখানা চিঠি আছে।

সুপ্রিয়া সাগ্রহে পত্রখানা লইয়া নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল। শর্ম্মিষ্ঠার পত্র।

"ভাই সুপ্রিয়া—

বাবার মৃত্যু-সংবাদ সংবাদপত্রে দেখেছ। সংবাদটা অবশ্যই শোক সংবাদ। বাবা শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তি বলে বহু সান্ত্বনা-সংবাদ টেবিলে স্তূপীকৃত হয়ে জমে উঠেছে। দাদারা সে সব পত্রের গুরুত্ব নির্ণয় করে উত্তর দিতে এখনও ব্যস্ত।

মনে মনে তোমার পত্র বুঝি আশা করেছিলুম! কিন্তু স্তূপীকৃত সান্ত্বনা বাণীর রাজ্যে কোথাও তোমার সন্ধান মিলল না। ভালই করেছ। লেখার মধ্যে তোমায় খুঁজে না পেলেও তোমার বুকের মধ্যে যে সমবেদনার শব্দ তরঙ্গিত হচ্ছে আমার কানে তা পৌঁছেছে।

আজ আপন বেদনার গুরুভারে আমি প্রায় ভেঙে পড়তে চলেছি। এ বেদনার ভাষা নেই। তাই বলে, জগতের কারো বিরুদ্ধে আজ আমি

অভিযোগ রেখে যাচ্ছি না। শুধু ভাবছি, কেমন করে এতদিন এই পুঞ্জীভূত বেদনা একা বহন করে এসেছি। সব কথা তোমাকেও বলিনি, আজও বলছি না, তবুও বন্ধু! যদি বলতে পারতুম!

বাবার মৃত্যু দু'দিন পরে হলেও অবশ্যম্ভাবী ছিলো, তাই দুঃখটা সেখানে নয়। দুঃখ এই যে, যে অখণ্ড স্বার্থপরতা, নীচতা আর সংকীর্ণতার প্রত্যক্ষ আক্রমণ থেকে এতদিন আড়ালে ছিলুম আজ সহসা সেই আড়াল সরে গেল।

তোমার উদার পরিবেষ্টনী এ সব কল্পনাও করতে পারবে না, তাই তোমাকে দুঃখ দিতে সে সব কাহিনীর অবতারণা হতে নিবৃত্ত হলুম।

তবে একথা নিশ্চয় যে এ বাড়ী আমার নিশ্চিন্ত আশ্রয় নয়, তাই অনিশ্চিত আশ্রয়ের উদ্দেশে এ স্থান ত্যাগ করছি। জানিনা, সেই অনিশ্চিত আমায় আলোকে না অন্ধকারে কোথায় নিক্ষেপ করবে!

কলকাতায় থাকা সম্ভবপর নয়। সহরের অনেক বড় ঘরের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে, তাই স্বাধীনভাবে কিছু করতে গেলে ভায়েদের মাথা হেঁট হবে। ফলে, তাঁদের চক্রান্তে পড়ে আমায় এক অসহ বন্দিনী জীবন যাপন করতে হবে।

যেখানেই যাই, যেভাবেই থাকি, তোমায় ভুলতে পারবো না। তুমি সুখী হও এ আমি অন্তর দিয়েই কামনা করি। সোমনাথবাবুর এক দিনের সাহচর্য্য আমায় নতুন আলো দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর নিত্য সাহচর্য্যে তুমি সমৃদ্ধা হয়ে উঠছ। একদিন তোমাদের পরিপূর্ণ মিলনে ধরণীতে নতুন ফুল ফুটবে ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা করি।

আমার প্রীতি ও ভালবাসা নাও।

সোমনাথবাবুকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম দিও। ইতি—

শর্মিষ্ঠা।'

পত্রখানা হাতে লইয়া সুপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল। শর্ম্মিষ্ঠা আর ফিরিবে না। কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার গৃহত্যাগের কারণ কি শুধুই তাহার প্রতিকূল গৃহ পরিবেশ? গৃহে তাহার শান্তি নাই। অনেক গৃহেই নাই। তাই বলিয়া অনিশ্চিতের অন্ধকারে এভাবে ঝাঁপ দেওয়া শর্ম্মিষ্ঠার মত মেয়ের পক্ষে কি সমীচীন হইল? সে স্বীকার করে শর্ম্মিষ্ঠা অপর সাধারণ মেয়ের মত নহে। তাহার চরিত্রের দৃঢ়তা, তাহার কঠিন সংকল্পের মতই অনমনীয়; কিন্তু তথাপি তাহার শক্তি ও সহিষ্ণুতারও ত একটা সীমা আছে?

সত্যই তাহার মত জীবনে বিড়ম্বিতা মেয়ে বুঝি এ জগতে কেহ নাই দুঃখকে জয় করিবার দুর্জ্জয় সংকল্প বুকে লইয়া উহার যাত্রা সুরু হইয়াছে। সমগ্র মানব গোষ্ঠীর বিরুদ্ধেই উহার অভিমান! উহাকে বুঝিবার কেহ নাই, সান্ত্বনা দিবার কেহ নাই, ভালবাসিবার কেহ নাই। ওর অপরাধ আজ এই মুহূর্ত্তেও দুরন্ত ও অবুঝ! কিন্তু ভগবান! তুমিই বলিয়া দাও শর্ম্মিষ্ঠার নিন্দায় আজ যাহারা পঞ্চমুখ তাহারা শর্ম্মিষ্ঠার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে কোন মুখ লইয়া! ভগবান! তুমি উহাকে রক্ষা করিও, রক্ষা করিও! উহার উন্নত মস্তক চিরদিনই যেন এমনই দৃপ্ত, এমনই মহিমময় থাকে।

পত্রখানা সুপ্রিয়া একবার দুইবার তিনবার পড়িয়া দেখিল।

...সোমনাথ বাবুর একদিনের সাহচর্য্য আমায় নতুন আলো দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর নিত্য সাহচর্য্যে তুমি সমৃদ্ধা হয়ে উঠছ!...

সোমনাথের একদিনের সাহচর্য্যে শর্ম্মিষ্ঠা কোন আলোকের সন্ধান পাইল যে, যাহার বলে সে আজ এমন করিয়া সকল ভয় জয় করিবার সাহস লাভ করিল! তবে কি?...

না, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই! শর্ম্মিষ্ঠা সারা পত্রে যাহা বুঝাইতে চাহিয়াছে তাহা সত্য নহে। সে তাহার মাতা, ভ্রাতা,

পারিপার্শ্বিকতা কাহাকেও ভয় করে না। সে ভয় করে সোমনাথকে! সে ভয় করে আপন দুর্বলতাকে! সোমনাথকে পরিহার করিতে গিয়াই সে স্বেচ্ছায় এই নির্বাসন দণ্ড মাথা পাতিয়া লইয়া। কিন্তু…

কিন্তু এই পন্থাই কি অপরিহার্য্য ছিল? ঘটনাচক্রে যদি একদিন সোমনাথের নিকট সাহচর্য্যে আসিতে হয়, তবে সে দিনও কি এমনই ভাবে সে সহসা আত্মগোপন করিয়া আপন মুক্তি খুঁজিবে? হায় বন্ধু! এমনই করিয়া আত্মপীড়ন দ্বারা কোন কল্যাণ সাধিত হইবে? সমাজ সংসারকে তুচ্ছ করিতে চাহিলেই কি জীবনের কলরব মিথ্যা হইয়া যায়? শর্ম্মিষ্ঠা তুমি ভুল পথে চলিয়াছ। জীবনে চাওয়ার সাথে পাওয়ার সামঞ্জস্য কয়টা হয়? তথাপি চলার বিরাম কোথায়? পরক্ষণে চিন্তার গতি ভিন্ন স্রোতে প্রবাহিত করিয়া ভাবিতে লাগিল,—এই সকল ভাল ভাল কথার মূল্য কতটুকু! আজ যদি সোমনাথ তাহাকে অস্বীকার করে, তবে কি এমনই ভাল ভাল কথায় সান্ত্বনা লাভ করিয়া সে আর একটি শান্ত গৃহকোণ আশ্রয় করিবে? ভাবিতে গিয়া সে শিহরিয়া উঠিল। নাঃ, এ সব অলক্ষণ চিন্তা করিতে নাই। এই চিন্তার সূত্র ধরিয়াই বুঝি অলক্ষ্য বিধাতার অদৃশ্য সংকল্প জাগিয়া উঠে!

কিন্তু শর্ম্মিষ্ঠার মত কঠিন মেয়ে বাস্তবকে স্বীকার করিতে এতটা ভয় পাইল কেন? আপন মর্য্যাদায় আঘাত লাগিবার ভয়েই বোধ হয় সে এতটা বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ও জানে না, সত্যই যদি ও একদিন সোমনাথের নিকট সাহচর্য্যে আসে, তবে দেখিবে, সোমনাথের দিক হইতে তাহার এতটুকু আশঙ্কার কারণ নাই। সোমনাথের আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান অস্বাভাবিক সজাগ! সোমনাথ সমুদ্র! সমুদ্র কখনই বেলাভূমি অতিক্রম করে না। সোমনাথও কখন আপন সীমারেখা অতিক্রম করে না। সুপ্রিয়া ভাবিতে লাগিল,

সোমনাথ, সুপ্রিয়া, শর্ম্মিষ্ঠা! সুপ্রিয়া সে দিন বলিয়াছিল যে সুপ্রিয়াই তাহাদের দুই জনের মাঝে হাইফেন! আসলে সেদিন শর্ম্মিষ্ঠাই আসিয়াছিল উভয়ের মাঝে ক্ষুদ্র হাইফেনের ভূমিকায়! ভাগ্য বিড়ম্বনায় হাইফেন কিন্তু একটি শব্দে বিলুপ্ত হইতে চাহিল। হাইফেনের মর্য্যাদা লোপ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে সে লজ্জায় আত্মগোপন করিল। শব্দটা কিন্তু সে বিলুপ্তি, নির্লিপ্ত উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল, প্রতিবাদও করিল না, আহ্বানও করিল না।

•

সেদিন সন্ধ্যায় ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া অপর্ণার হাতে সোমনাথের পত্র দিল।

মা!

প্রফেসর ঘোষালের এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় শোচনীয় দুর্ঘটনায় আহত হয়ে হাসপাতালে রয়েছেন। সংবাদ পেয়ে মেয়েদের নিয়ে আমি চললুম। ফিরতে রাত হলে ভেবো না। ইতি—

তোমার সমী।

শোচনীয় দুর্ঘটনায় আহত! কে এ আত্মীয়! সমী'র হাতের লেখা! সমী তবে ভাল আছে। তথাপি ড্রাইভারকে অপর্ণা সহস্র প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তুলিল। প্রফেসর বাড়ী ছিলেন কি না, কে সংবাদ লইয়া আসিল, সমী তখন কি করিতেছিল ইত্যাদি ইত্যাদি…। ড্রাইভার ঘটনা কিছুই জানে না। সে বাহিরে ছিল। পত্রের মর্ম্মও সে অবগত নহে। কাজেই কোনও সন্তোষজনক উত্তর সে দিতে পারিল না।

ড্রাইভার বিদায় লইলে অপর্ণা অনেকক্ষণ জানালার গরাদ ধরিয়া অপলক দৃষ্টিতে রাজপথের প্রান্তদেশে চক্ষু আবদ্ধ রাখিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সমী না আসা পর্য্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছে না! সমী'র লেখা সে

পাইয়াছে। সমী ভালই আছে। তাহার দুশ্চিন্তা অমূলক। তথাপি এই মুহূর্ত্তে সে সমীকে তাহার চক্ষের সম্মুখে দেখিতে চাহে। তাহার চক্ষে রাজ্যের অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। রাজপথ, যান বাহন, লোক চলাচল সকলই যেন সেই অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। সে যেন এক অন্ধতামসী রজনীর নির্জ্জনতম গুহায় একাকিনী সমী'র প্রতীক্ষায় বসিয়া আছে! সেই অন্ধকারের রাজ্যে দেখা যাইতেছে শুধু সমী'র উজ্জল আয়ত চক্ষু! তাহার কুঞ্চিত কেশে আবৃত উদার ললাট হইতে বিকীর্ণ হইতেছে স্বর্গীয় আলোক! ও সোমনাথ! সোমরস পানে হইয়া উঠিয়াছে ও মৃত্যুঞ্জয়ী! সত্য সুন্দরের শুভ্র-পূজারী সোমনাথের অকল্যাণ অসম্ভব! সমী! সমী! সমী! কতনা মাধুর্য্য ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া পড়িতেছে ওই নামে! ও তাহার সন্তান, তাহার আশা, তাহার গর্ব্ব, তাহার প্রাণ, তাহার নিঃশ্বাস!

প্রায় ঘণ্টা দু'য়েক বাদে সোমনাথ যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল, তাহার মা কেমন এক অদ্ভুত দৃষ্টি মেলিয়া জানালার গরাদ ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সোমনাথ কহিল,

—মা! আমার চিঠি পাও নি?

অপর্ণার সম্বিৎ ফিরিয়া আসিল। একটা করুণ অথচ মধুর হাসি হাসিয়া অপর্ণা উত্তর দিল,

—চিঠি? হাঁ-ত!

—ওকি, তুমি অমন করে তাকিয়ে কি দেখছ, আমাকে? তোমার শরীর কি ভালো নেই? দেখি তোমার কপালটা?

কপালে হাত রাখিয়া সমী উদ্বিগ্ন কণ্ঠে কহিল,

—এই ত বেশ জ্বর হয়েছে!

—জ্বর? হয়ত হবে! আজ কিন্তু আমি খুব ভালো আছি সমী! আচ্ছা সমী! তুই ভূত বিশ্বাস করিস্? শুনেছিস কখনও যে, ভূত যখন

কোন দেহকে ছেড়ে চলে যায়, তখন কোন গাছের ডাল ভেঙে কিম্বা অনুরূপ কোন নিদর্শন রেখে চলে যায়।

—এই জ্বরের ঘোরে তুমি কি সব যা তা ভাবছ মা! অন্ততঃ তোমার মত মায়ের মুখে এই সব অসংলগ্ন কথা আমি আশা করি না। ভূত কোথায়? তাই নিয়ে তোমার এত চঞ্চল হবারই বা কারণ কোথায়?

অপর্ণা কোন কথা না কহিয়া সোমনাথের মাথাটা লইয়া তাহার কুঞ্চিত কেশে আপন কর সঞ্চালন করিতে লাগিল। মায়ের স্নেহ-স্পর্শে সোমনাথও নিশ্চুপ হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, এ ভাবে মায়ের প্রতি অবহেলা করা তাহার অকর্তব্য হইতেছে। মা অস্বীকার করিলেও সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছে যে তাহার মায়ের শরীর দিন দিন যেন অবনতির দিকেই অগ্রসর হইতেছে। নয়নের উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি পাইলেও বর্ণের ঔজ্জ্বল্য যেন নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে! ইহার প্রতিকার করিতে হইবে। কালই একজন ভাল চিকিৎসককে দিয়া ভাল ভাবে পরীক্ষা করাইতে হইবে।

সেই রাত্রে অপর্ণা গভীর ঘুমে অচেতন হইয়া পড়িল। সোমনাথ দুই দুইবার দুধ লইয়া আসিয়া ফিরিয়া গেল। অপর্ণার নিদ্রিত নয়নের পানে তাকাইয়া সোমনাথ ডাকিতে সাহস করিল না। কী অপরিসীম আনন্দ ও নিশ্চিন্ততা সারা মুখখানিকে স্বর্গীয় করিয়া তুলিয়াছে! সোমনাথ ভাবিল, তাহার মা'র এই অপরূপ দীপ্তি যেন আজ সে এই প্রথম উপলব্ধি করিল।

আসলে অপর্ণার উক্তি অসংলগ্ন নহে। এতদিনে তাহার ধারণা হইল, সোমনাথ সত্যই অঘটন হইতে রক্ষা পাইল। অলক্ষ্য অভিশাপ আজ অপর একটি দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার সোমনাথকে অব্যাহতি দিয়া গেল। সে নিশ্চিন্ত! সে নির্ভয়!

যদিও অপরের দুর্ঘটনায় উল্লসিত হইবার মত অনুদারতা তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ, তথাপি অপ্রতিরোধ্য এক অব্যক্ত আনন্দের বন্যায় সে ভাসিয়া গেল।

সত্য বটে রাজলক্ষ্মী তাঁহার নারী স্বভাব-সুলভ স্বাভাবিক করুণা ও স্নেহ-তাড়িত হইয়া শঙ্করকে দেখিবার জন্য কন্যা ও সোমনাথকে লইয়া হাসপাতালে ছুটিয়া গেলেন তথাপি ইহাও সত্য যে এই শঙ্করকে অদ্যাবধি তিনি চাক্ষুষ সন্দর্শন করেন নাই !

তাঁহার দূর সম্পর্কীয়া ভগ্নী হরিপ্রিয়া অল্প বয়সেই বিবাহের পর এলাহাবাদে চলিয়া যান। তাহার পর সুদীর্ঘকালের মধ্যে আর তাঁহাদের দেখা সাক্ষাৎ বা পত্র বিনিময় হয় নাই। হরিপ্রিয়ার একমাত্র সন্তান এই শঙ্কর।

শঙ্করকে দেখিয়া তিনজনেরই চক্ষু অশ্রু-সজল হইয়া উঠিল। সাতাশ আটাশ বৎসরের স্বাস্থ্যবান যুবক, কিন্তু কী অসহায় আজ সে! ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেল, পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে। সারিতে বেশ কিছু দেরী লাগিবে এবং শেষ পর্যন্ত সারিবে কিনা তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। গতকাল সকাল দশটায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। চব্বিশ ঘণ্টা পরে আজ তাহার জ্ঞান ফিরিয়াছে। বেচারী মাত্র কালই এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছে। উহার পকেটে প্রোঃ ঘোষালের ঠিকানা দেখিয়া নিকট আত্মীয়বোধে তাঁহাদের সংবাদ পাঠান হইয়াছে।

প্লাষ্টার দিয়া পৃষ্ঠদেশ বাঁধা। একই ভাবে ঊর্দ্ধে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া সে পড়িয়া আছে। বিন্দুমাত্র নড়াচড়া নিষিদ্ধ। রাজলক্ষ্মী সম্মুখে আসিয়া কহিলেন,

—শঙ্কর ! আমি তোমার মাসীমা এসেছি।

শঙ্কর কোন উত্তর করিল না। তাহার নয়নের দুই প্রান্ত হইতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

অশ্রু মুছাইয়া রাজলক্ষ্মী পুনরায় কহিলেন,

—ভয় নেই, সেরে যাবে। হরিপ্রিয়া আর তোমার বাবাকে টেলিগ্রাম গেছে?

শঙ্কর ইঙ্গিতে জানাইল তাঁহারা আজ ইহ জগতে নাই।

রাজলক্ষ্মী নূতন করিয়া হরিপ্রিয়ার অভাব অনুভব করিলেন, কহিলেন,

—অদৃষ্টের আদেশ মানতেই হবে। তবু মনে সাহস আনো। তুমি সেরে উঠবে। আমরা এখানে তোমায় দেখবো। তোমার মেশোমশাই আজ আসতে পারলেন না। তিনি বাড়ী নেই। কাল তিনি আসবেন। সোমনাথ এসেছে। সোমনাথকে তোমার ভাই বলে জানবে। ওঁর ছাত্র। ভারী সৎ ছেলে। এই সুপ্রিয়া। তোমার বোন।

শঙ্করের চক্ষু তারকায় আনন্দের আভাস জাগিয়া উঠিল। সোমনাথ নার্সকে জিজ্ঞাসা করিল,—জ্ঞানসঞ্চার হলেও উনি কথা বলতে পারছেন না কেন?

নার্স উত্তর করিল,

—ভয় নেই, কথা বলতে উনি পারবেন। বর্ত্তমানে যে দারুণ শকটা লেগেছে তাতেই উনি হতবাক হয়ে আছেন। ওটা একান্তই মানসিক। আরও চব্বিশ ঘণ্টা কেটে গেলে ও ভাবটা কেটে যাবে।

তিনজনেই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। গাড়ীতে উঠিয়া সুপ্রিয়াই প্রথমে বলিল,

—একজন সুস্থ সক্ষম লোক একদিনে এইভাবে অসহায় হয়ে পড়েছে ভাবতে গেলেও মনটা ভারী হয়ে আসে। চোখের ওপর শঙ্করদার এই অবস্থা দেখে আমার কান্না পাচ্ছিল।

সোমনাথ ও রাজলক্ষ্মী কোন উত্তর না দিয়া বাহিরেই তাকাইয়া রহিলেন। সুপ্রিয়া পুনরায় কহিল,

—আচ্ছা মা! শঙ্করদা যদি আর সেরে না ওঠে! ওই অক্ষম দেহ নিয়ে দিনের পর দিন বেঁচে থাকা …… শিহরিয়া উঠিয়া সুপ্রিয়া সেকথা আর উচ্চারণ করিতে পারিল না।

এবার রাজলক্ষ্মী কহিলেন,

—ছিঃ সুপ্রিয়া! শঙ্কর সুস্থ হয়ে আবার মানুষের মতই সংসারের বুকে চলাফেরা করবে এই আশা, এই চিন্তাই করা উচিত। অশুভ চিন্তায় অকল্যাণ ডেকে আনা হয়।

ধমক খাইয়া সুপ্রিয়া থামিয়া গেল। সোমনাথ কিন্তু সুপ্রিয়ার মমতা দেখিয়া মুগ্ধ হইল। নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক স্রোতোধারা! সে কহিল,

—আজ যদি তুমি কলেজের নার্স হ'তে তা'হলে বোধ হয় তুমি সবচেয়ে সুখী হতে, না?

উৎফুল্ল কণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—সত্যি সমীদা! নার্সদের 'পরে আমার মনে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। কিন্তু আজ এখন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে, মানুষকে সেবা করবার মহৎ সম্মানের অধিকারিণী ওরা। রুগ্ন, অক্ষম, দুঃখী মানুষের কাছে ওদের মূল্য সীমাহীন।

গাড়ী বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল।

ইহার পর প্রায় নিত্য যাতায়াত সুরু হইল। কখনও সুপ্রিয়া রাজলক্ষ্মী, কখনও প্রফেসর ঘোষাল সুপ্রিয়া, কখনও বা সুপ্রিয়া সোমনাথ। সঙ্গী যেই হউক সুপ্রিয়ার প্রতিদিন আসা চাই-ই। ভাগ্য-বিড়ম্বিত ওই মানুষটির প্রতি সমবেদনায় সুপ্রিয়ার হৃদয় ভরপুর।

শঙ্করও এই একটি ঘণ্টার জন্ম অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। সময় নিকটবর্তী হইবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্নায়ুতে একটা উত্তেজনা আর অস্বস্তি

অনুভব করে। পাঁচটা বাজিবার পর হইতে প্রতিটি মুহূর্ত তাহার অসহ্য হইয়া উঠে! এত দেরী কেন? তবে কি আজ তাহারা আসিবে না?

সুপ্রিয়া প্রবেশ করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহে,

—আজ কেমন আছ শঙ্করদা?

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে শঙ্কর উত্তর দেয়,

—ভালই ত আছি! কিন্তু তাই বলে তোমরা এত দেরী করবে?

—হাঁ দেরী একটু হয়েছে, কিন্তু তাকিয়ে দেখ, সুমুখে সমীদা! অমন অসম্ভব কুঁড়ে মানুষকে নিয়ে বাড়ীর বার হওয়া কি সোজা ব্যাপার! বলিয়াই সোমনাথের পানে তাকাইয়া অর্থপূর্ণ হাস্য করিতে থাকে।

শঙ্কর স্তিমিত হইয়া আসে, তথাপি প্রফুল্ল কণ্ঠেই কহে,

—সোমনাথ! প্রথম দিনেই বন্ধু বলে তুমি আমায় স্বীকার করে নিয়েছ। আমি জানি, কোনও দিক দিয়েই তোমার বন্ধুত্বের উপযুক্ত আমি নই! তবু সোমনাথ! আমার বিড়ম্বিত জীবনের এই কটা দিনের জন্যে আমায় অকৃতজ্ঞ হতে দিও না।

সোমনাথ সান্ত্বনার স্বরে তাহার হাতখানি ধরিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে,

—শঙ্কর! তোমার সেন্টিমেণ্ট স্বাভাবিক! তবু অনুযোগটা অর্থহীন!

ক্ষুব্ধকণ্ঠে শঙ্কর উত্তর দেয়,

—সুস্থ দেহ নিয়ে যতদিন বেড়িয়েছি ততদিন এই সেন্টিমেণ্টকে আমিও উপহাস করেছি সোমনাথ! কিন্তু মাত্র ক'মাসে আমি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে গিয়েছি। সম্ভব অসম্ভব কতনা বিচিত্র কল্পনা আমার চোখের সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অসুস্থ কল্পনায় আমার পীড়িত দেহ আরও কাতর হয়ে পড়ছে!

একদিন সুপ্রিয়া ফলগুলি সামনের টেবিলে রাখিয়া কহিল,

—শঙ্করদা! শুনেছ, আর সাতদিন পরেই তোমার প্লাষ্টার খোলা হবে। ডাঃ সেন আজ এই মাত্র আসবার সময় সমীদার কাছে বলছিলেন।

অত্যন্ত হতাশার স্বরে শঙ্কর কহিল,

—ডাঃ সেনকে সহস্র ধন্যবাদ! যদি একবারও প্রাণ ফিরে পেতে পারি! কিন্তু আমার আর আশা নেই সুপ্রিয়া। হাসপাতাল অবশ্য চিরদিন আমার স্থান দেবে না। কিন্তু জীবনের দীর্ঘ দিনগুলো কি আর আমার কাটবে?

সোমনাথ স্থির গম্ভীরকণ্ঠে কহিল,

—হতাশ হোয়ো না শঙ্কর! ভালো তুমি হবেই, তবে হাসপাতালে স্থান না হলেও তুমি আমাদের বিশ্বাস করতে পারো।

সুপ্রিয়া কহিল,

—শঙ্করদা! তুমি আমাদের বিশ্বাস করো না?

কেমন এক অদ্ভুত জড়িতকণ্ঠে শঙ্কর কহিল,

—বিশ্বাস?

উভয়ে ততোধিক দৃঢ়তার সহিত উচ্চারণ করিল,

—হাঁ, বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস কর শঙ্কর!

—আমাদের বিশ্বাস কর শঙ্করদা!

—বিশ্বাস তোমাদের আমি করি সুপ্রিয়া! কিন্তু আমি ভাবছি, আমাকে বিশ্বাস করা উচিত হবে কি? আমি যে নিজেকে আজও বিশ্বাস করি না।

—আমরা তোমায় সন্দেহ করি না শঙ্কর! তবু তুমি এভাবে কথা কইছ কেন?

উত্তেজিত স্বরে শঙ্কর উত্তর করিল,

—কিন্তু কেন, কেন করনা? করাই ত উচিত।

তাহার এই অকারণ উত্তেজনা উভয়কেই বিস্মিত করিল। সুপ্রিয়া সোমনাথ উভয়ে পরস্পরের পানে দৃষ্টি বিনিময় করিল। ভাবিল, স্বজনহীন, আত্মীয়হীন বেচারা! সম্মুখের ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা, ততোধিক অসহায়তা কল্পনা করিয়া ও অপ্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়াছে।

সুপ্রিয়া অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে সান্ত্বনার স্বরে কহিল,

—বাবা বলেছেন, যতদিন না তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠ, ততদিন তুমি আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। আমি তোমার সেবা করব। তুমি সুস্থ হয়ে উঠবে শঙ্করদা!

শঙ্কর চক্ষু মুদ্রিত করিল।

শঙ্কর অবশেষে একদিন প্রোঃ ঘোষালের ভবনেই • আনীত হইল। চিকিৎসকেরা রায় দিলেন একমাস পরে পরীক্ষা করিয়া প্রয়োজন বোধ করিলে পুনরায় প্লাষ্টার আঁটিয়া দিবেন। বর্ত্তমানে মাত্র একটা মৃদু মালিশ চলিতে থাকিবে।

সেবার সুযোগ পাইয়া সুপ্রিয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। পড়াশুনা শিকায় তুলিয়া সে দিবারাত্র শঙ্করের শুশ্রূষায় নিজেকে নিযুক্ত করিল। সুপ্রিয়াকে যেন সেবার নেশায় পাইয়াছে! ঔষধ পথ্যাদি সম্পর্কে প্রতিটি ঘণ্টার চার্ট প্রস্তুত করিয়া সে নিপুণা সেবিকার ন্যায় শঙ্করের সেবায় লাগিয়া গেল।

অবসর সময়ে সোমনাথ একদিন কহিল,

—পড়াশুনাটা একেবারেই ছেড়ে দিলে?

—ধরে কোনদিনই বিশেষ ছিলুম না সমীদা! তাই ছাড়ার প্রশ্নটা অর্থহীন। তাছাড়া সত্যি কথা বলতে কি শর্ম্মিষ্ঠা চলে যাওয়ার পর হতে কলেজের আকর্ষণ আমার চলে গেছে। বি, এ, টা প্রাইভেটেই দেবো।

সোমনাথ বিমর্ষভাবে কহিল,

—তাই দিও!

সোমনাথকে বিষণ্ণ দেখিয়া সুপ্রিয়া দরদ দিয়া কহিল,

—পড়াশুনার সময় জীবনে অনেক পাবো, কিন্তু অসময়ে শঙ্করদা যদি অনাদর পায় তাহলে সে আমাদের অমানুষ ভাববে। সেটা কি উচিত হবে ?

—শঙ্কর সুস্থ হোক নিশ্চয়ই কামনা করি, কিন্তু সেবার নেশায় যেন নিজেকে হেলায় হারিও না।

শঙ্কিতকণ্ঠে সুপ্রিয়া কহিল,

—তুমি কি বলতে চাইছ ?

—এর চেয়ে সরল করে বলবার সাধ্য বর্ত্তমানে আমার নেই। অবসর সময়ে একটু ভেবে দেখতে চেষ্টা কোরো। হয়ত এর সঠিক অর্থ আপনিই পরিস্ফুট হয়ে উঠ্‌বে। মা'র শরীর দিন দিন খারাপ হয়ে পড়ছে। হয়ত কিছু দিনের জন্যে আমায় বাইরে চেঞ্জে যেতে হতে পারে।

—কিন্তু তোমারও ত লেখাপড়ার ক্ষতি হবে ?

—হয়ত হবে। কিন্তু মায়ের প্রতি কর্ত্তব্য আমার সব চেয়ে বড়ো।

সুপ্রিয়া বলিতে যাইতেছিল রোগীর প্রতি কর্ত্তব্যও তাহার সবচেয়ে বড়ো। কিন্তু তাহা না বলিয়া বলিল,

—আমি কি তোমার মায়ের সেবা করতে পারি না ?

সোমনাথ হাসিল, কহিল,

—পারো, কিন্তু তা'হলে শঙ্করের কি হবে ?

সুপ্রিয়া বলিতে পারিল না যে শঙ্করের যাহা হয় হউক মায়ের সেবাই তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। সে নিশ্চল হইয়া সোমনাথের পানে অসহায়ের ন্যায় তাকাইয়া রহিল।

সোমনাথ কহিল,

—মায়ের ভার আমার ওপর। শঙ্করকে তুমিই দেখ। তবে একটু সাবধানে থেকো। বাড়াবাড়িটা যেন দৃষ্টিকটুতে না দাঁড়ায়।

এই প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে সুপ্রিয়া জলিয়া উঠিল, কহিল,

—সমীদা! বাড়াবাড়ি আমি করি না। তবে দেখছি সুন্দর দেহেই সব সময় সুন্দর আত্মা বাস করে না। এতদিনের পরিচয়ের পর তোমার এই মন্তব্য জানিয়ে দিচ্ছে যে শয়তান তোমাকেও অব্যাহতি দেয় নি।

প্রশান্ত কণ্ঠে সোমনাথ কহিল,

—সত্যি সুপ্রিয়া! সুন্দর আত্মা সব সময় সুন্দর দেহে বাস করে না। এই কথাটা যদি অন্তর দিয়ে অনুভব করো, তাহলে আমার আর কোন ভাবনাই থাকে না।

সুপ্রিয়া সহসা বলিয়া ফেলিল,

—সমীদা! তুমি আমার জন্যে ভাবো?

—সুপ্রিয়া!

সোমনাথ যেন বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে সুপ্রিয়াকে শাসন বাক্য উচ্চারণ করিল। এই কঠোরতা সুপ্রিয়ার সম্পূর্ণ অপরিচিত। সুপ্রিয়া কেমন বিহ্বল ভাবে তাকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, কহিল,

—তুমি আমায় বকলে? আমি কী অপরাধ করেছি। বল বল, তোমায় বলতেই হবে, আমি তোমার কাছে কী অপরাধ করেছি।

অজস্র অশ্রুধারায় তাহার কপোল চিবুক ভাসিয়া গেল।

সোমনাথ এতটা ভাবে নাই। তাই তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল না। সহসা সে কি ভাবিয়া সুপ্রিয়ার মাথাটা বুকে লইয়া সান্ত্বনা দিয়া কহিল,

—অপরাধ তুমি করোনি সুপ্রিয়া কিন্তু ভবিষ্যতে তোমার ভাবনা থেকে যেন আমায় দূ'রে রেখো না। আমায় দূরে যেতে হচ্ছে বলেই হয়ত আমি বিচলিত হয়ে পড়েছি।

বীত-বর্ষণ আকাশে স্নিগ্ধ চন্দ্রমার প্রকাশ।

সুপ্রিয়া হাসিয়া কহিল,

—ওঃ, তুমি একজন ভয়ানক লোক কিন্তু! মিছি মিছি তুমি আমায় কাঁদিয়ে দিলে?

সোমনাথও হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,

—ওঃ, তুমিও একটি ভয়ানক মেয়ে কিন্তু। মিছি মিছি তুমি আমায় এমন ভাবিয়ে তুললে!

সোমনাথ চলিয়া গেল। সুপ্রিয়া ভাবিল, শঙ্কর আসিয়া কি তাহাদের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিতেছে? সোমনাথ কি তাহারই ইঙ্গিত করিয়া গেল? কিন্তু এই ব্যবধান কিসের? সোমনাথ ত তাহার হৃদয় হইতে বিন্দুমাত্রও দূরে সরিয়া যায় নাই। সোমনাথের মনে এই সন্দেহ দেখা দিল কেন? সত্যাশ্রয়ী সোমনাথ ত অনুদার নহে। সোমনাথ ত সাধারণের মত ঈর্ষা প্রণোদিত হইবার মানুষ নহে। তবে সোমনাথ তাহাকে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া গেল কেন? তবে কি সে শঙ্করকে সন্দেহ করে? কিন্তু শঙ্করের আচরণে আজ পর্য্যন্ত ত সে কোন অশুদ্ধতা দেখে নাই। তবে হাঁ, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে শঙ্করের দাবীটা আজকাল কিছু বাড়িয়াছে। নানা ছুতায় সে সর্ব্বদাই সুপ্রিয়াকে সম্মুখে রাখিতে চাহে। তাহার ফুল চাই, সিগারেট চাই, আয়না চাই। রুগ্ন অক্ষম মানুষের পক্ষে এ চাওয়া ত স্বাভাবিক। তাহাকে কাগজ পড়িয়া শুনাইতে হয়, কবিতা পড়িয়া শুনাইতে হয়। পড়িতে পড়িতে দু একটা আলোচনাও করিতে হয়। ইহাও স্বাভাবিক! ইহার মধ্যে সাবধানতার কোন প্রশ্নই আসে না। না, সমীদা দূরে যাইবার ভয়ে সত্যই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছে।

সোমনাথ দূরে চলিয়া যাইবে। তাহার মাকে লইয়া কখনও সে সমুদ্রতটে, কখনও শৈলাবাসে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইবে। কত সুন্দর প্রভাত, কত স্নিগ্ধ সন্ধ্যা মাতাপুত্রের আলাপনে মধুর হইয়া উঠিবে; সহসা এক সময় দিগন্তের শেষ রশ্মিরেখা মায়ের পাণ্ডুর মুখে পড়িয়া হয়ত সোমনাথকে শঙ্কিত করিয়া তুলিবে।

সোমনাথ দূরে চলিয়া যাইবে। কিন্তু এই দূরত্বের ব্যথা ত সে নিজে অনুভব করিতে পারিতেছে না? তাহার সোমনাথ একদিন তাহার

মাকে লইয়া ফিরিয়া আসিবে, সেই প্রতীক্ষমান দিবসে সে আবার সোমনাথের সহিত মিলিত হইবে, বোধ হয় এই স্বাভাবিক চিন্তাই তাহাকে উদ্বিগ্ন করে নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে কিছু অঘটনও ত ঘটিতে পারে! না, দুশ্চিন্তার প্রশ্রয় সে দিবে না। সোমনাথ তাহার মাকে সুস্থ করিয়া ফিরিয়া আসুক।

সোমনাথ দূরে চলিয়া যাইবে, তাই সোমনাথ বিচলিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পক্ষেও কি সত্যই বিচলিত হইবার কোন কারণ ঘটে নাই? তাহার আদর্শ, তাহার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সোমনাথ দূরে চলিয়া যাইতেছে, ইহাতে সত্যই কি তাহার বেদনা জাগে না? সুপ্রিয়া মনের গভীর তলদেশে অবগাহন করিতে চেষ্টা করিল! দেখিল, সত্যই সেবার নেশায় সে এতই মোহগ্রস্তা হইয়া পড়িয়াছে যে, সেখানে তাহার সোমনাথও তাহার নিকট ছোট হইয়া গিয়াছে। তাই যে বেদনায় তাহার অভিভূত হইয়া পড়িবার কথা, সেই বেদনা তাহাকে তেমন অধীর করিয়া তুলিতেছে না। সে ভাবিল, সোমনাথের অনুযোগ করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু তাহার পক্ষে এখন কর্ত্তব্য কি? শঙ্করকে অবহেলা করাও ত উচিত হইবে না! না, শঙ্কর তাহার কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। সোমনাথের আশঙ্কা মিথ্যা। সোমনাথ হয়ত তাহাপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই উন্নত, তথাপি ভালবাসার ক্ষেত্রে তাহারও ভুল অস্বাভাবিক নহে। অন্ততঃ তাহার দিক দিয়া সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ নিরর্থক! তবে যদি কোন দিন শঙ্করের দিক হইতে কোন ভুল দেখা দেয়, সে তাহার আপন সীমা লঙ্ঘন করে, তবে তাহার স্থায্য জবাব দিবার মত কাঠিন্যও তাহার আছে এবং সেদিন সোমনাথ তাহার এই কাঠিন্যের পরিচয় পাইয়া আজিকার আচরণের জন্য মার্জনা ভিক্ষাই করিবে।

সন্ধ্যা হইয়া আসিল। শঙ্কর এ সময় 'নেস্টোমল্ট' পান করে। চিন্তাটাকে মধ্যপথে অসমাপ্ত রাখিয়া সুপ্রিয়া উঠিয়া পড়িল।

শঙ্কর বাল্যাবধি ব্যায়াম ও খেলাধূলায় মাতিয়া আছে। বি, এ,টা পড়িতে পড়িতে ছাড়িয়া দিয়াছে। মা সরস্বতীকে বিদায় দিয়া ক্লাবের সরস্বতী পূজায় মাতব্বরী করিয়াছে। অর্থের অনটন নাই, তাই খেয়াল খুসী চরিতার্থ করিবার অবসরও পাইয়াছে প্রচুর। তবে সেই খেয়ালটা বদখেয়ালে পর্য্যবসিত হইতে পারে নাই এই কারণে যে, স্পোর্টিং জগতে একটা প্রাধান্য লাভ করিতে হইলে ওদিকে দৃষ্টি দেওয়া চলে না।

ওসমানের ভূমিকায় আয়েষার প্রতি প্রণয়াসক্ত হইলেও বাস্তব জগতে তাহার জীবনে সত্যই কোন আয়েষার আবির্ভাব ঘটে নাই, তাই হৃদয়-দ্বন্দ্বের দুর্ব্বলতায় টানা-পোড়েন বুনিবার প্রয়োজনও তাহার হয় নাই। এক কথায় প্রেম সম্পর্কে তাহার অভিজ্ঞতাও নাই, বিশেষ আগ্রহও নাই। অকালে মাতা পিতা উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করায় বিবাহটা বিলম্বিত হইয়া গিয়াছে। বিবাহে তাহার অরুচি নাই তবে সুরুচিসম্পন্ন যোগাযোগের অভাব ঘটিয়াছে।

স্পোর্টস সংক্রান্ত কি একটা ব্যাপার লইয়াই সে কলিকাতায় আসিয়াছিল। মায়ের ডায়েরীর পাতায় প্রোঃ ঘোষালের ঠিকানা দেখিয়া ঠিকানাটা নিজের ডায়েরী বুকে টুকিয়া লইয়াছিল। সংসারে আত্মীয় স্বজন তাহার কম। বিশেষতঃ কলিকাতায় আত্মীয় বন্ধু বলিতে কেহ নাই। মায়ের মুখে বহুদিন সে এই রাজলক্ষ্মী মাসীমার গল্প শুনিয়াছে, কিন্তু এযাবৎ দেখাশুনা করিবার কোন সুযোগ সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। এতদিনে যদি বা সুযোগ ঘটিল, ঘটনাচক্রে মধ্যপথে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার জীবনের গতিই ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইবার উপক্রম করিল।

বয়সটা তাহার উপেক্ষণীয় নহে। এই বয়সে এক তরুণীর নিত্য-সাহচর্য্য তাহার মনে দাগ কাটে নাই বলিলে সত্যের সম্মান দেওয়া হয় না।

সুপ্রিয়াকে ভার্যার আসনে বসাইয়া সে তৃপ্ত হইতে চাহিলেও অলক্ষ্যে বিধাতা বিদ্রূপের হাসি হাসিলেন। তাহার সহস্র চেষ্টা সত্বেও স্বচ্ছন্দচারিনী সুপ্রিয়ার আকর্ষণ তাহার নিকট দুর্নিবার হইয়া উঠিল। সে মূর্খ নহে। সুপ্রিয়া-সোমনাথের সম্পর্কটা তাহার নিকট গোপন থাকে নাই। তাই বাহিরের কঠিন সংযমে সে নিজেকে সংযত রাখিয়াছে। কিন্তু মনের বিষক্রিয়া তাহাকে অব্যাহতি দেয় নাই। সুপ্রিয়া তাহার জাগরণে এবং তন্দ্রায় অপরূপা হইয়া ফুটিয়া উঠে। তাহার কলভাষণে সে আস্বাদন করে দ্রাক্ষারসের মাদকতা, চম্পক অঙ্গুলির চঞ্চল সঞ্চালনে অনুভব করে বিদ্যুতের বহ্নিকণা, লঘু গতি-ভঙ্গিমায় দেখিতে পায় হরিণীর মনোহারিত্ব।

তাহার চক্ষে সুপ্রিয়া মুহূর্তে মুহূর্তে নব নব রূপে প্রতিভাত হইয়া উঠে। জীবনানন্দদায়িনী প্রাণ-সঞ্চারিণী সুপ্রিয়া। সে বিহ্বলভাবে ভাবে, এই প্রাণ চঞ্চলা সুপ্রিয়া সোমনাথকেই সম্মুখে রাখিয়া পরিপূর্ণা হইয়া উঠিতেছে, শংকর তাহার মানসলোকে তুচ্ছ।

হউক তুচ্ছ। এই তুচ্ছতার মধ্য দিয়াই সে আকণ্ঠ পান করিতে চাহে সর্বদুঃখ-বিজয়ী আনন্দের অমৃতবিন্দু। তাহার আনন্দ লোকের একমাত্র দেবী এই সুপ্রিয়া। সে জানে, সুপ্রিয়ার প্রেম তাহার পক্ষে দুর্লভ। তথাপি করুণাময়ীর সেবার মধ্য দিয়া এই যে করুণা-বিন্দুর ক্ষরণ, এই যে ক্ষণিকের স্বর্গ, ইহাও তাহার নিকট কম লোভনীয় নহে।

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলিবে? কতদিন চলা সম্ভব? সে দ্রুত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছে। ইচ্ছা করিলে এখন সে উঠিতে পারে। কিন্তু সে সুস্থ এই সংবাদ প্রচারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই এই স্বর্গধাম হইতে তাহার বিদায়কাল নিকটবর্তী হইয়া উঠিবে। এই চিন্তাও তাহার নিকট অসহ্য। তাই সামর্থ্য আসিলেও সম্প্রতি সে উঠিল না। সে একই ভাবে রোগীর ভূমিকায় শয্যাশ্রয় করিয়া পড়িয়া রহিল।

একমাস পরে তাহার পরীক্ষা হইবার কথা। তাহার নিজেরই ব্যবস্থা মত ডাক্তার আসিলে কৌশলে সে পরীক্ষা হইতে অব্যাহতি লাভ করিল। ডাক্তার বলিলেন, প্লাষ্টারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু ইলেকট্রিক চার্জ লইতে হইবে। ডাক্তারের সহিত গোপন ব্যবস্থা করিয়া সে স্নানে ডুইবার করিয়া ইলেকট্রিক চার্জের মিথ্যা অভিনয় করিতে লাগিল।

সুস্থ মানুষের পক্ষে এই ভাবে রোগীর ভূমিকা অভিনয় করাও কী মর্মান্তিক! কিন্তু সুপ্রিয়ার সঙ্গলোভে শঙ্কর সে যন্ত্রণা তুচ্ছ করিল।

শঙ্কর মনে মনে সোমনাথকে ভয় করে। সোমনাথের সঙ্গ তাই সে সযত্নে পরিহার করিয়া চলিতে চাহে। কিন্তু শত কৌশলেও সোমনাথকে সরাইয়া রাখা অসম্ভব। সোমনাথ তাহার সন্নিধানে আসে প্রত্যহ, কিন্তু স্বল্প সময়ের জন্য। শঙ্করের ধারণা সুপ্রিয়াকে সোমনাথ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। সুপ্রিয়ার যত আলোচনা সব কিছু সোমনাথকেই কেন্দ্র করিয়া। উহার নিকট সোমনাথের যুক্তি যেন বেদের ন্যায় অভ্রান্ত! সে সকল তর্কের অবসান করে সোমনাথের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া। বলে,—শঙ্করদা! এটা আমার কথা নয়, সমীদার কথা! শঙ্কর বলে,

—তোমার সমীদা কি কখনও ভুল বলে না?

—না, সমীদার ভুল হওয়া অসম্ভব! ও মা'র সঙ্গে শেষ নিষ্পত্তি না করে কোন কথা পরিবেশণ করে না।

শঙ্কর বিস্মিত কণ্ঠে কহে,

—মা!

—তুমি সমীদার মাকে দেখোনি শঙ্করদা! সত্যিই সমীদার মায়ের তুলনা বুঝি এ জগতে নেই।

আর একদিন সোমনাথের মায়ের প্রসঙ্গ উঠিতেই সুপ্রিয়া গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

—সমীদার মা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। সমীদা মাকে নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছে। ভাল হয়ে শিগগীর ফিরে আসুক নইলে…বলিতে গিয়া সুপ্রিয়া থামিয়া গেল।

সোমনাথ কহিল,—নইলে কি? থামলে কেন?

সুপ্রিয়া অত্যন্ত শান্ত কণ্ঠে এক একটি শব্দ মন্ত্রের মত উচ্চারণ করিল,

—নইলে সমীদাকে সামলান দায় হবে। মা নেই সমীদা আছে, সমীদা এ কল্পনা করতে পারে না।

এই মুহূর্ত্তে শঙ্কর মনের মধ্যে কেমন একটা উল্লাস অনুভব করিল। তাহার মনে হইল, রূপকথায় রাক্ষসের প্রাণ যেমন কূপের অন্ধতম প্রদেশে সযত্নে কৌটায় রক্ষিত থাকে, সোমনাথের প্রাণপুরুষও বুঝি তেমনই তাহার মায়ের প্রাণ-কৌটায় আবদ্ধ আছে। মায়ের অবর্ত্তমানে সোমনাথ সকল ব্যক্তিত্ব হারাইয়া সাধারণের পর্য্যায়ে পড়িবে! তখন? তখন কি? এই প্রশ্নে শঙ্কর নিজেই চমকিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সবলে প্রশ্নটা সম্মুখে রাখিয়া কহিল, তখন কি সুপ্রিয়া তাহার প্রতি মনোযোগ দিবার অবসর পাইবে?

সুপ্রিয়া কহিল,—ওকি! হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে তুমি কি ভাবছ?

নিজেকে চাপা দিয়া শঙ্কর প্রত্যুত্তর করিল,

—না, সোমনাথের কথাই ভাবছি। বেচারী মাকে নিয়ে সত্যিই বড় বিব্রতে পড়েছে।

সুপ্রিয়া এ উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। সে স্পষ্ট দেখিতে পাইল, শঙ্কর একটা গোপন উল্লাস অদম্য শক্তিতে চাপিয়া গেল। ক্ষণপরে সোমনাথ প্রবেশ করিল।

শঙ্কর পূর্ব্ব প্রসঙ্গের জের টানিয়া কহিল,

—তুমি বহুকাল বাঁচবে সোমনাথ! এই মাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল। তুমি নাকি তোমার মাকে নিয়ে চেঞ্জে যাচ্ছ?

সোমনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার শঙ্করের পানে আর একবার সুপ্রিয়ার পানে দৃষ্টিপাত করিল। এই দৃষ্টিতে কি আছে শঙ্কর জানে না, কিন্তু এই দৃষ্টি তাহাকে হিমশীতল করিয়া দেয়। পরক্ষণে সোমনাথ কিন্তু সহাস্য কণ্ঠেই কহিল,

—কতকাল বাঁচবো তা হয়ত মহাকালের খাতাতেই লেখা আছে, আমার তা জানা নেই। তবে যাকে নিয়ে বর্তমানে সৌখীন চেঞ্জে যাচ্ছি না শঙ্কর! তাই এ যাত্রায় উল্লাস নেই বরং এর পেছনে রয়েছে উদ্বেগ আর আশঙ্কা!

সমবেদনার স্বরে শঙ্কর উত্তর করিল,

—চেঞ্জের ফল আশা করি ভালই হবে, তবে তোমার অনুপস্থিতিটা সত্যিই অনুভব করব। বিশেষতঃ সুপ্রিয়ার পক্ষে...

—সুপ্রিয়ার কথা সুপ্রিয়ার মুখে শোনাই শোভন হবে শঙ্কর!

শঙ্করকে সোমনাথ কি আঘাত করিল! শঙ্কর কিন্তু তাহা গ্রাহ্য না করিয়া তেমনই স্মিত মুখেই কহিল,

—কিন্তু সোমনাথের কথা সুপ্রিয়া এত শোনায় যে সোমনাথ আর সুপ্রিয়া দুই যেন আমার কাছে এক হয়ে গেছে। তাই কথাটা তোমাকে উদ্দেশ করলেও আসলে লক্ষ্য করেছি সুপ্রিয়াকেই।

সোমনাথ তাহার পরিহাস সহজভাবেই গ্রহণ করিল, কহিল,

—সুপ্রিয়া তোমার লক্ষ্য হয়েছে জেনে সুখী হলুম। আমাদের সখ্যতায় আশা করি তাতে বিঘ্ন ঘটবে না।

সুপ্রিয়া সম্মুখে আসিয়া কহিল,

—একি ছেলেমানুষী শুরু করলে তোমরা? মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন তিনি শুনে কি ভাববেন বলত?

সোমনাথ হাসিতে হাসিতে কহিল,

—মায়েদের ভাবনার অন্ত নেই সুপ্রিয়া! কিন্তু তাঁদের সেই ভাবনায় অংশ নিতে যাওয়ার সময় ও শক্তি দুইএরই অভাব আমাদের।

শঙ্কর কহিল,

—তুমি যাই বল সোমনাথ! তুমি যেন সুপ্রিয়াকে গ্রাস করে বসে আছ। তোমার প্রভাবে ও নিজের স্বাতন্ত্র্য হারিয়েছে। ও যদি একদিন সহসা বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠবার জন্য জেদ ধরে তাতে আমি আশ্চর্য হব না।

সোমনাথ গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

—আমিও না।

সুপ্রিয়া ততোধিক গম্ভীর কণ্ঠে কহিল,

—আমিও না।

তিন জনেই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। আবহাওয়াটা অনেক লঘু হইয়া আসিয়াছিল এমন সময় শঙ্কর সহসা প্রশ্ন করিয়া বসিল,

—আচ্ছা সোমনাথ! তুমি নাকি বলেছ শয়তানের বুকে থাকে বিষ, আর মুখে থাকে মহত্বের মুখোস?

—বলেছি। কিন্তু তোমার অভিযোগটা কোথায়?

—মনীষীরা কি একথা বলেন নি যে মানুষের মুখই মনের দর্পণ?

—বলেছেন।

—তা হলে কোনটা সত্যি? কারণ একটা সত্যি হলে অপরটা মিথ্যে হয়ে যায়।

—তা যায় না। দুটোই সত্যি।

—কেমন করে?

—অভিনয়ের দক্ষতায় মুখোসটা সব সময় চেনা সম্ভব হয় না।

—কিন্তু অভিনয় ত অষ্টপ্রহর চলতে পারে না! মুখোসটা ত কৃত্রিম!

—নিশ্চয়ই কৃত্রিম! তবে এই কৃত্রিমতাই অকৃত্রিমভাবে জগতকে ঢেকে রেখেছে। এই কৃত্রিমতার জাল ভেদ করা সহজ নয়। তুলনায় অভিনয়টা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই শয়তান তার নিজের মুখটাকে অল্প সময়ে

অন্ধকারেই আবৃত রাখে। সে অন্ধকার এত জমাট যে তার আপন অস্তিত্বটাই তখন তার কাছে রহস্যময় হয়ে ওঠে।

—তুমি কি বলতে চাও কোনও দিন সে মুখোমুখি নিজের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না?

—না। কারণ এই জিজ্ঞাসাকে সে ভয় করে। এই ভয়ের পিছনে আছে তার মৃত্যু! আপন মৃত্যু কে চায় বল? কেউ না, শয়তান হলেও না।

শঙ্কর একটু ইতস্তত: করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল,

—কিন্তু যদি একদিন প্রকাশ্য আলোকে শয়তানের মুখোসটা টেনে খুলে ফেলা যায়?

কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়াই সোমনাথ উত্তর দিল,

—তাহলে দেখা যাবে কামনার কুৎসিত তার ভয়াবহ মুখ।

—কিন্তু কামনা মাত্রই কুৎসিত হবে কেন? সংসারে সব কিছু ঐশ্বর্য্যের মূলে রয়েছে কামনা। অতুল ঐশ্বর্য্যই সকল সুখের উৎস।

—অতুল ঐশ্বর্য্যটা শয়তানের স্বর্গ।

—তোমার মন্তব্যটা কুৎসায় কঠোর হয়ে উঠছে। সোমনাথ! তুমি নিশ্চয়ই 'সিনিক' নও! তোমার মুখে এটা শোনবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।

শঙ্কর এবার বিজয়ীর ভঙ্গিতে একবার সুপ্রিয়ার পানে তাকাইল। সুপ্রিয়া কিন্তু সে দৃষ্টির কোনও উত্তর না দিয়া সোমনাথের উত্তরের আশায় অধীর আগ্রহে সোমনাথের পানে উন্মুখ হইয়া বসিয়া রহিল।

সোমনাথ কহিল,

—শয়তান কুৎসিত, তাই তার আলোচনাটাও কুৎসিত না হয়ে উপায় নেই। শয়তানের কুৎসিত স্বর্গে আছে প্রলুব্ধের পরাকাষ্ঠা, আছে অতুল ঐশ্বর্য্য, আছে বাসনা চরিতার্থের বিচিত্র সম্ভার, আর আছে তৃষ্ণার হোমানল।

—তাহলে সে শয়তান মানুষমাত্রেরই বন্ধু! মানুষের চাওয়া আর শয়তানের চাওয়ায় ত কোন ভেদ দেখতে পাচ্ছি না। মানুষ এর বেশী আর কি চাইতে পারে?

—মনুষ্যত্ব!

—কী সে মনুষ্যত্ব যা তুচ্ছ করে অতুল ঐশ্বর্য্য, ব্যসনের বিলাস, আর বিচিত্র রূপের রূপায়ন!

—মনুষ্যত্বের অধিকারী না হলে শুধু সংজ্ঞা দিয়ে তার পরিচয় দেওয়া যায় না শঙ্কর! ব্যষ্টির সাধনা সমষ্টির কল্যাণে! এই কল্যাণের রূপ তার ব্যাপ্তিতে, তার বিস্তারে। এই বিস্তারের সৌন্দর্য্য ভাষায় ধরা সম্ভব নয়। তবু জেনে রাখ, সত্যিকার মানুষের সংখ্যা সংসারে অল্প হলেও এ সংসারে তাদের মূল্য অল্প নয়।

শঙ্কর চিন্তিতভাবে কহিল,

—তোমার সংজ্ঞা অনুযায়ী মনুষ্যত্বের সাধনা করতে হলে জাগতিক উন্নতির ব্যাঘাত ঘটাতে হয়। কিন্তু তোমার ব্যাপ্তির প্রসঙ্গেই বলি, রাষ্ট্রীয় চেতনাতেও ত এই বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ আছে।

—হয়ত আছে। কিন্তু ব্যক্তিকে বিলোপ করে রাষ্ট্রীয় রথচক্র আজ দুনিয়ার বুকে যে রক্তধ্বজা উড়িয়ে চলেছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমায় প্রশ্ন কর শঙ্কর!

—শান্তি আর সংগ্রাম দুটোই চিরকাল পাশাপাশি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। একের মর্য্যাদা দিতে গিয়ে অপরের সমাধি রচনার কি অর্থ হতে পারে সোমনাথ?

—অনর্থকে প্রতিহত করার চেষ্টার মধ্যে লুকিয়ে আছে মনুষ্যত্ব। মানুষের এই চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়েছে বলেই তার মূল্য কমে যায়নি।

শঙ্কর একটা শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল,

—বিজ্ঞান থেকে দর্শনের রাজ্যে পাড়ি জমিয়েছ সোমনাথ! এতে কিন্তু তোমার মৌলিকত্ব মালুম হচ্ছে না। এই অনধিকার চর্চায় প্রমাণিত হচ্ছে তুমি কোন বিশেষ দার্শনিকের মতবাদ উদ্গীরণ করছ।

সোমনাথ বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া উত্তর করিল,

—সত্যকে যে ভাবেই বলা যাক, তাতে তা'র গৌরবের লাঘব হয় না। সে সত্য যে মহাপুরুষের দ্বারাই আবিষ্কৃত হোক, উত্তর পুরুষের আবৃত্তিতে তার অর্থের এতটুকু অপচয় ঘটে না। আর জেনে রাখো, দর্শন আর বিজ্ঞানের সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই মনুষ্যত্বের পূর্ণ প্রকাশ! তোমার শ্লেষবাক্যে বিচলিত হবার মত কিছু নেই।

—ভাল কথা! যদি কোনদিন তোমার সংজ্ঞানুযায়ী মনুষ্যত্বের পূজারী হতে পারি, সেদিন তবে আবার তোমার সঙ্গে আলোচনায় মাতা যাবে।

সুপ্রিয়া একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল,

—সেই ভালো! তোমাদের গুরুগম্ভীর আলোচনায় অনুপ্রবেশ করা অসম্ভব দেখে আমিও হাঁফিয়ে উঠেছিলাম। এখন অনুমতি করলে চায়ের আসর বসাতে সাহস পাই।

ইহার পর চায়ের আসরে হাল্‌কা হাসি-গল্পের অবতারণা হইল।

রাজলক্ষ্মী এই আকস্মিক পরিবর্তনটাকে প্রথমাবধিই প্রসন্ন মনে গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কোথায় যেন একটা অমঙ্গল অলক্ষ্যে বসিয়া বক্রহাসি হাসিতেছে, অথচ প্রতিবাদ করিবার কোন পন্থাই তিনি পাইতেছেন না। ঘটনাচক্রে রুগ্ন অসহায় শঙ্কর তাঁহার আশ্রয়ে আসিয়া পড়িয়াছে। তাহাকে আশ্রয়চ্যুত করিবার মত হৃদয়-হীনতা তাঁহার নাই। কিন্তু কেন জানি না, শঙ্করের প্রতি মন তাঁহার প্রথম দিন হইতেই

অপ্রসন্ন হইয়া আছে। আপাত দৃষ্টিতে শঙ্করের কোন অপরাধ নাই, কাজেই অভিযোগ করিবারও তাঁহার কিছু নাই। কিন্তু পরোক্ষ দৃষ্টিতে শঙ্করের অপরাধ উপেক্ষা করিবার নহে। সে যুবক, সে অবিবাহিত, সে ধনী, সে খেয়ালী! অপর পক্ষে তাঁহার কন্যা অনূঢ়া। যদিচ এখনও পর্য্যন্ত বাক-বিনিময় হয় নাই তথাপি সোমনাথের সহিত এক প্রকার বাগদত্তা। তাঁহার সেই কন্যা আজ গভীর হৃদয়াবেগে পরিচালিতা সেবা-উন্মাদিনী! শঙ্কর যদি তাহার দুর্ব্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে তবে ঘটনার গতি কোন পথে পরিবর্ত্তিত হইবে তাহা কে জানে? রাজলক্ষ্মী সময়ে অসময়ে এই চিন্তাই করিতেন। তবে এ সব কথা কাহারও নিকট বলিবার নহে, তাই মনের অশান্তি মনেই চাপিয়া দুঃখভোগ করিতে লাগিলেন। একবার ভাবিলেন, অপর্ণার কাছে ছুটিয়া গিয়া তাঁহার মনের আশঙ্কা প্রকাশ করেন, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল ইহাতে তাঁহার আপন মর্য্যাদা, কন্যার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা।

একদিন কথায় কথায় তিনি সুপ্রিয়াকে বলিলেন,

—এখন শঙ্কর অনেকটা ভাল আছে। ওকে একজন নার্সের তত্ত্বাবধানে রেখে তোমার আবার কলেজে যাওয়া উচিত।

সুপ্রিয়া বিস্মিত কণ্ঠে কহিল,

—তুমি বল কি মা! এতদূর এসে এখন নার্সের হাতে ছেড়ে দিলে শঙ্করদা কি রকম ব্যথা পাবেন তা ভেবে বলছ কি?

রাজলক্ষ্মী চুপ করিয়া গেলেন। তাঁহার অসম্মতি আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে নিজের বয়স্থা কন্যার নিকট অপদস্থ হইতে হয়। শেষে একদিন স্থির থাকিতে না পারিয়া তিনি অপর্ণার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং অত্যন্ত কৌশলে তাঁহার আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া উভয়ের বিবাহ প্রস্তাব করিলেন। বিবাহটা যাহাতে শীঘ্র সম্পন্ন হয় তজ্জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন।

অপর্ণা তাঁহার আশঙ্কায় গুরুত্ব আরোপ না করিয়া হাসিয়া কহিল,

—সুপ্রিয়ার এখনও বিশ বৎসর পার হয়নি, সেটা ভুলে যাচ্ছেন ভাই। প্রথম দিনেই আমার সংকল্প স্থির হয়ে গেছে। তবে এ'কটা মাস অপেক্ষা করতেই হবে। সুপ্রিয়াকে শুভলগ্ন দেখেই ঘরে আনব। এ বাড়ীর বৌ হয়ে যে আসবে তাকে কি অদিনে অক্ষণে যেমন তেমন করে আনতে পারি? আর তা ছাড়া এ সময়ে সমীও বেঁকে বসতে পারে। আমি ঘুরে আসি তারপর সব ব্যবস্থা আমিই করব।

রাজলক্ষ্মী ইহার পর আর কিছু বলিতে সাহস করিলেন না। শুধু মুখে বলিলেন,—আমি মেয়ের মা, তাই আমার ভয়টাই বেশী।

—ছেলের মা হলেও তোমার মেয়েটি পাবার আগ্রহ আমারও কম নয়।

রাজলক্ষ্মী আর কথা না কহিয়া ফিরিয়া আসিলেন।

যথানির্দিষ্ট দিনে সোমনাথ তাহার মাকে লইয়া রাঁচী যাত্রা করিল। স্টেশনে রাজলক্ষ্মী সুপ্রিয়া তাহাদের বিদায় দিতে আসিলেন। অপর্ণা সুপ্রিয়াকে কোলে লইয়া প্রথম দিনের মতই নিবিড় স্নেহে জড়াইয়া ধরিল, বলিল,

—ভারী দুষ্টু মেয়ে! কিন্তু ভারী মিষ্টি মেয়ে। আমি ফিরে আসি। তারপর সব ব্যবস্থা করে ফেলব।

রাজলক্ষ্মী বাড়ী ফিরিয়া আরও গম্ভীর হইয়া গেলেন। তাঁহার কর্তব্য মন তাঁহাকে পথ দেখাইতে পারিতেছে না অথচ আশঙ্কা যেন আসন্ন হইয়া আসিতেছে। স্বামীকে কিছু বলা বৃথা। এ'সকল চিন্তা তাঁহার মাথায় আসে না। সোমনাথ বিদায় চাহিলে তিনি কেবল বলিয়াছিলেন,

—এক্সপেরিমেণ্টটার আবার দেরী পড়ে গেল সোমনাথ। তবে মায়ের অসুখ! উপায় নেই! শীঘ্র ফিরে এসো!

মায়ের কি অসুখ, কোথায় যাইবে কতদিনে ফিরিবার সম্ভাবনা এ সকল প্রশ্ন তাঁহার নাই। রাজলক্ষ্মী ভাবিলেন, সোমনাথ যদি প্রত্যাবর্তনে বিলম্ব করে তবে হয়ত ঘটনাটা ইতিমধ্যে জটিল আকার ধারণ করিতে পারে। তবে ভরসার মধ্যে এই যে, সুপ্রিয়ার মনের দিক হইতে তিনি নিশ্চিন্ত। সে মন সোমনাথকে পরিত্যাগ করিয়া শঙ্করকে আশ্রয় করিবার চিন্তাও স্থান দিতে পারে না। কিন্তু সোমনাথ দেরী করিলে শঙ্করের আকর্ষণ প্রবল হওয়াও বিচিত্র নহে। মাঝে মাঝে তিনি শঙ্করের দৃষ্টিতে যে তারা উঁকি মারিতে দেখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার বিচক্ষণ চক্ষু আশ্বস্ত হইতে পারে নাই। শঙ্করের জাল অতি ধীরে হইলেও অত্যন্ত সন্তর্পণে এবং সুকৌশলে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। সুপ্রিয়ার অসাবধানতা তাহাকে কখন কোন অসতর্ক মুহূর্তে পাশবদ্ধ করিয়া ফেলিবে কে জানে।

রাজলক্ষ্মী আজকাল সময়ে অসময়ে সেবানিরতা সুপ্রিয়ার পাশে আসিয়া নীরবে দাঁড়ান। কখনও শঙ্করকে সামান্য কুশল প্রশ্ন করিয়া, কখনও সুপ্রিয়াকে দুই একটা উপদেশ দিয়া চলিয়া যান। সুপ্রিয়া গ্রাহ্য করে না। কিন্তু শঙ্কর একদিন থাকিতে না পারিয়া কহিল,—মাসীমা আজকাল যেন তোমার ওপর বেশী সজাগ হয়ে উঠেছেন।

সুপ্রিয়া সহজ ভাবেই উত্তর করিল,

—মায়েদের পক্ষে এটা স্বাভাবিক।

—কিন্তু সেই স্বাভাবিকতা যখন মাত্রা ছাড়ায়, তখনই সেটা অস্বাভাবিক এবং উল্লেখযোগ্য হয়।

—শঙ্করদা! তুমি ভুলে যাচ্ছ মায়ের সম্পর্কেই তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক, কাজেই তোমার সমালোচনাটা সংযত করতে পারলে সব দিক থেকেই শোভন হয়।

শঙ্কর আহত হইলেও সাবধান হইয়া গেল। অপর পক্ষে মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটা সুপ্রিয়ারও সম্মানে আঘাত হানিল। মাকে একান্তে পাইয়া কহিল,

—মা ! শঙ্করদা বোধ হয় এবার শিগ্‌গীর সেরে উঠ্‌বে। তাই বলছি, এতদিন যে ভাবে কেটেছে সেই ভাবেই কি আরও দু' একমাস কাটানো সম্ভব নয় ? ওর সম্মানে আঘাত লাগে এমন কিছু করা আমাদের কি উচিত হবে ?

কন্যার অভিযোগে রাজলক্ষ্মীর মুখে বিরক্তি ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু তিনি কন্যার সহিত তর্ক করিতে প্রস্তুত নহেন। তাই সংক্ষেপে কহিলেন,

—তার মানে এ নয় মা ! যে আমি মা হয়ে আমার মেয়ের সম্মানহানি সহ্য করব।

এই প্রত্যক্ষ অভিযোগে সুপ্রিয়া বিস্ময়ে প্রায় চীৎকার করিয়া বলিল,
—মা !

—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই সুপ্রিয়া !

—তবে এখনই কেন শঙ্করদাকে বলে দিই না যে, অন্যত্র সে তার স্থান দেখে নি'ক ; এ বাড়ীতে তার আর স্থান হবে না !

—তার প্রয়োজন নেই। সে এই বাড়ীতেই থাকবে। তোমার প্রতিশ্রুতিই এক্ষেত্রে যথেষ্ট।

—বিশ্বাস যদি নষ্ট হয়ে যায় মা, তবে প্রতিশ্রুতির মূল্য কতটুকু ?

—বিশ্বাস যদি নষ্ট হত সুপ্রিয়া, তবে এত কথা বলবার প্রয়োজন হ'ত না। বিরক্ত কোরো না আমায়। যা বলছি, একটু ভেবে দেখো। তোমার সম্মান, এ বাড়ীর সম্মান তোমার নিজেরই হাতে। বলিয়াই তিনি কন্যাকে ফেলিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন।

রাজলক্ষ্মীর এই অমূলক সন্দেহে সুপ্রিয়া যেমন একদিকে অত্যন্ত আহত হইল, অপর দিকে তাহার প্রতি মায়ের গভীর স্নেহের পরিচয় পাইয়া

অন্তরে অন্তরে তেমনই পুলকিত হইয়া উঠিল। মনে মনে কহিল, ভয় নাই জননী, ভয় নাই ; তোমার সুপ্রিয়াকে অপ্রিয়কর পরিস্থিতির মাঝে টানিয়া লইয়া যাইবে এমন সাধ্য শঙ্করের নাই! উহার অক্ষম দেহের অন্তরালে মনটাও যদি অক্ষম হইয়া পড়ে, তবে সে তাহার সক্ষম শক্তি দ্বারা অনায়াসেই তাহাকে প্রতিহত করিতে পারিবে। কিন্তু এই দুর্দিনে সে তাহাকে তাহার সেবা হইতে, সঙ্গ হইতে, কিছুতেই বঞ্চিত করিতে পারিবে না! সোমনাথকে সে হৃদয় উৎসর্গ করিয়াছে বলিয়া শঙ্করকে সে সান্ত্বনা দিতে পাইবে না? সে বিরক্ত হইয়া উঠিল। এ যেন মানুষের মনের উপর অনাবশ্যক জুলুম। তাহার বয়স হইয়াছে, জ্ঞান হইয়াছে, ভালমন্দ বুঝিবার ক্ষমতা হইয়াছে অথচ প্রতিপদে তাহাকে নাবালিকার অনুশাসনে চালিত করিবার চেষ্টা! মায়ের সতর্কতার পিছনে যে অন্যায় আত্মগোপন করিয়া আছে তাহাকে সে কোন মতেই স্বীকার করিবে না।

রাজলক্ষ্মী কিন্তু ভুল করেন নাই। শীঘ্রই তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। শঙ্কর এখন সত্যই সারিয়া উঠিয়াছে। আজ কাল সে রাত্রে বিছানায় উঠিয়া বসে। মাঝে মাঝে পদচারণা করিয়া দেহের জড়তা কাটাইয়া লয়। এক একদিন ধীরে ধীরে স্কিপিংও করে।

ফাল্গুনী পূর্ণিমার রাত্রি। রাত্রি বারোটা বাজিবার সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কর শয্যা ত্যাগ করিয়া জানালাটার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় জগৎ ভাসিয়া যাইতেছে। সম্মুখের ছোট 'লনটায়' সবুজ ঘাসের সমারোহ! কি একটা ফুলের মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে। বোধ হয় ও-বাড়ীর বাতাবী ফুলের গন্ধ। দূরে একটা বাড়ীর মাথা ছাড়াইয়া দেবদারু চূড়াটা আকাশ স্পর্শ করিয়াছে। ধরণীর নীরব নগ্ন সৌন্দর্যে শঙ্কর মুগ্ধ না হইয়া অস্থির হইয়া উঠিল।

স্বেচ্ছাকৃত এই বন্দী জীবনটাকে এই মুহূর্তে ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দিবার জন্য সে একটা অদম্য আবেগ অনুভব করিতে লাগিল। কেন?

কিসের মোহে সে দিনের পর দিন এবং [illegible]

অবারিত মুক্ত মাঠের মাঝে একবার যদি সে দাঁড়াইতে পারিত, তবে বোধ হয়, সে সকল দুর্বলতাকে অতিক্রম করিয়া পুনরায় স্বাধীন সুস্থ মানুষের মতই বিচরণ করিতে পারিত! ঘটনাচক্রের আবর্তে পড়িয়া এই মিথ্যা এবং অর্থহীন অভিনয়ের সার্থকতা কোথায়? না, সে মানিবে না, মানিবে না ঐই চারিটি প্রাচীরে ঘেরা এই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের বন্দীত্ব! সে স্বাধীন, সে মুক্ত!

দুরন্ত অভিমানে সে গৃহের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ঘন ঘন পদচারণ করিতে লাগিল। সহসা এক সময় সমগ্র শয্যাটা তুলিয়া সে গৃহকোণে নিক্ষেপ করিল। দুর্বার আগ্রহে সে কক্ষ ত্যাগ করিবার একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিল। ওই সবুজ ঘাস যেন পরম স্নেহে তাহাকে আহ্বান করিতেছে। একবার, শুধু একবার যদি সে তাহার কোমল বক্ষে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিতে পারিত, তবে বুঝি তাহার সকল গ্লানি নিঃশেষে ধুইয়া যাইত। কিন্তু…

কিন্তু এই সাময়িক উত্তেজনার প্রকাশে তাহার সমগ্র সম্ভাবনা চূর্ণ হইয়া যাইবে। সে সক্ষম, সে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগীর ভূমিকা অভিনয় করিতেছে ইহা জানিতে পারিলে একই সঙ্গে অবজ্ঞা ও করুণার কণ্টকাঘাতে সে এই সুখস্বর্গ হইতে বিচ্যুত হইয়া একেবারে অতলে তলাইয়া যাইবে। কিন্তু এই অভিনয়ে সম্ভাবনা কি? কোথায়?

এই প্রশ্নে শঙ্কর একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় নিজের বুকটা চাপিয়া ধরিল। একটা অস্ফুট আর্তনাদ অন্তর ভেদ করিয়া বাহির হইয়া আসিল—আঃ।

ইহা স্বর্গ না নরক? সোমনাথ হয়ত সত্যই বলিয়াছে যে ইহা শয়তানের স্বর্গ! বাসনায় বিকৃত শয়তানের মুখটাও নাকি, বীভৎস! ভয়ানক! আজ এই নির্জন নিঃস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকারের মাঝেই সে শয়তানটার মুখোস খুলিয়া তাহাকে মুখোমুখি প্রশ্ন করিতে চাহে। কিন্তু

শয়তানের স্বরূপ প্রকাশ পাইলেই নাকি তাহার মৃত্যু ঘটিবে। হায়, মৃত্যুও বোধ হয় এই যন্ত্রণা হইতে শ্রেয়! জীবন-মৃত্যুর মাঝে দাঁড়াইয়া নীরন্ধ্র অন্ধকারে আত্ম-সমর্পণাপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়!

সে প্রকাণ্ড আয়নাটার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। সে দেখিল, তাহার যৌবনদীপ্ত দেহের এতটুকু অপচয় ঘটে নাই। স্বাস্থ্য-শ্রীতে সে দেহ পূর্ব্বের ন্যায়ই কান্তিমান। কিন্তু তাহার চক্ষের সে দীপ্তি যেন নিভিয়া গিয়াছে। সেখানে এক দারুণ হতাশা ও ক্লান্তি। এই অবসাদময় ক্লান্ত চক্ষু যেন তাহার নিজের নহে। ইহা যেন অপর কাহারও। সে পুনরায় শয্যায় আসিয়া বসিল। মনে মনে বলিল,

—সুপ্রিয়া! তুমি আলেয়া। এই আলেয়ার পিছনে পিছনে ঘুরিয়া একদিন আমার মৃত্যু ঘটিবে। কত বিনিদ্র রজনী, কত উদ্বেগ আকুল মুহূর্ত্ত সেই মৃত্যুকে মলিন করিয়া তুলিবে। তুমি কিন্তু তাহা জানিবে না!

পরক্ষণেই শঙ্কর পুনরায় তীব্র বেগে উঠিয়া কহিল,—কিন্তু শয়তান কোথায়? আমার বুকে না সুপ্রিয়ার চোখে? শয়তানের স্বর্গোদ্যানে বিষপুষ্প তুমি সুপ্রিয়া! তোমাকে আঘ্রাণ করিবে যে তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য! কিন্তু তাই যদি হয়, তবে সোমনাথেরও ত নিস্তার নাই! সে বিষ সোমনাথের পক্ষেই বা অমৃত হইবে কেন? সোমনাথ হয়ত নীলকণ্ঠ! সে বিষ তাহার কণ্ঠেই সংলগ্ন হইয়া থাকিবে, আর সোমনাথ পরমানন্দে নটরাজের নৃত্যভঙ্গিমায় নাচিয়া বেড়াইবে!

না, সে ওই বিষ পান করিবে। ওই বিষপানে যদি তাহার মৃত্যুও হয় তাও স্বীকার, একবার কিন্তু সে ঐ বিষ আকণ্ঠ পান না করিয়া নিবৃত্ত হইবে না। তারপর তাহার পরিণাম যাহাই হউক সে তাহা গ্রাহ্য করিবে না। সে তৃষ্ণার্ত্ত! সেই তৃষ্ণা নিবারণের সুধার বারি সম্মুখে থাকিতে সে শুষ্ক-কণ্ঠ চাতকের ন্যায় জল জল করিয়া চীৎকার করিবে না। সুপ্রিয়া

তাহাকে চাহে কি না তাহা সে জানিতে চাহে না, কিন্তু সুপ্রিয়াকে যে সে চাহে তাহা সে নিঃসংশয়ে জানে।

একি সত্যই যে তৃষ্ণায় তাহার তালু শুষ্ক হইয়া আসিয়াছে? এই মুহূর্তে বুঝি একবিন্দু জলের অভাবে তাহার সকল চিন্তার শেষ হইয়া যাইবে। সেই নির্জন প্রকোষ্ঠে বসিয়া শঙ্কর একবিন্দু জলের জন্য চারিদিকে তাকাইতে লাগিল। আঃ, ওইত গৃহকোণে কুঁজায় জল রহিয়াছে। সে টলিতে টলিতে কুঁজাটার কাছে গেল। তৃষ্ণার আতিশয্যে সে আকণ্ঠ জল পান করিল। অনভ্যস্ত হস্ত সুবিচার করিল না। ফলে, সর্বাঙ্গ জলে ভাসিয়া গেল। মাথায় কয়েক অঁজলা জল দিয়া কুঁজাটা রাখিতে যাইবে এমন সময় সহসা কুঁজাটা স্খলিত হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

সর্বনাশ! এখনই সবাই জাগরিত হইয়া তাহাকে তদবস্থায় দেখিলে সকল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হইয়া পড়িবে। মুহূর্তে সে শয্যাটা কুড়াইয়া লইয়া কোনমতে শয্যা রচনা করিয়া শুইয়া পড়িল। না, সে শব্দে কাহারও ঘুম ভাঙ্গে নাই। শীতল নৈশবায়ু স্পর্শে এবার তাহার তন্দ্রা আসিল। ভাবিল, সে পাগল হইল নাকি? কী সব অসংলগ্ন চিন্তার ভূতে পাইয়াছিল তাহাকে। সুপ্রিয়ার সেবায় সে শান্তি পায়, আনন্দ পায়। সেই আনন্দের স্বর্গলোক হইতে সে স্বেচ্ছায় নির্বাসন দণ্ড গ্রহণ করিবে কেন? সোমনাথ ভ্রান্ত। শয়তানের স্বর্গেও শান্তি আছে। আমি সুপ্রিয়ার অমঙ্গল কামনা করি না, কিন্তু তাই বলিয়া নিজের সুখ শান্তিও স্বহস্তে বিনষ্ট করিতে চাহি না।

শঙ্কর গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অপর্ণা রাঁচিতে পাঁচ সাত দিন থাকিবার পরই বলিল, রাঁচি ভাল লাগিতেছে না। সমুদ্রতীরে বেড়াইতে পারিলে তাহার মন অনেকটা সুস্থ হইবে। সোমনাথ তৎক্ষণাৎ পুরী যাইবার ব্যবস্থা করিল। পুরীতে

দশ পনর দিন বেশ ভালই কাটিল। এমন কি একসময় অপর্ণার স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসিতেছে বলিয়াই যেন সোমনাথের ধারণা হইল। নিয়মিত সমুদ্র স্নানে আরাম ও আনন্দ উপভোগ করিয়া মাতাপুত্র উভয়েই যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইল। কিন্তু অতর্কিতে এক রাত্রে অপর্ণার জ্বর দেখা দিল এবং একদিনেই শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিল। সোমনাথ ডাক্তার ডাকাইয়া যথারীতি শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিল। ডাক্তার বাহিরে আসিয়া সোমনাথকে কহিলেন,—আপনার মা'র বাইরের স্বাস্থ্য দেখে কোন আশঙ্কাই জাগে না, কিন্তু ওঁর হার্টের অবস্থা সত্যিই ভালো নয়।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল;

—আপনি কি মনে করেন, মা এ যাত্রা সামলে উঠতে পারবেন না ?

ডাক্তার তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া কহিলেন,

—না না, এখনই এমন কিছু সিরিয়াস্ হয়ে উঠে নি। আশাকরি ওষুধ ও ইন্‌জেকশনে দু'চার দিনের মধ্যেই উনি এটা সামলে উঠ্‌বেন। তবে আমার মনে হয়, পুরীর চেয়ে বম্বে ওঁর পক্ষে বেশী উপকারী হবে। আপনি যত শীঘ্র পারেন বম্বে রওনা হবার ব্যবস্থা করুন।

ডাক্তারের ভবিষ্যৎবাণী ব্যর্থ হইল না। অপর্ণা দুই চারিদিনের মধ্যেই সুস্থ হইয়া উঠিল। আবার সমুদ্র স্নানের পরামর্শ আরম্ভ হইল। সোমনাথ কৌশলে অপর্ণার নিকট বম্বে যাইবার প্রস্তাব করিল, কহিল,

—ভেটদ্বারকা দেখবার আশা তোমার অনেক দিনের। চলনা মা, আমিও একবার বম্বেটা ঘুরে আসি। বিলেত যাওয়া এখনও ঘটে উঠল না। যাবার শেষ বন্দরটাও ত অন্ততঃ একবার দেখা হ'য়ে থাকবে। আর তোমার ভেট দ্বারকাও ওখান থেকে বেশী দূর নয়।

অপর্ণা তৎক্ষণাৎ সাগ্রহে সম্মতি দিল। বম্বে পৌছিয়া কয়েক দিন অপর্ণা বেশ ভালই রহিল। আয়োজন করিয়া এক সপ্তাহ ভেট দ্বারকায় অবস্থান শেষে আবার বম্বে প্রত্যাবর্তন করিল। বম্বের সমুদ্রতীরবর্তী

বাড়ীখানা অপর্ণার ভারী ভাল লাগিয়াছিল। বার বার সোমনাথের রুচির প্রশংসা করিয়া অপর্ণা কিছুদিন এই বাড়ীতে থাকিবার সঙ্কল্প জানাইল।

সোমনাথ হাসিয়া কহিল,—বেশ ত মা! তোমার যত দিন ইচ্ছে তুমি থাক না। কে তোমার ইচ্ছেয় বাধা দিচ্ছে?

—কিন্তু তোর ত ক্ষতি হচ্ছে?

—কিছু ক্ষতি হচ্ছে না মা। এ ক্ষতি দু'দিনেই পূরণ হবে। কিন্তু তোমার ইচ্ছে যদি অপূর্ণ থেকে যায়, তবে সে কত ক্ষতির পূরণ সারা জীবনেও হবে না।

অপর্ণা শিশুর ন্যায় কলকণ্ঠে কহিয়া উঠিল,

—চেয়ে দেখ সমী! সমুদ্র কত নীল! দূরে গাঢ় নীল আকাশের সঙ্গে একেবারে ও যেন এক হয়ে গিয়ে সাগর আর আকাশের শেষ সীমারেখা টানতে ভুলে গেছে। এমনই নীলের সমারোহের মাঝে হারিয়ে গিয়েই বুঝি একদিন নীলমাধবের আবির্ভাব ঘটেছিল। দেখ সমী! দিনরাত সমুদ্র দেখছি তবু যেন ক্লান্তি নেই! ক্ষণে ক্ষণে ওর রূপ অপরূপ হয়ে ফুটে উঠ্ছে। দিনে সূর্য্যের কিরণ আর রাতে চাঁদের জ্যোৎস্নায় স্নান করে প্রতি নিয়ত ও শুচি-শুভ্র হয়ে উঠছে। আমার দেহে মনে কোথাও যেন এতটুকু গ্লানি নেই!

—পুরীতেও তুমি সমুদ্র দেখেছ মা।

—দেখেছি! কিন্তু বুঝি এমন করে দেখিনি। তা ছাড়া পুরীর সমুদ্র যেন নর্ম্মময়ী, এমন ভাবময়ী নয়।

সোমনাথ চুপ করিয়া গেল। মাকে সে প্রসঙ্গান্তরে লইয়া যাইতে চাহে। মার দৃষ্টিতে জাগিয়া উঠিতেছে অলৌকিক আলোকের বিচ্ছুরণ। সোমনাথ ঐ দৃষ্টিতে শঙ্কিত হইয়া উঠে। ও আলো যেন এ জগতের নহে!

এইভাবে কয়েকদিন না যাইতেই অপর্ণা আবার শয্যাগ্রহণ করিল। বম্বের বিখ্যাত ডাক্তার মেটা পরীক্ষা করিয়া কহিলেন,

—মিঃ সোমনাথ! আপনার মাকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে। চব্বিশ ঘণ্টার জন্যে একজন নার্স নিযুক্ত করুন।

সোমনাথ শঙ্কিত কণ্ঠে কহিল,—আশঙ্কার কিছু দেখছেন নাকি ডাঃ মেটা?

—আশঙ্কা! হাঁ আশঙ্কা কিছুটা আছে বৈ কি! তবে কর্তব্যে কঠোর হোন মিঃ সোমনাথ! আশা ত্যাগ করবেন না। দু একটি কথায় আমি বুঝেছি আপনার মা একজন অসামান্যা নারী! ওঁকে সুস্থ করে তুলতে পারলে আমিও সত্যিই আনন্দিত হবো। ভাল কথা, আমার হাতে একটি বাঙালী নার্স আছে। মেয়েটি সবদিক দিয়ে সত্যিই খুব ভালো। কাল সকালে আমার চেম্বারে যাবেন। আলাপ করিয়ে দেব। বোধ হয় আপনার অপছন্দ হবে না।

—ধন্যবাদ! বিমর্ষ মুখে সোমনাথ হস্ত প্রসারণ করিল। ডাঃ মেটা করমর্দন করিয়া প্রস্থান করিলেন।

পরদিন ডাঃ মেটার চেম্বারে উপস্থিত হইয়া বিস্মিত সোমনাথ সোল্লাসে কহিয়া উঠিল,—কী আশ্চর্য্য! শর্ম্মিষ্ঠাদেবী! আপনি? নার্স?

শর্ম্মিষ্ঠা শান্তস্বরে উত্তর করিল,—সংসারে এর চেয়েও অনেক বেশী আশ্চর্য্য ব্যাপার আছে সোমনাথ বাবু!

—হয়ত আছে; কিন্তু আমি এখনও ঠিক বিশ্বাস করে উঠ্‌তে পারছি না যে আপনি নার্স! আপনি কলকাতার······

শর্ম্মিষ্ঠা চক্ষের ইঙ্গিতে তাহার পরিচয় প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলে সোমনাথ সংযত হইয়া গেল।

শর্ম্মিষ্ঠা কহিল,—এখন আমরা কাযের কথায় আসতে পারি।

ডাঃ মেটা এতক্ষণে কহিলেন,

—দেখ্ছি, আপনারা উভয়েই পরস্পর পরিচিত! তথাপি আমার কর্ত্তব্যানুযায়ী আমি জানাচ্ছি যে শর্ম্মিষ্ঠা দেবীকে চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নিয়োগ করতে হ'লে মাসে তিনশ টাকা করে পড়বে। আপনি রাজী হলে এখনই ওঁকে সঙ্গে নিয়ে চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে পারি।

টাকাকড়ির প্রসঙ্গে শর্ম্মিষ্ঠা যেন কিছু সঙ্কুচিতা হইয়া পদনিম্নে দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বসিয়া রহিল!

সোমনাথ কহিল,—সে জন্যে আটকাবে না ডাঃ মৈত্র। আপনি কি এখনই একবার আসবেন?

—নিশ্চয়ই। এ আমার কর্ত্তব্য।

গাড়ীতে উঠিলে এক সময় শর্ম্মিষ্ঠা সোমনাথকে চুপে চুপে কহিল,

—আমার পরিচয়টা মাকে না হয় নাই দিলেন।

সোমনাথ গম্ভীর ভাবে উত্তর করিল,—বেশ, তাই হবে।

—আমরা যে পূর্ব্ব হতেই পরিচিত তাও না হয় নাই জানালেন।

ঠিক তেমনই ভাবে সোমনাথ উত্তর করিল,—তাই হবে।

সুনিপুণ সেবায় মুগ্ধ হয় না এমন হৃদয় সংসারে অল্পই আছে। অপর্ণা মেয়েটির নৈষ্ঠিক সেবা যত্নে যেন নিজেকে একেবারে সঁপিয়া দিল। অপর্ণা দেখিল, মেয়েটি সাধারণ সেবিকার পর্য্যায়ে পড়ে না। পরিচয় প্রকাশ না করিলেও সে যে শিক্ষিতা এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের দুহিতা তাহা অপর্ণা অনায়াসেই অনুমান করিল। শর্ম্মিষ্ঠা অবশ্য তাঁহাকে বলিয়াছিল, সে দরিদ্র ঘরের কন্যা এবং পেটের দায়ে এই চাকুরী লইতে বাধ্য হইয়াছে!

সেবার মধ্যে এতখানি প্রাণভরা দরদ, এতখানি তন্ময়তা তাঁহাকে মাঝে মাঝে কেমন আনমনা করিয়া তুলিত। ও যেন তাঁহার আপন কন্যা! মাতৃসেবায় ও যেন নিজের সমস্ত হৃদয় উজাড় করিয়া দিয়াছে! ঔষধ

পথের ব্যাপারে তাহার কঠিন অনুশাসনে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেও অবসর সময়ে তাহার আলোচনা, তাহার বচন-মাধুর্য্য তাহাকে উচ্চ সংস্কৃতিসম্পন্না বলিয়াই প্রচার করিত।

অপর্ণার কক্ষের পশ্চিমে ছিল সাগর, কিন্তু পূর্ব্বের প্রাচীর-গাত্রে যে ছবিটা ছিল তাহা রবিবর্ম্মা অঙ্কিত শকুন্তলার। একদিন সকালে অপর্ণা দেখিল ছবিখানা অন্যত্র সরাইয়া সেখানে একখানা পর্ব্বতের তৈল-চিত্র স্থাপন করা হইয়াছে। শৈল পাদদেশে সাগরোর্ম্মি পদচুম্বন করিয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অপর্ণার ছবিখানা ভারী ভাল লাগিল, কহিল,

—ওখানে ও ছবিখানা কে টাঙাল?

শর্ম্মিষ্ঠা শান্তকণ্ঠে কহিল—আমিই টাঙিয়েছি মা! কাল ছবির দোকানে বেড়াতে গিয়ে ছবিখানা না কিনে থাকতে পারলুম না।

—ওখানেই বা ওখানা টাঙালে কেন?

—মনে হল, আপনার পশ্চিমের সমুদ্রকে পূবের পাহাড় হয়ত দেখতে চায়!

—কিন্তু পাহাড়ের স্পর্দ্ধা দেখেছ? সাগরের মিনতি যেন ও গ্রাহ্যই করে না।

—কিন্তু সত্যিই তার মিনতি ব্যর্থ হয় না মা! পাহাড়ের কঠিন হৃদয় ভেদ করে অশ্রুর আকারে বেরিয়ে আসে নদী! সেই অশ্রুরূপী নদীকেই সে উপহার দেয় সাগরকে। সে বলে, মাথাটা আমার আকাশ স্পর্শ করেছে বলেই আমায় হৃদয়হীন ভেবো না সাগর।

অপর্ণা চমৎকৃত হইয়া গেল। কহিল,

—অশ্রুর মিলনেই কি তা'র সার্থকতা?

—কে জানে! বলিয়াই ধীরে ধীরে শর্ম্মিষ্ঠা বাহির হইয়া গেল।

অপর্ণা মনে মনে একটা দারুণ অস্বস্তি অনুভব করিতে লাগিল। কে এই মেয়েটি! সুপ্রিয়ার পূর্ব্বে যদি শর্ম্মিষ্ঠা আসিত তবে হয়ত তাঁহার মন

শর্মিষ্ঠাকে নির্ব্বাচন দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করিত না। কিন্তু এখন ও প্রশ্ন অবান্তর! সমী কি উহাকে জানে? উহারা কি পরস্পরের নিকট পূর্ব্ব হইতেই পরিচিত? কিন্তু তাহারা সে পরিচয় গোপন রাখিতে চাহে কেন? হয়ত ইহার পশ্চাতে শর্মিষ্ঠার বংশ মর্য্যাদার প্রশ্ন জড়িত আছে। শর্মিষ্ঠার বুকে কিন্তু গোপন বেদনা। এই বয়সে এত গভীর কথা বেশ মানায় না। অশ্রু মিলনের যে উপমা সে দিল তাহা তাহার মুখস্থ বিদ্যা নহে, তাহার অন্তরের আত্মপ্রকাশ! হয়ত উহাদের মিলনের কোন অন্তরায় আছে। হয়ত ব্যর্থপ্রেমে অশ্রুই তাহার শেষ আশ্রয় হইয়াছে! আহা বেচারী! রূপে, গুণে, আচারে, ব্যবহারে, সর্ব্বগুণান্বিতা এমন একটি মেয়েকে এভাবে ব্যর্থ হইতে দিবার মূলে বিধাতার কি অভিপ্রায় আছে কে জানে!

একদিন শর্মিষ্ঠাকে অপর্ণা সহসা প্রশ্ন করিল,

—তোমার কলেজের কোন সহপাঠিনীর সঙ্গে তোমার কোনও পত্রালাপ হয় না? আজ পর্য্যন্ত তোমার কোন চিঠি আসতে দেখিনি কেন?

শর্মিষ্ঠা চমকিয়া উঠিল। পরক্ষণেই ধীরে ধীরে কহিল,

—কলেজে আমি পড়িনি মা। লেখাপড়া আমার সামান্যই।

—কলেজে একদিন আমি পড়েছি, তাই কলেজের কথাটাই আমার আগে মনে পড়ে গেল। বলিয়াই প্রসঙ্গটা বন্ধ করিয়া দিল। শর্মিষ্ঠার গোপনতা তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিল।

আর একদিন অপর্ণা কহিল,

—শর্মিষ্ঠা! তোমার সেবা যত্ন দেখে মনে হয় না যে, তুমি নার্স আর আমি রোগিণী! আমি যেন তোমার সত্যিকার মা!

—কিন্তু এর বিনিময়ে আমি টাকা পাই মা।

—ওঃ, সত্যি! আমারই ভুল! বলিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া অপর্ণা পাশ ফিরিল। একটা উদগত অশ্রু রোধ করিতে গিয়া শর্মিষ্ঠা জানালাটার ধারে গিয়া দাঁড়াইল।